নিশি রাত বাঁকা চাঁদ

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য



প্রতিভাস □ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ
২৩ এপ্রিল ১৯৯৮

প্রকাশক
বীজেশ সাহা
প্রতিভাস
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২
দূরভাষ : ২৫৫৭-৮৬৫৯

মুদ্রক
বইপাড়া পাবলিকেশনস্ (প্রিন্টিং বিভাগ)
১৮/এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা- ৭০০০০২

প্রচ্ছদ
দেবাশিস সাহা

প্রিয় গায়ক ও মানুষ
সুবীর সেন, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্তীকে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই

হার হাইনেস

আথেন, হেলেন ও সেই ক্রন্দসী

শেষ বাঈজি

লেখাপড়া, পড়াশুনো, লেখালেখি

কবির মৃত্যু ও অন্যান্য গল্প

ভূমিকা

গান শুনে

এ-বৃদ্ধ বয়সে গান শুনে হয় আক্রান্ত যৌবন!
অথচ যৌবনে তোমরা ছিলে কাছাকাছি,
সেদিনের সেই গান আজও লক্ষ্য করে
মহামানবের তীর, সাগরসঙ্গম।
এ-বৃদ্ধ বয়সে গান শুনে হয় আক্রান্ত যৌবন!

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

লেখকের বক্তব্য

অনুরোধের আসরের শুরু বা শেষ কোনোটিরই প্রত্যক্ষদর্শী আমি নই। অনুরোধের আসরের জন্ম যখন, তখন আমার জন্ম হয়নি; সত্তর দশকের শেষ দিকে কিংবা আশির দশকের গোড়ায় কখন যে রেডিয়ো থেকে মিলিয়ে গেল অনুষ্ঠানটি তারও খেয়াল রাখিনি। কারণ তখনকার বাংলা আধুনিক গানে আমার কোনো উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। আমার অনুরোধের আসর হল পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে ষাটের দশকের শেষ অবধি। সর্বসম্মতিক্রমে যে-সময়টাকে বলা হচ্ছে বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ।

হ্যাঁ, সেই বাংলা গানের স্বর্ণযুগের এক সন্তান আমি। আমার প্রজন্মের মানুষের দিনের আলো, রাতের চাঁদনিবেলা ছেয়ে থাকত অনুরোধের আসরের গানে। আমাদের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ভাষা ছিল হেমন্ত, শ্যামল, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, লতা, গীতার গান। আজ চার দশক পরও সে-গান বা সেই স্মৃতি আমাদের ছেড়ে যায়নি। শুধু স্বর্ণযুগ কেন, আমরা অনুরোধের আসরেরও সন্তান।

এই বইয়ের নানা লেখা দীর্ঘ পনেরো বছরে— ১৯৮০-১৯৯৫ —বিভিন্ন উপলক্ষে বিবিধ মেজাজে লেখা। শুধু গানের স্মৃতিতেই নয়, সেই গানের সঙ্গে সম্পর্কিত যুগ ও সমাজের স্মৃতিতে লেখা। ভালোবাসা ও অনুরাগে লেখা, আমার এবং আমার সময়ের মানুষের আত্মস্মৃতি হিসেবে লেখা। সেই রাতের জলসা, যেখানে স্টেজে বসে গাইতেন সতীনাথ, সুবীর; সেইসব দুপুর যা উজ্জ্বল হয়ে উঠত ধনঞ্জয়, পান্নালালের গানে; সেইসব গোধূলি লগন যা প্রাণে গেঁথে যেত তালাত মাহমুদ, মান্না দে-র গানে—সে সবই ধরা আছে এই বইয়ের স্মৃতিরেখায়। যেসব রচনাকে বাঙ্ময় করার জন্য সেরা কিছু অনুরোধের আসরের এবং সেকালের ছায়াছবির ১৫০টি গানের বাছাইও দেওয়া হল। ভালোবাসার এই উপহারকে গড়ে তুলতে আপ্রাণ সহযোগিতা পেলাম অনুজ বন্ধু বীজেশ সাহা-র কাছ থেকে। বীজেশ শুধু এই বইয়ের প্রকাশকই নয়, এই উদ্যোগের মরমি শরিক। আর এই বইয়ের দুই অনুরাগিণী আছে— আমার স্ত্রী ইন্দ্রাণী ও কন্যা আনন্দী। বর বা বাবার গানের বিলাসিতার পূর্ণ প্রশ্রয় ওরা দিয়েছে। ছবি এঁকে বই ভরিয়েছে অনুজ বন্ধু ও শিল্পী অনুপ রায়। তাকে ধন্যবাদ। আর স্মরণ করি মা, বাবা, কাকাকে যাঁরা রেকর্ড কিনে দিয়ে, গ্রামোফোন, রেডিয়োর সুযোগ দিয়ে গান ভালোবাসার পথ করে দিয়েছিলেন। ক্রিক রো-র ওই বাড়িতে বড়ো না হলে এই বই লেখা সম্ভব হত না।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

অনুরোধের আসর

শনিবারের হাফ-ছুটির ঘণ্টা পড়েছে সবে আর আমরা বইখাতা বগলে উঠিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি বাড়ির দিকে। একের পর এক পেরিয়ে যাচ্ছি হজমিগুলি, পেয়ারা, আমড়া, ফুচকা, ঝালমুড়ি, বুড়ির চুল, ইয়ো-ইয়ো, লাট্টু-লেত্তি, লাল-নীল সরবতের লোকগুলোকে— যেন ছুটন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে চাক্ষুষ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাওয়া নিসর্গ দৃশ্য। আমার কিন্তু কোথাও দাঁড়াবার জো নেই, হাতে বড়োজোর দশটা মিনিট। আর তারপরই ঘড়ি ধরে ১টা-৪০এ চালু হয়ে যাবে সারা সপ্তাহের প্রতীক্ষার ধন ও ধ্বনি 'অনুরোধের আসর'! আমি বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছি, দূরে বাড়ির গেট, গেটের মাথা জুড়ে লতানো গাছও চোখে পড়েছে, কিন্তু ঘড়ি আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি তখনও বাড়ির সিঁড়ি টপকাইনি যখন আশপাশের সমস্ত বাড়ির জানালা দিয়ে ভেসে আসতে লাগল আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্টুমিষ্টি সুরের গান 'মন বলছে আজ সন্ধ্যায় কিছু বলতে তুমি আসবে কি?' আমি একটার জায়গায় তিন-তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙোচ্ছি, কারণ পঞ্চাশ মিনিটের ওই অনুষ্ঠানের পঞ্চাশটা সেকেন্ডও আমি আমার শ্রবণের অঞ্জলি গলিয়ে গড়িয়ে পড়তে দিতে পারি না।

পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে স্কুল থেকে এভাবে ছুটে-আসা ছেলেটা শুধু আমি একা নই। ওই দৌড়ে-আসা ছেলেটা শুধু আমার বয়সিও নয়, আর সে শুধু স্কুল থেকেই ছুটি পেয়ে ছুটে পালিয়ে আসছে না। অনুরোধের আসরের নিশির ডাকে স্কুল, কলেজ, আপিস, সেরেস্তা, দোকান, রেস্টুরেন্ট, ময়দান, গলি, রাজপথ ও রোয়াকও ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের বিস্ফারিত-চক্ষু বালক, সদ্য কলেজে ঢোকা যুবক কিংবা সদ্য প্রেমে পড়া যুবতী, দশটা-পাঁচটা আপিসের বাবু কি সাড়ে পাঁচ দিন ক্লাস ঠেঙানো মধ্যবয়সী শিক্ষক, প্রৌঢ় কাকা অথবা বৃদ্ধ জ্যাঠা, চিন্তিত বাবা, ক্লান্ত মা—সবাই কিছুক্ষণের জন্য একধরে, রেডিয়ো বেষ্টন করে নির্মল জলসায়। যেসব বাড়িতে রেডিয়ো ঢোকেনি সেসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা অন্য বাড়ির ঘর উঠোন বারান্দা কিংবা জানালার তলায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনছে তালাত মামুদের কণ্ঠে 'তুমি সুন্দর যদি

নাহি হও/তায় বলো কি-বা যায় আসে/প্রিয়ার কী রূপ সে-ই জানে/ওগো ৩৮যে কখনোও ভালোবাসে।' বারো মাস, ছয় ঋতু জুড়ে শনিবার-রবিবারের এই দ্বিপ্রাহরিক গানের আসর যে কী ম্যাজিক, কী সম্মোহন, কী সুরবিলাস ছিল তা মাত্র তিন দশক পেরিয়ে চুরানব্বই সালের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে কল্পনা করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির হৃদয়ের গান যে-বাংলা আধুনিক তার স্বর্ণযুগ আসলে রেডিয়োর জমানা, অনুরোধের আসরের স্মৃতিভারাতুর, মেদুর দুপুরের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি। ফরাসি চিত্রপরিচালক জ্যঁ লুক গোদারের এক বিখ্যাত উক্তির বয়ান ধার করে বলতে পারি যে, আজকের বেশ কিছু যুবক, মধ্য ও উত্তর-মধ্যবয়সী প্রজন্মের বাঙালি আমরা উত্তম-সুচিত্রা ও হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটি এবং অনুরোধের আসরের সন্তান। টিভি-ভিডিও, ক্যাসেট-এল পি আর হাই-ফাইয়ের পূর্ববর্তী রেডিয়ো-গ্রামোফোনের যুগের বাঙালি আর আজকের বাঙালির মধ্যে এতদিনে কতকগুলো সূক্ষ্ম, জটিল, গুণগত ফারাক তৈরি হয়ে গেছে। পলিটিক্সের তর্ক, জ্যামঠাসা মিনিবাসে পায়ে পা মাড়িয়ে ঝগড়া, অমিতাভ-মিঠুন-শ্রীদেবী কিংবা ক্রুফো গোদার ফেল্লিনির অ্যানালিসিস সে যত পটুতার সঙ্গে করতে পারে ততখানি দক্ষতায় সে আর প্রেমের গান শোনা, গঙ্গার পাড়ের বেঞ্চিতে বসে উদাসভাবে বিদেশগামী জাহাজ দেখা, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে অশ্রুপাত, রেস্টুরেন্টের অমলিন আড্ডা কিংবা জীবনানন্দ কোট করে প্রেমপত্র লেখার মতো বিশুদ্ধ বাঙালি কাজগুলো করতে পারে না। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে গত দু-দশকে যে গুণগত পরিবর্তনগুলো এসেছে তার প্রধানতম বলি তার রোমান্টিকতা; জানি না, বাঙালি যুবার শেষ রোমান্টিক আত্মপ্রকাশ হয়তো ছিল নকশাল আন্দোলনে। কিন্তু তারপর সমস্ত কিছুই কীরকম আমূল বদলে গেছে, ফলে ওপার বাংলার বাঙালিকে দেখে নিজেদের পূর্বের চেহারার কিছু আঁচ আমরা পেলেও নিজেদের দিকে তাকিয়ে সত্যিই বোঝা কঠিন যে, এই আমরা সেই সেদিনের মানুষ, শুধু বয়সে আরেকটু পরিণত। আমাদের শ্লাঘার কলকাতাকে আর কিছুতেই সেই স্মৃতির শহরটির সঙ্গে মেলানো যায় না, লাইটহাউস মেট্রো এলিট মিনার্ভা হল দেখে কিছুতেই ভাবা যাবে না এখানে বসেই আমরা হলিউডের ভক্ত হয়েছি, পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গি দেখে মনে করতেও ইচ্ছে যাবে না যে, এইসব সড়ককে আমরা বিলিতি পাড়া বলতাম, নিজস্ব বিলেত বলে ভাবতে ভালোবাসতাম, প্রিয় বা প্রেয়সীর হাত ধরে দুরু দুরু বক্ষে এ পথ দিয়ে হেঁটে সিনেমার রোমান্সের পুনরাভিনয় করতাম নিজেদের মধ্যবিত্ত জীবনে। ময়দানের দিকে চোখ ফেলে মনে হয় এখানে আমরা হাতে চিনেবাদাম আর ঠোঁটে বাংলা কবিতা নিয়ে দীর্ঘ সময় বসতে পারতাম?



আমাদের শখের বাংলা ছবি আজ হিন্দিমার্কা, জামাকাপড় বোম্বাই স্টাইলের, নেশা টিভির হিন্দি সিরিয়াল, পাঠ্য মার্কিন থ্রিলার ও শ্রাব্য ধ্বনি গজল ও বাপ্পি লাহিড়ি। এই এত বড়ো পরিবর্তন বা বিবর্তন বা বিপর্যয়ের নাকি প্রগতির দুটি জনগ্রাহ্য প্রতীক হতে পারে রেডিয়ো আর টেলিভিশন। এই পরিণতির ফলে কী পাচ্ছি তার নমুনা ছড়িয়ে আছে দূরদর্শনের হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি তাবৎ অনুষ্ঠানে। কী হারালাম তার নমুনা হিসেবে তুলে ধরতে চাই শুধু একটি অনুষ্ঠানকে—অনুরোধের আসর।

আমি জানি না অনুরোধের আসরের মতো একটা রোমান্টিক প্রোগ্রামকে নিস্তব্ধ দুপুরে (কলকাতার দুপুরও এক সময় নিস্তব্ধ ছিল!) পেশ করার সুপারিশ কে করেছিলেন। কারণ নির্মল চিত্তে গান শোনার মতো অত সুন্দর সময় তো আর আবিষ্কৃত হল না। বস্তুত, জানিও না বেতারে অনুরোধের আসর নিবেদনের শুরুও বা কবে। এ নিয়ে সামান্য গবেষণা করলেই সনটা ধরা পড়বে, তবে ওরকম স্মৃতিময় এক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন-তারিখের তথ্য ও তত্ত্বে যাওয়ার আমার কোনোই বাসনা নেই। আমার জন্ম ১৯৪৭-এ এবং আমার জ্ঞান হওয়ার থেকেই অনুরোধের আসর শুনে আসছি। ১৯৪৮-এ আকাশবাণীর চাকরিতে ঢুকেছিলেন যে বিমান ঘোষ তিনিও স্মরণ করতে পারেন না সেই সময়, যখন রেডিয়োতে 'অনুরোধের আসর' বলে কিছু ছিল না। অনুরোধের আসরের প্রথম গানটিও যে কার অনুরোধে বেজেছিল সেই ইতিহাসও ইতিহাসে তলিয়ে আছে। বিমানবাবুর শুধু মনে আছে পাঁজা পাঁজা চিঠি একসময় আছড়ে পড়ত আকাশবাণীর দপ্তরে বাংলা আধুনিকের অনুরোধ নিয়ে। অনুরোধের বহরেই টের পাওয়া যেত গানের বাজারে কার কী দর, কার কী কদর। অধিক অনুরোধের ভারে এককেটা জনপ্রিয় নাম নেমে আসত আসরের শেষ লগ্নে, যা কিনা আজকালকার বাণিজ্যিক বোলচালে 'প্রাইম টাইম'। তবে অনুরোধের আসরের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দু-দিনের দুটো গোটা আসরই হয়ে উঠেছিল প্রাইম টাইম। অনুরোধের আসরে রেকর্ড বাজা ছিল শিল্পীর শেষ স্বীকৃতি এবং সে-আসরে নিয়মিত অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ ছিল এক ধরনের ছোটোখাটো অমরত্ব। শুধু অনুরোধের গান ঘোষণা করেই চল্লিশের দশকে একজন নিবেদক গৃহে গৃহে পরিচিত, আলোচিত, প্রিয় নাম হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পুরুষ, তাই প্রতিটি গান যেন তিনি নিবেদন করতেন কোনো অদৃশ্য প্রেয়সীকে। তাঁর ভাষা ছিল হেমন্ত, ধনঞ্জয়, জগন্ময়, শচীনদেব, তাঁর নিজের নাম ইন্দু সাহা। তিনি কিন্তু অনুরোধের আসরের স্বর্ণালী সময়গুলো—পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশকের তিন-চতুর্থাংশ—দেখে যেতে পারেননি। দাঙ্গার দিনে গার্স্টিন প্লেসের স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন।



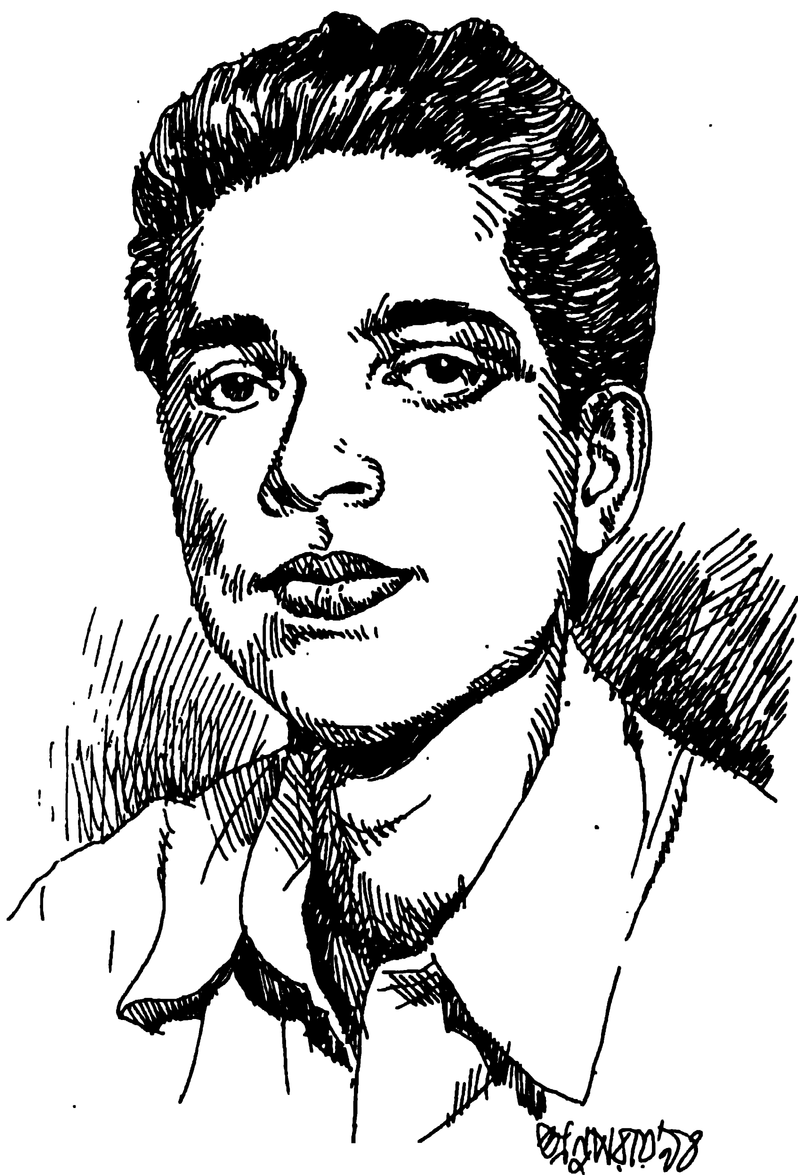
শিল্পীদের ক্ষেত্রে অন্তত অনুরোধের আসর ছিল একটা মঞ্চ। নতুন গান রিলিজ হওয়ার পর হয়তো একটা অগ্নিপরীক্ষাও। পুজোর মাস দেড়েক আগে থেকে আসরটি সাজত নতুন নতুন গানের মালায়, গানই হত গানের বিজ্ঞাপন। নিলামে দর দেবার মতো একেকটা ডাক পড়ত গানের পরে পরে। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির ওই গান চাই। এরকম এক ডাক তুলেছিল আমার ছেলেবেলার দুই বন্ধু, দুই ভাই, ভোম্বল আর ক্যান্টা। সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে ওদের, ওরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে আসামে ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করবে বলে। সঙ্গে ওরা নিয়ে যেতে চায় শুধু একটি ৭৮ আরপিএম ডিস্ক। সদ্য ওই গানটি বেজেছে অনুরোধের আসরে। যাবার দিন দুপুরে ওদের বড়দা রেকর্ডটা কিনে এনে তুলে দিল ওদের মায়ের হাতে। আমি আর আমার দুই দিদি গিয়েছি ছেলেদের চোখের জলে বিদায় দিতে। সমানে শাড়ির খুঁটে চোখের জল মুছতে মুছতে মাসিমা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন হাতে-ঘোরানো গ্রামোফোনের টার্নটেবিলে। তারপর রেকর্ডের আগায় ইস্পাতের পিন ঘষা খেতেই বেজে উঠল পান্নালাল ভট্টাচার্যের অমর, অতুলনীয় কণ্ঠে সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ বাংলা গান, 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা।' এত দুঃখ ও কান্নার সঙ্গে মিশে গানটা আমার জীবনে এসেছিল যে অনুভূতির আক্রমণের বাইরে দাঁড়িয়ে খোলা দৃষ্টিতে গানটিকে বিচার করতে আমার অনেক সময় লেগে গিয়েছিল। ক্রমে দুপুরের স্মৃতি কাটিয়ে যখন 'আমার সাধ না মিটিল'-কে উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি তখন একদিন খবরের কাগজে পড়লাম পান্নালালের আত্মহত্যার খবর। এখনও চোখে ভাসে পান্নালালের সেই অতি সাধারণ, সিঙ্গল কলাম ছবিটা। সেদিন থেকে যখনই অনুরোধের আসর চালিয়েছি হৃদয়ের কোথায়, অন্তঃস্তলে একটা আর্তি থেকে গেছে, 'আহা, যদি পান্নালালের একটা গান বাজে!'

গোটা অনুরোধের আসরই ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির গভীর আর্তির ধ্বনিমূর্তি, ধ্বনিরূপায়ণ। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কিশোর, সদ্যযুবা, যুবক ও মধ্যবয়স্কদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ছিলেন হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না, শ্যামল, মানবেন্দ্র, সতীনাথ, সুবীর, তরুণ, দ্বিজেন; বিশেষ বিশেষ মনোভাবের মানুষের জন্য অখিলবন্ধু এবং সমস্ত রোমান্টিক বাঙালির জন্য তালাত মাহমুদ ওরফে তপনকুমার। বাঙালি মেয়েদের জন্য সে দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন সন্ধ্যা, লতা, গীতা, প্রতিমা, সুপ্রীতি, উৎপলা, আলপনা, গায়ত্রী, নির্মলা, বাণী, ইলা, বনশ্রী ও পরের দিকে আরতি। আমার এক বন্ধু অরুণ তার বান্ধবীকে গান শোনাত অনুরোধের আসরে মানবেন্দ্রর গানের মাধ্যমে। পরে মানবেন্দ্রর



কাছে এই কথা কবুল করতে শিল্পী বললেন যে, তাঁর গলায় নিজের লেখা গান দিয়ে গীতিকার শ্যামল গুপ্ত নিজের হৃদয়ের অগাধ প্রেম উজাড় করে দিতেন ভাবী স্ত্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে। আর এভাবেই গজিয়ে উঠেছিল শ্যামলের কথায় মানবেন্দ্রর সুরে ও কণ্ঠে অসাধারণ বাংলা আধুনিক, 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি/তবু মনে হয় এ যেন গো কিছু নয়/কেন আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়।'

অনুরোধের আসরের স্টার ছিলেন বলা যায় হেমন্ত, লতা ও সন্ধ্যা। এঁদের গান ছিল আসরের অন্তিম গান। এঁদের ঠিক আগেই আসতেন মান্না, ধনঞ্জয়, শ্যামল ও গীতা। আরেকটু আগে সতীনাথ, মানবেন্দ্র, উৎপলা, প্রতিমা, সুপ্রীতি। আসরের মুখপাতে থাকতেন কখনও আলপনা, কখনও সনৎ সিংহ, যাঁরা ছিলেন বলা চলে মুড স্টার। আসরের মাঝামাঝি অংশে আসতেন পান্নালাল ও তাঁর বুক জুড়োনো শ্যামাসংগীত। আসরের প্রথম ভাগেই হঠাৎ একদিন আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম এক অনবদ্য রোমান্টিক কণ্ঠ সুবীর সেন। ওঁর 'মোনালিসা, তুমি কে? বলোনা' কি 'এত সুর আর এত গান যদি কোনোদিন থেমে যায়'। গানগুলো আসাতে বহু উঠতি প্রেমিকের দারুণ সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। তবে সে ভাবে দেখতে গেলে পঞ্চাশের দশকে যুবকদের সত্যিকারের মাথা-খাওয়া গানের জোগান দিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র তাঁর বেসিক বাংলা গানের মাধ্যমে। একটা তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অর্জনের ক্ষমতা ছিল শ্যামলের গানে। ওঁর গাওয়া 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা' কি 'সারা বেলা আজি কে ডাকে' জাতীয় গান অনুরোধের আসর গড়িয়ে পুজোর প্যান্ডেল এবং পুজোর প্যান্ডেল থেকে সংক্রামক ভাবে পার্কে পার্কে যুবকদের ঠোঁটে পৌঁছে যেত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। অভিজাত বাংলা গানের পথপ্রদর্শক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাইতেও ডাকসাইটে ফিল্ম মিউজিক কম্পোজার। হিন্দি হিট গান রচনার ফাঁকে তিনি কলকাতা ঘুরে যান এবং 'শাপমোচন'-এর মতো তুঙ্গ জনপ্রিয় বাংলা ছবির তুঙ্গ জনপ্রিয় গানেরও সুর করে দেন। উত্তমকুমারের সঙ্গে ওঁর কণ্ঠ এবং সুচিত্রা সেনের সঙ্গে সন্ধ্যার কণ্ঠ গাঁটছড়া বাঁধছে; এবং এইসব ফিল্মি গানের ফাঁকে তিনি বাংলায় পুজোর গানও রেকর্ড করেন কখনও নিজের, কখনও সলিল চৌধুরীর সুরে। তিনি নিজের সুরে নিজের কণ্ঠে তোলেন 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না/ও বাতাস আঁখি মেলো না/আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে' আবার লতার কণ্ঠে নিজের সুরে তুলে দেন 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে'। হেমন্তের কণ্ঠে বা সুরে এইসব গান তো তাদের যুগের উপযোগী ছিলই সেই সঙ্গে তারা যে আগামী শতকেও বাজার মতো গুণ ও



প্রতিভা নিয়ে এসেছে তা বুঝতে আমাদের আরও বেশ কিছু বছর কেটে গেল। যখন অনুরোধের আসর গোল্লায় গেছে, বাংলা আধুনিক গোল্লায় গেছে আর স্মৃতিতাড়িত, রোমান্টিক বাঙালি সমানে অতীতের গান ও রেকর্ড হাতড়ে খুঁজে নিতে চাইছে তার মিলিয়ে যাওয়া মনের সুধা। অনুরোধের আসর, সিনেমার গান, জলসার গান ও তাঁর রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে একটা সফিস্টিকেশনের অন্তর্লীন বন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন হেমন্ত; অনুরোধের আসরে তিন মিনিটের জন্য কারও রবীন্দ্রসংগীত বাজলে যখন শ্রোতা রেডিয়ো অফ করে দেয় তখন রেকর্ডে রেকর্ডে, জলসায় জলসায় একটি অভিজাত ও একটি জনপ্রিয় গানকে তিনি পাশাপাশি ধরে রাখতে পেরেছিলেন। আধুনিক গানের অনুরোধের আসরের দিন ফুরোলে রেডিয়োতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসংগীতের অনুরোধের আসর। বহুল প্রচার ও বেশ কিছুটা অবান্তর প্রচারের ফলে রবীন্দ্রসংগীত তার জনপ্রিয়তা হারালে শেষোক্ত অনুরোধের আসরটিরও আকর্ষণ লুপ্ত হল।

বিরহের বাংলা আধুনিকে একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন মান্না দে। এটা পঞ্চাশের দশকের শেষ দিককার ঘটনা। 'এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি/মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়' গান দিয়েই বোধহয় এই জনপ্রিয়তার সূত্রপাত। এরকম একটা দুর্ধর্ষ, নতুন কণ্ঠ (বাংলা গানে মান্নার আগমন কিছুটা দেরিতেই) যে অচিরেই জনপ্রিয় হবে তাতে খুব একটা সন্দেহ কারও ছিল না। তবে পরপর তিনি যে অসাধারণ বাংলা আধুনিক সমাজকে দিতে থাকবেন তার চমৎকারিত্ব ও প্রাচুর্য সম্পর্কে সত্যিই কারও কোনো ধারণা ছিল না। ফলে 'এরই নাম প্রেম', 'জীবনে যত ব্যথা পেয়েছি', 'আমি সাগরের বেলা, তুমি দুরন্ত ঢেউ', 'আমি নিরালায় বসে লিখেছি আমার স্বরণবীণ' গানগুলো অতি অল্পকালের মধ্যে মান্নার স্টার রেটিং উঁচু করে দিল এবং অনুরোধের আসরে তাঁর গানের সময় নেমে এল শেষের কাছাকাছি।

অনুরোধের আসরের ফর্মাটের সঙ্গে কিছু শিল্পীর কিছু গান এত ভালো মিশে গিয়েছিল যে তাদের বাদ দিয়ে অনুরোধের আসরের কথা ভাবা যেত না। হেমন্তর 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার' তো ছিলই (যাদের বলা যায় আর্কিটাইপাল অনুরোধের আসর-গান) সেই সঙ্গে ছিল শচীনদেব বর্মনের 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা মন নিলা রে/কেন মন দিলা না?', 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা', 'টাগডুম টাগডুম বাজে, বাজে ভাঙা ঢোল,' 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই/সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি', ধনঞ্জয়ের 'দোলে শাল-পিয়ালের বন' কি 'শোনো, শোনো, কথাটি শোনো', সন্ধ্যার 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা', 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' কিংবা লতার গলায় সতীনাথের সুরে 'কত নিশি গেছে নিদহারা,



কত ফুল গেছে ঝরে'। এইসব গানের পাশাপাশি একেক দিন আমাদের হৃদয় আলোকিত করে ঝলসে উঠত জগন্ময় মিত্র, রবীন মজুমদার, সত্য চৌধুরীর গান। রবীন মজুমদারের 'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' গানটি বাজলে সারা ঘরে একটা সম্ভ্রমের নিস্তব্ধতা নেমে আসত। বাড়ির ও পাড়ার প্রাচীনরা উন্মুখ হয়ে থাকতেন এইসব শিল্পীদের গানের জন্য। তাঁরা একই সঙ্গে বিস্মিত ও প্রফুল্ল বোধ করেছিলেন যখন ভারী অঙ্গের গানের তালিম পাওয়া অখিলবন্ধু ঘোষ গেয়ে উঠলেন 'ও দয়াল বিচার করো' আর 'ওই যে আকাশের গায়ে দূরের বলাকা ভেসে যায়' গোছের চমৎকার বাঁধুনির সুরেলা আধুনিক। এই সময়েই অখিলবন্ধু একটি সাড়া জাগানো প্রেমের গান গেয়ে বসেছিলেন যা শুনে বয়োজ্যেষ্ঠরা রীতিমতো বগলবাজানো শুরু করেন। শিল্পী ও গানটা উভয়েই যে কত টেঁকসই তার প্রমাণ পেলাম ক'বছর আগের পয়লা বৈশাখে দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে অখিলবন্ধু যখন ধরলেন সে আসরের শ্রেষ্ঠ নিবেদন, 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা, আমি কাঁদি সাহারায়।'

অনুরোধের আসরের তেমন কিছু শিল্পীকেও আজ মনে পড়ে যাঁরা কিছুটা বিস্মৃতির কুয়াশায় ঢাকা পড়লেও তাঁদের কিছু কিছু গান এখনও সুগন্ধ হারানো প্রেমের মতো কখনো-সখনো আনন্দ-বেদনার কারণ হয়ে ওঠে নিজের অজান্তেই। এরকম এক শিল্পী হলেন প্রয়াত দীপক মৈত্র, যাঁকে মনে করিয়ে দেয় একটি গান যার লিরিক ও সুর আজকের যে-কোনো বাজারি আধুনিককে লজ্জিত করবে। গানের কথা 'এ তো নয় শুধু গান/এ-যেন আমার কিছু অনুরাগ, আর কিছু অভিমান।' একেক দিন মনে পড়ে শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর গান 'মোর গান একি সুর পেল রে।' এই শিল্পীও নেই, কিন্তু তিনি ছড়িয়ে আছেন তাঁর সুরে করা অন্যের গাওয়া অজস্র, অসংখ্য গানে। আর মনে পড়ে দিলীপ সরকার, মলয় মুখোপাধ্যায়কে। শ্রোতার চোখের জল ফেলানো এক অসম্ভব সুন্দর গান নিয়ে মলয় মুখোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন অনুরোধের আসরে। রাতারাতি নাম করার পর হঠাৎ এক জলসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ওঁর। ক-দিন পর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে ওঁর অনুষ্ঠানে ওঁর হয়ে ওঁর গান গাইতে এলেন ওঁর সহোদর ভাই। গান— 'কিছু নেই তবু দিতে চাই/তুমি না যেন বোলো না।' আর এইসব করুণ, হৃদয় রিক্ত করা গান শুনলে কেবলই স্মরণে আসে অনুরোধের আসরের ওই অনুপম শিল্পীটিকে—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম' গেয়ে যিনি প্রায় একটা নতুন ট্র্যাডিশন তৈরি করে বসেছিলেন এবং নিজে গেয়ে ও অন্যের গানে সুর করে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চালিয়ে গিয়েছিলেন বহুকাল। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোর মালঞ্চে



বসন্ত নাই রে নাই' গোছের আপাতদুঃখী গানগুলোতে আসলে কীরকম খুশি-খুশি ভাবও আশ্লিষ্ট থাকত। কিন্তু সতীনাথে পৌঁছে আমরা বাস্তবিকই গভীর বেদনার মুডে নিক্ষিপ্ত হতাম। তারপর প্রকৃত তৃষ্ণার সঙ্গে অপেক্ষায় থাকতাম হেমন্ত লতা ও সন্ধ্যার গানে মনের রং বদলের জন্য!

এইভাবে আমরা তিন-তিন মিনিটের একটি-একটি রেকর্ডের ৭৮ পাকে বাঁধা পড়েছিলাম অনুরোধের আসরের সঙ্গে। অনুরোধের আসর ছিল আমাদের পারিবারিক জলসা। একটু বড়ো হতে যখন প্রেমের গানের লিরিকের ভাবসম্প্রসারণ করতে শিখলাম তখন মাঝে মাঝে বন্ধুর বাড়িতে অনুরোধের আসর শোনা অভ্যাস করলাম। তাতে একটু সূক্ষ্ম স্বাধীনতাবোধ জন্মাল। বিশেষ করে বন্ধুর বোনের উপস্থিতিতে অনেক গানেরই একটা অতিরিক্ত অর্থ খুঁজে পেলাম। কোনো গর্হিত অভিলাষ নেই, তবু বালিকার এক চোরা চাহনি যেন রক্তের স্রোতের মধ্যে গিয়ে দোলা দিত। বুঝতে পারতাম গানও কীভাবে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, রক্তে গিয়ে মেশে। আর এও মনে আছে যে এরকম এক বালিকা বান্ধবী যখন তার পরিবারের সঙ্গে পাড়া ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতার কোথাও উঠে গেল তখন মনের ব্যথায় বহুদিন অনুরোধের আসর শুনতে পারিনি। শুনলেই মনে হত যেন সব গায়িকার কণ্ঠে সেই যেন আমাকে গান শুনিয়ে যাচ্ছে। আর বিষণ্ণ মনে ভাবতাম, ও কি আমার কথাও শুনে নেয় অনুরোধের আসরের গানে?

এভাবে ক্রমে ক্রমে অনুরোধের আসর হয়ে উঠেছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির খোলা প্রেমপত্র। মনে ভাব থাকলেই যে-চিঠি লেখা যায়, মনে ভাব থাকলেই যে-চিঠি পড়ে নেওয়া যায়।

১৯৯৪

সেই শনিবারের রাতজোড়া জলসা

আমার প্রথম জলসা শোনা বাহান্ন বা তিপান্ন সালের এক বৃষ্টিভেজা শীতের সন্ধ্যায়, একটা মস্ত বড়ো গ্যারেজের পিছনের দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে। গ্যারেজে তখন শতখানেক লোক র‍্যাপার-চাদরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে, ঘরের আলোকসজ্জা বলতে একটা দেড়শো পাওয়ারের ডুম। কোনো মাইক নেই, কিন্তু একটি মানুষের গলায়, দরদে ঘর গমগম করছে। বড়োদের মজলিশে ব্যাপারটা কী হচ্ছে, তলব করতে গিয়ে আমি ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছি ঘুলঘুলির সামনে। ভিজে সন্ধেয় গা-টা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে একটু-আধটু, কিন্তু প্রকৃত প্রকম্পন হচ্ছে হৃদয়ে। আমি গায়কের ভক্ত হয়ে পড়ছি।

পরে বড়োদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে ভদ্রলোকের নাম ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। আর সেই সন্ধ্যার ওই জলসার উদ্যোক্তা তখনকার মধ্য কলকাতার হিরো, ক্রিক রো পাড়ার নিজস্ব নেপোলিয়ন ভানু বোস। জলসার গ্যারেজটা ছিল আমার বাবার, যে ২৬সি নং বাড়িতে ভানু বোসের বিখ্যাত কালীপুজোরও সূত্রপাত হয়। পরের বছর পুজো ও জলসা উঠে যায় ক্রিক রো-র রাস্তায় এবং এমন জাঁক করে সব কিছু ঘটতে থাকে যে, গোটা ক্রিক রো-র বাসিন্দাবর্গ নিজেদেরকে একটা আলাদা জাতের মানুষ হিসেবে ভাবতে শুরু করে।

ভানু বোস—যাকে সমস্ত পাড়া 'ভানুদা' বলে জানত—নিজেকে মস্তান বলে ভাবতেন না কখনও এবং ওঁকে 'শেষ মস্তান' বিবেচনা করে আমি একটা লেখা লিখলে উনি বেশ দুঃখই পেয়েছিলেন। অথচ ভানুদার ভক্ত আমরা যে নিরুপায়! ওঁর মতো শক্তিশালী, সাহসী, উদ্যোগী গোষ্ঠীনেতা তো দেখলামই না এ জীবনে। ভয়ে হোক, সমীহে হোক সবাই ওঁকে মানত এবং উনি হুকুম-নির্দেশ করে এর টাকায়, ওর পরিশ্রমে একটা-না-একটা চাঞ্চল্যকর কাজ করেই যেতেন। তা কালীপুজো হোক, নেতাজির জন্মদিবস পালন হোক, দরিদ্রনারায়ণ ভোজন হোক, টেনিস বলের টুর্নামেন্ট হোক চাই জলসা। তিপান্ন-চুয়ান্নয় শুরু হয়ে দেড়-দু'বছরের মধ্যে ভানু বোসের সারারাত্রিব্যাপী

জলসা এক কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আধুনিক বাংলা গান যখন তার স্বর্ণযুগে পৌঁছচ্ছে একটু-একটু করে, তখন তার সেরা শিল্পীদের নিয়ে প্যান্ডেলের উন্মুক্ত আসরে এহেন আয়োজনের ফর্মাট নির্মাণ করে ভানুদা একটা ছোটোখাটো বিপ্লবই ঘটিয়ে বসেছিলেন যেন। বিনামূল্যে এভাবে হাজার-হাজার লোককে গান শোনানোর জন্য ওঁর যে জনপ্রিয়তা তৈরি হল, কিছুদিনের মধ্যে তা ফিল্ম-তারকাদের সঙ্গেই তুলনীয় ছিল। আর তখনকার দিনের সব তারকা—উত্তম, বিশ্বজিৎ দিয়ে শুরু—শীতের ওই একটি রাত ভানু বোসের সঙ্গে মঞ্চ এবং মাইক ভাগ করে নেওয়াটাকে একটা প্রথায় পরিণত করেছিলেন। রেডিয়োর 'অনুরোধের আসর'-এর ঢঙে উঠতি শিল্পীদের দিয়ে আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বড়ো নামের গাইয়েদের জায়গা করে দেওয়ারও একটা বিধি আপনা-আপনি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর আজকের দিনের জলসায় যেমন শিল্পীরা ঘড়ি ধরে এসে স্টেজ দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েন তখন এসব কিছু ভাবাই যেত না। রাত দুটোর আর্টিস্ট শ্যামল মিত্র হয়তো সাড়ে দশটায় এসে লুচি মাংস মিষ্টি খেয়ে নিলেন একপেট। খেয়ে সিগারেট বাগিয়ে আড্ডা জমিয়ে দিলেন আসর শেষ করা জহর রায়ের সঙ্গে। আড্ডা চলছে, অটোগ্রাফ চলছে, পুজোর রেকর্ডের সেল নিয়ে আলোচনা চলছে—স্টেজে ওঠার বা বাড়ি ফেরার তাড়া কারও আছে বলে মনে করার জো নেই। সবাই শুধু একটু সন্ত্রস্ত থাকত একটা ব্রাহ্মমুহূর্তের জন্য, যখন গিলেকরা পাঞ্জাবি, ধুতি আর শালে এসে সভায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বেন 'অগ্নিপরীক্ষা', 'হারানো সুর', 'শাপমোচন'-এর উত্তমকুমার। তখন গোটা পাড়া জাগিয়ে একটা হইহই পড়বে, সাত-দশজন সুবেশ মহিলা ছুটে গিয়ে ঘিরে ফেলবেন নায়ককে, আর তাঁদের ভাগানোর জন্য 'দিদি! দিদি!' করে জোড়হস্তে এধার-ওধার থেকে ঝাঁপ দেবে ডজনখানেক ভলান্টিয়ার। মহিলারা সরে গেলে মহিলাদের আরব্ধ কাজটা এরাই তখন সমাপ্ত করায় প্রবৃত্ত হত— নায়ককে ছোঁয়া, তাঁকে ঘিরে ধরে ফ্যালফ্যাল করে দেখা, ওঁর হাত নিয়ে নিজেদের মাথায় ঘষা কিংবা অবান্তর রকম পেন্নাম ঠুকতে থাকা। উত্তমকুমার তখন সলজ্জভাবে বলতেন, হয়েছে, হয়েছে। ছোট্‌কা কোথায়? এই ছোট্‌কা হলেন ভানু বোস।

ছোট্‌কা ওরফে ভানুদা'র একটা মস্ত বড়ো গর্বের ব্যাপার ছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে পাশাপাশি স্টেজে দাঁড়ানো। তখন যদি 'শোলে'র গব্বর সিং-এর ঢঙে স্টেজে ডায়ালগ আউড়ানোর চল থাকত তাহলে ক্রিক রো-র জলসায় উত্তমকুমারকে যে কত কী আবৃত্তি করে যেতে হত বছরের পর বছর তা বলে বোঝানো যাবে না। তখন সব যুবকের ঠোঁটেই 'সাগরিকা',



'শাপমোচন', 'পথে হল দেরী'র সংলাপ, কিন্তু সংলাপ শোনানোর বায়না কেউ তোলেনি কখনও। উত্তম শুধু বলতেন বাঙালির ভালোবাসা পাওয়ায় কৃতজ্ঞতার কথা, বাঙালি মা-বোনেদের রুচির কথা, নিজের বাঙালিত্বে গর্বের কথা, ভানু বোসের বন্ধুত্বের কথা। আর তাতেই কান ফাটানো হাততালি অবিরত।

উত্তমের দেখাদেখি বিশ্বজিৎও একবার বেশ ফ্যাঁকড়ায় পড়লেন। 'কী বলি, কী বলি' ভাব, কিন্তু কী বলবেন? বাঙালিয়ানা নিয়ে উত্তমের বক্তৃতা তো পেটেন্ট করা। অথচ 'মায়ামৃগ'-র হিট নায়কের মুখে পাবলিক কিছু শুনতে চায়। তখনও বিশ্বজিতের গানের গলার কথা কেউ জানে না। কিন্তু মুশকিল আসান হয়ে স্টেজে সেদিন উদিত হলেন ধুতি-চাদরে পেল্লায় গর্জাস এক সুপুরুষ বাঙালি কণ্ঠশিল্পী—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি বিশ্বজিৎকে দেখিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বললেন, আপনারা ওঁকে দেখুন আর আমার গান শুনুন। বলেই ধরে ফেললেন, 'মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য'। এরপর আর বলার দরকার হয় না যে, এই গান শুরুর পর প্রথম পঞ্চাশ সেকেন্ড হর্ষধ্বনির তোড়ে কারও পক্ষে কিছুই শোনার উপায় রইল না।

ক্রিক রো-র জলসার গভীর মুহূর্তগুলোর মধ্যে পড়ে ওই মানবেন্দ্রর কণ্ঠে সদ্য রেকর্ড হওয়া একটি গানের নিবেদন—'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। শ্যামল মিত্রর গলায় 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা'। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশনে 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম'। আর—হায়! বলতেও কণ্ঠরোধ হয় আজ—ধনঞ্জয়ের শোনানো 'মুক্ত কর মা মুক্তকেশী' এবং তাঁর অনুজ পান্নালাল ভট্টাচার্যের উপহার 'সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'। ভানুদার ভীষণ প্রিয় গান ছিল শ্যামাসংগীত, তাই ধনঞ্জয় ও পান্নালাল ছাড়া তাঁর জলসার কথা ভাবাই যেত না। এঁদের গানের সময় তিনি ডায়াসের নীচে চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হয়ে বসতেন। বয়স্ক মহিলারা হাতজোড় করে কপালে ঠেকাতেন যখন পান্নালাল গাইতেন, 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা'। চোখ থেকে জল পড়ানো গান যদি কেউ কোনোদিন গেয়ে থাকেন তবে সেই লোকটি হলেন পান্নালাল। অল্পবয়সি আমাদের ধারণা ছিল, পান্নালালের গলা দিয়ে রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ ঠাকুর, কমলাকান্ত ঋষি গান করেন। আমার কাকা যিনি জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র, ভীষ্মদেবের বাইরে কোনো বাঙালির গানকে পাতে দেওয়ার যোগ্য মনে করতেন না, জলসার দিন উশখুশ করতেন পান্নালালের গানের জন্য। ওঁর গান শোনা হলেই তিনি শুতে চলে যেতেন।



কিন্তু রাতভর ফাংশনে হাজির থাকতেন ক্রিক রো ও সংলগ্ন তিন-চার পাড়ার মা-বোন-মাসিরা। কী সুন্দর সুন্দর সব খয়েরি, বেগনি, সুলেখা নীল, রামধনু রঙের শাল জড়িয়ে মেয়েরা দল করে গিয়ে বসতেন, প্রেমের গানে কাঁদতেন, নির্মলেন্দু-অপরেশ লাহিড়ির পল্লিগীতিতে হাসতেন, জহর-ভানুর কমিক-এ হেসে গড়িয়ে পড়তেন, উত্তম-বিশ্বজিৎকে দেখে আরক্ত, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চিত্রার্পিত হয়ে পড়তেন। আমি বিশ্বাস করি না কোনো জমিদার বাড়ির কালোয়াতি জলসায় মহিলারা এইভাবে আত্মনিবেদন করতে পেরেছে বলে। এখনও বহু উচ্চাঙ্গ জলসায় মহিলারা গম্ভীর মুখ করে অনেক কিছুই শোনেন, কিন্তু তাঁদের দেখে বাল্যের সেই বিস্ময়বোধ কখনও আমার হয় না। ভেতরে ভেতরে ওঁদের অনেকেই হয়তো ঘুমিয়ে থাকেন জাগার ভান করে। এই নিয়মরক্ষার গান শোনার সঙ্গে আমূল প্রভেদ সেদিনের সেই সোনাঝরা সন্ধ্যা ও হিমঝরা রাতের গান শোনা। সমস্ত পড়শি মহিলার ভেতরকার প্রেমিকাটিকে জাগরূক করে তুলত ভানু বোসের জলসা, ওই জলসার আসর ছিল মধ্য কলকাতার কয়েকটি পল্লির নারীসমাজের বিমূর্ত বাসরঘর। নারী-স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগের বহু আগেকার ওই সময়ে বহু মহিলাই হয়তো ওই একটি রাতের জন্যই বিনা পাহারায় বাইরে থাকতে পারতেন সারাক্ষণ। সন্ধে সাতটায় গান শুরুর অঢেল আগে থেকেই তাঁরা রাতের খাওয়া শেষ করে জমায়েত হতেন প্যান্ডেলের চত্বরে। তখনও হয়তো পুরোপুরি চেয়ার বসানো হয়নি, কিন্তু কারওই যে আর তর সয় না। যাঁরা সৌভাগ্যবতী তাঁরা হয়তো বাড়ির বারান্দা বা ছাদে বসেই সবটা উপভোগ করতে পারতেন, কিন্তু মনে মনে যে প্যান্ডেলের মহিলাদের হিংসা করতেন না তা কিন্তু নয়। প্যান্ডেলে বসার একটা বাড়তি টান ছিল পাড়ার উঠতি যুবাদের তোয়াজ ও সমাদর। সুন্দরী যুবতীদের দর সেদিন এক লাফে সুচিত্রা সেনের কাছাকাছি চলে যেত। লেটেস্ট ফ্যাশনের জ্যাকেট, স্যুট ও ধুতি-পাঞ্জাবি কম্বিনেশনে যুবকরা তাদের চোখে পড়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ত। খুচরো অ্যাফেয়ার কিছু হয়ে যেতই, উত্তমের কাছাকাছি যেতে পারত যে-পুরুষ তার একটা তাৎক্ষণিক স্টার ভ্যালু তৈরি হত। পরের দিন হয়তো শুরু হয়ে যেত আলাপ-হওয়া সুন্দরীকে চিঠি লেখা। তাতে কোটেশন থাকত জলসায় শোনা গানের লাইন। হয়তো লিখল, 'কাল মানবদা'র পাঁচ নম্বর গানটা ছিল আমার হয়ে তোমার জন্য গাওয়া।' বলা বাহুল্য, পাঁচ নম্বর গানটিকে হতেই হত 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি।'

তা বলে সব সুধাই কি এক পাত্রে মেলে? তেমনই হেমন্ত, সন্ধ্যা, গীতা দত্তকে আমরা ক্রিক রো-র জলসায় পাইনি। হেমন্তবাবু তখন বোম্বাই-

কলকাতা করতে ব্যস্ত, সন্ধ্যা তো বরাবরই জলসা বর্জন করে গেলেন, গীতা দত্ত তখন মিসেস গুরু দত্ত, ফলে সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এই তিন মর্মবিদারী অনুপস্থিতির জন্য আমরা কোনোদিন ভানুদাকে দায়ী করিনি। (তিনি তো বম্বের থেকে হেমন্তকণ্ঠ সুবীর সেনকে আনিয়েও পেশ করেছিলেন আমাদের কাছে!) একটি শিল্পীকেও পারিশ্রমিক না-দিয়ে, শুধু ভালোবাসা ও বন্ধুত্বে আবদ্ধ করে, বিনামূল্যে মধ্য কলকাতার বাঙালি শ্রোতাকে যা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা স্বর্ণমুদ্রায়ও পরিশোধ্য নয়। শুধু ভালো গান নয়, একটা ভালো জীবন দিয়েছিলেন আমাদের। শীতের রাতে আধুনিক গানের একটা কালচার উপহার দিয়েছিলেন; গান, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, ভাষণ, উত্তমকুমার মেশানো একটা প্যাকেজ হাতে তুলে দিয়েছিলেন যা আমাদের অক্ষয় স্মৃতি হয়ে রইল। পরে বাংলা গান ও ফাংশনের অধঃপতনের যুগে ভানুদাই আগ বাড়িয়ে বন্ধ করে দিলেন তাঁর জলসা। দিয়ে যে খুব মনমরা হয়ে পড়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে যখন শেষবারের মতো দীর্ঘক্ষণ কথা বললাম ওঁর সঙ্গে, বেশ বুঝলাম জলসাটা মরে গিয়ে উনি নিজেও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। মনে হল মানুষটি একটি অন্য যুগেই পড়ে আছেন, এ যুগের গান, জলসা, রাজনীতি, মস্তানি কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। অত বলিষ্ঠ, সুপুরুষ, উদ্যমী শরীরটা অকাল বার্ধক্য ও মৃত্যুকে আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছে।

ক্রিক রো-র জলসার ভোর হতে যে মনোবেদনা শুরু হত আমাদের মধ্যে তার তুলনা দুর্গাপুজোর ভাসানের প্রাক্-মুহূর্তের বিষণ্ণতা। সবাই ব্যাথাতুর, তাই কেউ কাউকে প্রবোধ দিত না। সবাই জানত এর সমাধান বলতে একটা বৎসরকাল প্রতীক্ষা। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, বয়স্ক নারী-পুরুষ সবাই হাই তুলতে তুলতে আশ্রয় নিত বিছানায়। যেহেতু এই জলসা হত শনিবারের রাত জুড়ে তাই পরের দিনটা পাওয়া যেত ঘুমের জন্য। কিংবা স্মৃতির আন্দোলনে বালিশ ভেজানোর জন্য।

চেনা কথা চেনা সুর

এক এক সময় ভারি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। মনের ভিতর স্মৃতি তৈরির কলটা কি খারাপ হয়ে গেল? কেন আর গান শুনে মনে রাখতে পারি না! কী কথা, কী সুর। এক সাংঘাতিক অকাল বার্ধক্যে পৌঁছে আছি আপাতত, স্নান করতে করতে যা-গানই গুনগুনিয়ে উঠি দেখি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার। এখনকার গানের যা রেকর্ড, যা ক্যাসেট পাই তা কেবল পাওয়াই হয়, শোনার পর ভুলে যাই কে দিল, কেন দিল, কার গান। যখন ক্যাসেট বা রেকর্ড কিনতে যাই ঘুরেফিরে সেই আদ্যিকালের গানই সংগ্রহ করে আনি আর মনে পড়ে ছেলেবেলার গুরুজন সমাজকে। যাঁরা আমাদের আধুনিক গানের রুচি দেখে 'ছ্যাঃ! ছোঃ!' করতেন। তখন ওই গুরুজনদের মনে হত বাজে লোক, কানে কালা। না হলে ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, কেষ্টবাবু, তারাপদবাবু কি শচীনকর্তা ছাড়া কি গাইয়ে হয় না? চিৎ হয়ে পড়েও কিন্তু সেদিন আমরা লড়ে গেছি হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না, লতা, গীতা, সন্ধ্যা, সতীনাথ, শ্যামল, মানবেন্দ্রর জন্য।

অকালবৃদ্ধ আমার সঙ্গে আমার একাদশী কন্যা কিন্তু লড়াইও করে না, কারণ ওর হাতে কোনো দিশি অস্ত্র নেই। মরুযুদ্ধে আমেরিকার পেট্রিয়ট দাগার মতো ও আমাকে হেনস্থা করতে চায় মাইকেল জ্যাকসন, মাডোনা, জর্জ বেনসন, হুইটনি হিউস্টন শুনিয়ে। এটা খুব খল যুদ্ধ, কিন্তু এই যুদ্ধ চালিয়েই ও আমার সঙ্গে জিততে চায়, আর জিতে যায়ও। সেদিন ওর মাইকেল জ্যাকসনের 'ডেঞ্জরস' ক্যাসেটটা শুনতে শুনতে একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। গোটা চারেক গানে কী সুর! কী কথা! কী গলা! একেবারে কচি মেয়ের মতো গলা, কিন্তু কী ওস্তাদি, কী মেজাজ, কী নৈপুণ্য সে-গলায়! বার কয়েক শুনে বুঝলাম মাইকেল জ্যাকসন বাস্তবিকই ফেনোমেনন, যা ওঁর 'থ্রিলার' বা 'ম্যাড' অ্যালবাম শুনে টের পাইনি। কিন্তু এসব বুঝেও বেশ কষ্ট হল আমার বালিকাটির জন্য। হাতের কাছে কোনো বাংলা গান পেল না মেয়েটা আমার সঙ্গে লড়ার জন্য। আমার মতো সেও দেখি এখনকার বাংলা



গানের ধার ধারে না। হেমন্ত, গীতা বা লতার বাংলা গান দেখি চুপ করে শোনে, হয়তো বুঝতেও পারে না যে এই গানগুলো ওর বাবারও বাল্যকালের গান। আরও বড়ো হয়ে হয়তো রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি এই গানগুলোই ও নিজের সময়ের গান বলে গাইবে। 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'— মানবেন্দ্রর এই গান শুনে আর গেয়ে আমার কৈশোর আর প্রথম যৌবনের দুপুর কাটত, এই গান ছিল আমার প্রেমপত্র। কন্যা দেখছি আমার চেয়েও কম বয়সে এই গানের প্রেমে পড়েছে।

বুঝি না ওই হাফপ্যান্ট পরা বয়সেই হেমন্ত, মান্না, সতীনাথদের প্রেমে পড়তে হল কেন। ওঁদের ওই রোমান্টিক গান তো বালক বা কিশোরের খোরাক নয়। বাঙালি ছেলেমেয়ে কি বরাবরই কিঞ্চিৎ ডেঁপো? আমার কন্যাও কি তাই? আর সেই ডেঁপোমির প্রধান পৃষ্ঠপোষক কি নন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং? মাত্র চার বছর বয়সে আমার কন্যা আদো-আদো ভাবে গাইত জর্জদা-র রেকর্ড শুনে তোলা 'গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর'। একটি চোদ্দো বছরের কিশোরী আমাকে একটা প্রেমপত্র লিখেছিল একটা আধুনিক গান শোনানোর প্রস্তাব দিয়ে সেই ষাটের দশকের গোড়ায়। সে-গান 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। আর আমি এমন একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম সত্তর দশকের গোড়ায় যে ফ্রক-পরা বয়সেই গলায় তুলে নিয়েছিল 'দুঃখ রাতে কে নাথকে ডাকিলে'। আর এইভাবে রবীন্দ্রসংগীতে-আধুনিকে মিলেমিশে বড়ো হচ্ছে একটার পর একটা বাঙালি প্রজন্ম। উত্তম-সুচিত্রার ছবি, জীবনানন্দের কবিতা, সুবোধ ঘোষ-রমাপদ চৌধুরী-নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গল্পেই বশ হয়ে আছে এক বিস্তীর্ণ বাঙালি জনগোষ্ঠী। আর এই সব কিছুকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে এক অলখ সূত্র—রবি ঠাকুরের গান। ষাটের দশকের শেষাশেষি বাঙালির ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে; বাঙালি এখন সেই জাতি যে ১৯৭১ পূর্ববর্তী স্মৃতিতে ভেসে আছে, ডুবেও আছে।

কাজেই গত এক-দু'দশকে বাংলা গান কী হল না-হল তা নিয়ে গপ্পো ফেঁদে লাভ নেই। গত দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো এরকম—হেমন্তর গানের সুবর্ণজয়ন্তী, ধনঞ্জয়ের গানের সুবর্ণজয়ন্তী, লতার জীবনের ষাট বছর পূর্তি, শ্যামল, কিশোর, হেমন্তর প্রয়াণ। নব্বই দশকে ধনঞ্জয়, সতীনাথ, মানবেন্দ্র চলে গেলেন। চলে গেলেন ইলা বসু, গান থামিয়ে দিয়েছেন প্রতিমা, গীতা, সন্ধ্যা, লতার গান শুনতে হচ্ছে কপি সঙে। তাঁকে, সুবীর সেনকে বা অনুপ ঘোষালকে শুনলে খেয়াল হয় যে বাংলার সব গায়কই কপি সিঙ্গার নন। আর বাংলার পুরুষকণ্ঠ বলতে বোঝায় না কুমার শানু। সুখের বিষয় কুমার শানুর ভক্তরাও স্বীকার করেন যে, শানুর হিন্দি ফিল্মের গানই চলে,

বাংলা গান অচল। এতে বাংলা গানের শ্রোতাদের জীবনের অনেকখানি আপদ চুকেছে। শানুর হাত ধরে যে বাংলা গানকে ১৪০০ সালে পৌঁছোতে হল না, এটা কিন্তু খুব বড়ো সুখবর।

আমার ব্যারোমিটার সেই কন্যার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যতদিন সে হেমন্ত-লতার সঙ্গে মাইকেল জ্যাকসন-ম্যাডোনা মিশিয়ে শুনবে আমি জানব কোনো সমস্যা নেই। পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীত জারি থাকলেই হল। তারপর একদিন ও-ও হয়তো ন্যাট কিং কোল, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা, জিম রিভসের ভক্ত হবে। এক সময় খুঁজে নেবে জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী। আর সেদিন আমার গুরুজনরা, আমি আর ও এক বিন্দুতে এসে দাঁড়াব। রবি ঠাকুরের গান আছে না? —'রবার যেটা সেটাই রবে।'

আপাতত চিৎ হয়ে পড়েও হাত-পা ছুঁড়ে লড়ে যাচ্ছে বালিকা। যেমনটি লড়তাম আমি পাঁচের দশকের শেষ দিকে। ওর মধ্যে আমি একটা হারিয়ে যাওয়া যুগকে দেখতে পাচ্ছি।

১৯৯৩

গলা দিয়ে কিছু বেরোলেই গোল্ড ডিস্ক

সর যো তেরা চকরায়ে/ইঁয়া দিল দিল ডুবা/আ যা পিয়ারে পাস হমারে/কাঁহে ঘবরায়ে'— পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় ভাগের এই চাঞ্চল্যকর গানটি যে মহম্মদ রফির তা মধ্য কলকাতার ছেলেপুলে আমরা বহুকাল অবধি জানতে পারিনি। আমাদের কাছে গানটি ছিল ওমরের। কুড়ি-বাইশ বছরের ফরসা, সুদর্শন মুসলমান যুবকটি ছিল আমাদের অত্যন্ত নিজস্ব মহম্মদ রফি। সেসময় ক্রিক রো পাড়ায় ভানু বোসের সেই বিখ্যাত জলসা ছাড়াও বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো লেগে থাকত আরও বেশ কিছু জলসা-নাটক। অবধারিত ভাবে থাকত একটা রবীন্দ্র-জয়ন্তী জলসা, যেখানে পাড়ার প্রবীণদের উদাত্ত কণ্ঠে 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' জাতীয় কৈশোরিক কবিতার আবৃত্তি আর পাড়ার কিশোরী ও সদ্য যুবতীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও থাকতই থাকত ওমরের কণ্ঠে বোম্বাই ছবির গান। বলা বাহুল্য, জলসার স্টার অ্যাট্রাকশনই থাকত ওমরের গান, যে-ওমর তাঁর গ্ল্যামার ধরে রাখতে স্টেজে উঠত ফুলহাতা মিডনাইট ব্লু বুশ শার্ট আর সাদা ট্রাউজার্সে। আর সেই ওঠার পর বাকি সন্ধেটা চলে যেত ওমরের দখলে।

'সর যো তেরা চকরায়ে' গানটা আমরা ভেবে বসেছিলাম ওমরেরই গান। জলসা শেষে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় ওমরকে ধরে আনত পাড়ার দাদারা এবং ফের এক প্রস্থ চলত ওর হিন্দি গান। তখন সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে 'কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!' ধ্বনি তুলত আর উৎসাহ জোগাত, 'এবার তুই বম্বে গিয়ে প্লেব্যাক শুরু কর।' কিন্তু বাঙালি রাজনীতিকদের কাছে দিল্লির মতো বাঙালি কণ্ঠশিল্পীদের কাছে বোম্বাই চিরকালই দূর অস্ত। একেবারে কেউই যে নেই তা নয়, কারণ রমরম করে বোম্বাইতে তখন হেমন্তকুমার, আছেন মান্না দে-ও, নাম করার চেষ্টায় আছেন সুবীর সেন, সলিলের সুরে গান গেয়ে এসেছেন বা গাইতে যাবেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ও, তা হলেও বোম্বাই তখন রফির দখলে, দিনে তিনটে করে গান রেকর্ড করে চলেছেন। অথচ আমরা দেখছি এই রফিকণ্ঠ ওমর কীরকম কপালদোষে কলকাতায়



পচছে। এরকম এক দিন চৌরঙ্গির সাবেক 'কল্পতরু' রেস্তোরাঁয় চার আনার কয়েন ফেলে জুক বক্সে 'সর যো তেরা' শুনে প্রথম ঠাওর হল যে গানটা আসলে রফিরই। কিন্তু এও বুঝলাম যে ঘরের পর্দার ওপারে বসে ওমর এ গান গাইলে আনাড়ির পক্ষে বলা মুশকিল হবে যে স্বয়ং রফি সেটা গাইছেন না।

এই ওমর কিন্তু কালে কালে হারিয়েই গেল। তখন কপি সঙের এই দেদার বাজার নয়, জলসায় জলসায় কলকাতার বড়ো গাইয়েরাই দেড়শো-দুশো টাকায় গাইছেন, ক্রিক রো-র মতো দুটি-চারটি পাড়াতেই নিয়মিত ডাক পায় বেচারি, আর বাকি সময় বন্ধুবান্ধবের ডেরায় মজলিশি আড্ডায়। সেখানে পয়সা নেই, এক পেট খাওয়া আছে আর মদ। শেষ দ্রব্যটিই শেষে কিনে নিল যুবককে। বোম্বাইয়ের বদলে কোথায় যে অবশেষে গেল কেউ জানলই না। শুধু এটুকুই স্মৃতি হয়ে রইল যে ওর গলায় রফির 'চৌদভি কা চাঁদ হো ইয়া আফতাব হো' শুনে একবার চোখে জল এসেছিল আমার।

আর ভয়ানক কান্না পেয়েছিল একদিন বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে বন্ধু সেতারী সুব্রত রায়চৌধুরীর সঙ্গে উস্তাদ আলি আকবর খাঁর সরোদ শুনতে গিয়ে। সরোদ অনুষ্ঠানের আগে বাংলা আধুনিক গাওয়ার কথা ছিল উঠতি বাঙালি শিল্পী মলয় মুখার্জির। মলয়ের গলায় মান্না দে-র কণ্ঠের ছাপ থাকলেও বেশ একটা নিজস্ব, সুরেলা, অনুভূতিময় স্টাইল ছিল যুবকের। অনুরোধের আসরে ওঁর গান শুনে প্রায় চমকে উঠেছিলাম। অনেকেই বলাবলি করছিল যে এই এক দারুণ শিল্পী এল বাজারে। কিন্তু আমাদের নিরাশ করেই মলয়ের বদলে অন্য এক শিল্পী উঠলেন মঞ্চে এবং ঘোষণা হল যে নির্দিষ্ট শিল্পীর অনুপস্থিতিতে আজ গান পরিবেশন করবেন তার ছোটো ভাই। ছোটো ভাই মাইক ধরেই ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে বললেন, আমি বাধ্য হয়েই আজ গাইতে এসেছি কারণ আমার দাদা মলয় গত পরশু দিন একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। আমি ওরই একটা প্রিয় গান আপনাদের শোনাব। বলেই ধরে বসলেন মলয়ের কণ্ঠে অমর করা গান 'কিছু নেই তবু দিতে চাই/তুমি না যেন বলো না/অভিমানে দুটি আঁখি ভরে তুলো না।' বলতে দ্বিধা নেই যে আমার প্রিয়তম দশ-পনেরোটা বাংলা আধুনিকের মধ্যে মলয়ের এ গান চিরকাল থাকবে। এত অল্প বয়সে এই পারফেকশন ও যে কী করে অর্জন করেছিল তার কোনো ব্যাখ্যা আমার বা কারও কাছে নেই। সম্প্রতি এই মলয়ের শুভানুধ্যায়ী প্রয়াত শিল্পী শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই নন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে রেকর্ডে এ গান শুনতে শুনতে ফের চোখ ভিজে আসছিল জলে। আর ভাবছিলাম, হায়! কিছু কিছু গান যেন চোখের জল দিয়েই তৈরি হয়। কিছু কিছু গানের শিল্পীর ভাগ্যও।



আরেক রকম শিল্পী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আরেক শিল্পী দীপক মৈত্র। এক সময় অনুরোধের আসরে কী ভীষণ আনন্দ পেয়েছি আমরা এঁদের গানে! সেই সুদামবাবু হঠাৎ একদিন চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বসলেন। তার আগে থেকেই ন্যায্য দাম না পেয়ে পেয়ে ভগ্নমনোরথ তো হয়েই ছিলেন, শেষ অব্দি কাছের কিছু বন্ধু এবং কিছু প্রকৃত শ্রোতার গুণগ্রাহিতা ছাড়া কিছুই আর জুটল না জীবনে। অকালমৃত্যুতে আমাদেরকে স্তব্ধ করে দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন দীপক মৈত্র, কিন্তু সুদামবাবুকে বহুদিন বয়ে বেড়াতে হল হৃদয় আর অগীত গানের বোঝা। বেশ খারাপই লাগে আজকালকার হেঁজিপেঁজি কপি সিঙ্গারদের ঢালাও ব্যবসা দেখে, আর এই সব গুণী মানুষের গানও আজ নতুন করে বার করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ওমর বোম্বাই যেতে পারেনি, কিন্তু বোম্বাইতে চার বছর কাটিয়ে এসেছিল খ্যাপা গেনু। আর ফিরে এসে কী রোয়াব গেনুর! যাকে পায় তাকেই বুক পকেট থেকে খান দশেক সাদা-কালো ফোটোগ্রাফ দেখায়। তার কোনোটায় গেনু মাইকের সামনে বসে গাইছে (গাইলেই ওর চোখ বুজে আসত), কোনোটায় প্রণাম করছে হেমন্ত মুখার্জি কি গীতা দত্তকে, কোনোটায় কোনো বড়োলোকের গাড়ির সামনে চোখে গগল্স পরে দাঁড়িয়ে। সর্বক্ষণ মাথায় অবশ্যই থাকত একটা মারোয়াড়ি টুপি। তেল চকচকে টাক ঢাকার জন্য। ছবি দেখিয়েই বলা শুরু করত, 'ফের যাচ্ছি বম্বে শঙ্কর-জয়কিষাণের সুরে গান রেকর্ড করতে।'

কিন্তু আমরা কেউই ওসবে কান দিতাম না কারণ গেনুর গান আমাদের কারওরই কোনোদিন ভালো লাগত না। পাড়ার জলসাতেও কোনোদিন ডাক পড়েনি ওর, শুধু আমরা বাচ্চারা যে-মন্দিরবাড়ির উঠোনে দুপুরে আড্ডা মারতাম তারা ভীষণই বিরক্ত হতাম গেনুর হারমোনিয়াম বাজিয়ে বেসুরো রেওয়াজে। সা রে গা মা-টা জানত গেনু, কিন্তু সেটাকেই যে কী ভীষণ খারাপ ভাবে সারাক্ষণ চালাচালি করত গলায় তা কহতব্য নয়। বড়ো কথা, ওর কণ্ঠস্বরটাই ছিল রসকষহীন। আর সেই গলা বাঁচিয়ে রাখতে গম্ভীরভাবে কম কথা বলে চালিয়ে গেল কতকাল। কিন্তু আহ্লাদ করে 'গেনুদা, আপনি কী ভালো গান করেন' কথাটা বলার সুযোগটাই কোনোদিন দিল না।

ক্রিক রো-র পিছনে ক্রিক লেনের একটা বাড়ি দেখিয়ে বড়োরা আমাদের বলতেন, ওই বাড়িটায় তালাত মামুদ থাকতেন, বোম্বাই পাড়ি দেবার আগে। কথাটার সত্যমিথ্যে জানি না, কিন্তু ওই কথা শোনার পর আমাদের খুব সমীহ জন্মেছিল বাড়িটার প্রতি। ছাদে উঠলে বাড়িটার দিকে একবার না-একবার তাকাতেই হত। হিন্দির পাশাপাশি তালাত তখন বাংলায় গাইছেন 'তুমি সুন্দর যদি নাহি হও/তাতে কী বা যায় কী বা আসে/প্রিয়ার সে রূপ সেই জানে/



যে কখনও ভালোবাসে'-র মতো প্রাণ পাগল-করা গান। ফলে কলকাতার চৌহদ্দি থেকে বিশাল বড়ো শিল্পী হওয়ার নমুনা হিসেবে আমরা ধরে নিয়েছিলাম তালাত মামুদকে। কত আশা ছিল ভানু বোসের জলসায় একবারটি ওঁকে পাব, ওঁর অটোগ্রাফ নেব, কিন্তু সে আশা মেটেনি। তবে তালাতের গাওয়া বাংলা গান কেউ গাইলে তাকে মাথায় তুলে রাখতে আমাদের এতটুকু কসুর ছিল না।

এরকম এক তালাতকণ্ঠ ছিল বন্ধু জয়ন্ত। তালাতের মতোই একটা দরদি, রোমান্টিক কণ্ঠ ছিল ওর। বিজ্ঞানের ভালো ছাত্রটির দু-ধরনের ডিমান্ড ছিল পাড়ায়— টিউশনির জন্য আর প্রেমিক-প্রেমিকার পার্কে প্রেমালাপ-কালে প্লেব্যাক ভয়েস হিসেবে। ওর এই দ্বিতীয় খ্যাতিটি ক্রমে কলেজ মহল অবধি গড়ায় এবং সেখানকার প্রেমিকদল নিয়মিত ওকে দলে ভেড়াতে শুরু করে। যেই সূর্য ডুবল এবং পার্কের পর্ব শুরু হল, অমনি শুরু হত জয়ন্তর কণ্ঠে 'এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু' বা 'কার মঞ্জির বাজে রিনিঝিনিঝিনি' কিংবা তেমন সিরিয়াস যুগল হলে 'তুমি সুন্দর যদি নাহি হও'। প্রেমিক-প্রেমিকারা নিজেদের আলাপ করেই চলেছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে অদূরে বসে আত্মভোলা জয়ন্তর গান। বিনিময়ে একটু চা, একটু বাদাম শিল্পীর সম্মানে। ওর নামকরণই শেষে হয়ে গেল প্লেব্যাক সিঙ্গার। আর তা দিয়েছিল একটি মেয়েই।

কিন্তু হায়, আমাদের পাড়া বা পল্লি থেকে কোনো কুমার শানু হয়নি। ছপ্পর ফাড়কে ভগবান অতখানি কাউকে দেননি এবং সেটা যে হয়নি তার প্রধান কারণ সে যুগ কোনো অর্থেই কপি সিঙ্গারদের যুগ ছিল না। তখন বোম্বাইতে গ্যাঁট হয়ে বসে লতা, রফি, হেমন্ত, মুকেশ, গীতা, আশা, মান্না, তালাত। কলকাতায় হেমন্ত, সন্ধ্যা, শ্যামল, উৎপলা, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, আলপনা, দ্বিজেন, তরুণ, সুবীর, ইলা এবং ভারী ঢঙে ধনঞ্জয়, পান্নালাল। এঁদের কারোরই কাছাকাছি যাওয়া যে কী দুঃসাধ্য, অসাধ্য কাজ! কিন্তু আজ কলকাতা আর বোম্বাই ফাঁকা মাঠ। গলা দিয়ে কিছু বার করলেই গোল্ড ডিস্ক, প্ল্যাটিনাম ডিস্ক, হেনাতেনা কত কী। আজ ওমর থাকলে কোথায় থাকে আর সব কপি-রফি! কিন্তু তিন, চার দশক ধরে কেই বা আর অপেক্ষায় থাকতে পারে? কাজেই বড়ো গাইয়েদের অনেক আগেই সেইসব সুন্দর প্রতিভারা হারিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু আজও এক-একটা গানের সঙ্গে রফি-হেমন্তর মতোই ভেসে আসে ওমর-জয়ন্তর স্মৃতি। জলে নিজেদের নাম লিখেছিল যারা।

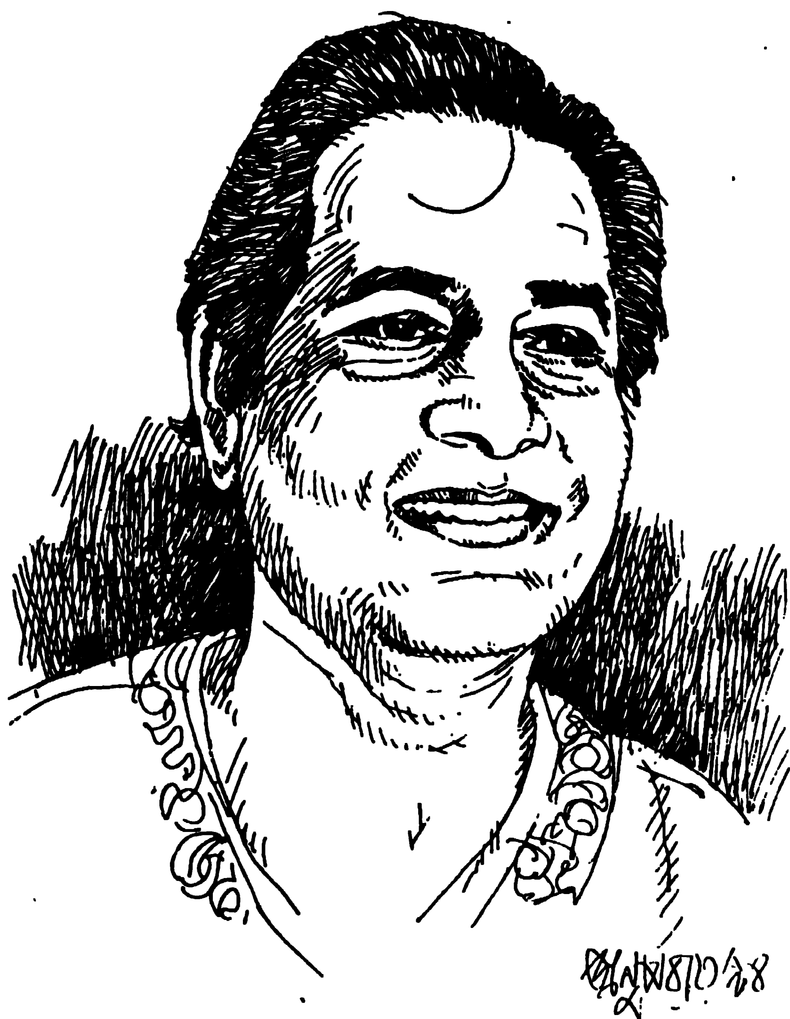
এ শুধু গানের দিন

দিনটা তেমন কিছু আলাদা ছিল না। আমাদের আর পাঁচটা দিন যেমন হয়ে থাকে তেমনই। এ ঋতুতে বৃষ্টি হবে তাও তো ধরা ছিল। ধরা ছিল কিছু মেঘ ও রোদ, ভালো এবং খারাপ খবর মিশিয়ে একটা পরিচিত সংবাদপত্র এবং সপ্তাহের আর ছ-টা দিনের মতন আমার এই অপরিবর্তিত আমি। কিন্তু গোল বাধাল টার্নটেবিলে ৩৩ স্পিডে ঘুরন্ত একটা রেকর্ড। সেই কবের থেকে এই রেকর্ডের কণ্ঠস্বরটি শুনে আসছি, কিন্তু কই পুরোনো তো হল না? সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের এই গান 'এ শুধু গানের দিন' কেবলই কি গান? এও কি এক ধরনের কালাধার নয় যেখানে শব্দ আগলে রাখে শুধু সুর এবং কথাকেই নয়, সম্পূর্ণ একটা সময়কেই? আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া এক দারুণ, তীব্র বাঙালি রোমান্টিসিজমের যুগ বলি যাকে? এই রেকর্ডের অন্য খাঁজে ছাপা রয়েছে 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' এবং 'জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া' যা শুনলেই কারও মনে পড়বে পঞ্চাশের দশকের সেইসব উত্তম-সুচিত্রা জুটির ছবি যেখানে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানুষের একটা আদর্শবাদী চেহারা আমরা ফুটে উঠতে দেখতাম। যে-উত্তম কিংবা যে-সুচিত্রা আদতে ছিলেন আমাদেরই নিভৃত হৃদয়বাসনারই সার্থক প্রোজেকশন। তাঁরা রুপোলি পর্দায় গাইতেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের রঙিন মেজাজের গান। এবং তাঁদের গানে-গানেই আমরা পেয়ে যেতাম হেমন্ত কিংবা সন্ধ্যার ওই আশ্চর্য কণ্ঠ। শনি-রবির দুপুরবেলার 'অনুরোধের আসর'-এর আসল মাধুর্য ছিল এই-ই। আমরা শুধু কতকগুলো গানই নয়, কতকগুলো মানুষ এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতাম। কারও গান একটু বেশি বেশি ভালো লাগলে একটা ৭৮ আর পি এমের রেকর্ড কিনে তাঁকে একটা স্থায়ী জায়গা করে দিতাম নিজেদের বাড়ির পরিবেশে।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা আধুনিক গানের প্রায় একটা অস্বাভাবিক রকম সুখের দিন গেছে পঞ্চাশের দশকে। সারাটা বছর ধরেই প্রায় আমরা অপেক্ষায় থাকতাম পুজোর গানের। পুজোর অন্তত মাস দেড়েক

আগে থেকে সেই সব গানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়তাম এবং ওরকম দীর্ঘ প্রতীক্ষার মাধ্যমেই আমাদের পরিচয় হয়েছিল মান্না দে-র সেই সব অবিস্মরণীয় গানের সঙ্গে— 'সেই তো আবার কাছে এলে', 'ও আমার মন যমুনার অঙ্গে', 'এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি', 'এরই নাম প্রেম', 'আবার হবে তো দেখা এই দেখাই শেষ দেখা নয়', ... আরও কি নাম বলার প্রয়োজন থাকে? এসব গান আমরা ফি বছর কিনতাম ফি বছরের রসদ হিসেবেই। যেমন প্রিয় বই কেনে মানুষ, অনেক সময় পড়া বইও কেনে। পরে একদিন এসব গানই 'মান্না দে-হিটস' বলে একটা এলপি-তেই প্রকাশ করলেন রেকর্ড কোম্পানি এবং সেই সুবাদে আমাদের জীবনে একটা মস্ত সময়কেই তাঁরা একটা ফুলের তোড়ার মতন নিপুণ করে বেঁধে ফেরত পাঠালেন আমাদের কাছে। আমরা ফেরত পেলাম সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সেই সব চিরকালীন গান যার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবে কেটেছে আমাদের শৈশব এবং কৈশোর। হ্যাঁ, আমি 'গাঁয়ের বধূ', 'পাল্কির গান', 'অবাক পৃথিবী', 'রানার' ইত্যাদি গানের কথাই বলছি। কিন্তু এলপি-র মধ্যে এসবের সঙ্গে আমরা ফাউ হিসেবে পেলাম 'দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক', 'এই ধিতাং ধিতাং বোলে', 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম' ইত্যাদি গানও। পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় ভাগটুকুকে মাতিয়ে রেখেছিল যে-গান, যে-সুর।

আমাদের এখনও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। একেকটা নিজস্ব ঢং এঁরা, একেকটা অনন্য চলন। ধনঞ্জয়বাবুর 'ঝনন ঝনন বাজে', সতীনাথের 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম', মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' তো শুধু সেদিনেরই গান ছিল না। সুর এবং কথার এরকম সুখবিবাহ তো আমরা নিত্যদিন দেখতে পাইনে। মনে আছে সেইসব দিনের অনুরোধের আসরেও আমরা এমন ক-টি গানের জন্যও প্রতীক্ষায় থাকতাম যা নিছক আধুনিক গান ছিল না। প্রথমেই মনে আসে পান্নালাল ভট্টাচার্যের শ্যামাসংগীতের কথা। একেবারে আধুনিক গানের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যেসব গান। মনে পড়ে দূর গাঁয়ের এক রেল স্টেশনে রাত কাটাচ্ছিলাম এক বন্ধুর সঙ্গে। সহসা রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেয়ে উঠল এক রেল কুলি— 'মা তোর কত রঙ্গ দেখব বল?' আমার আরও মনে পড়ে একটি ছোট্ট ছেলেকে যাদের বাড়ির কলের গানে প্রায়ই বাজত 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' গানটা। পান্নালালবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর পর আমরা নিভৃতে চোখের জল ফেলেছিলাম ওঁর জন্য। আর এতদিন পর সেই কান্নাই ভিতরে গুমরে উঠছে আমার যখন শুনছি 'আমি মন্ত্রতন্ত্র



কিছুই জানিনে মা' কি 'তুই নাকি মা দয়াময়ী' এইচএমভি-র হাল আমলের এলপি-তে।

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে রবীন্দ্র শতবর্ষের বছরজোড়া উৎসব কীভাবে উদ্দীপিত করেছিল আমাদের শোনার রেওয়াজকে। আজকে রবীন্দ্রসংগীতের যে রমরমা দেখি তার সূত্রপাতই বলা চলে ওই আশ্চর্য সংস্কৃতিময় বছরটিতে। গান, নাচ কিংবা নাটক ছাড়া, ৬১ সনের ক-টা দিন কেটেছে বাঙালির তা তদন্ত-সাপেক্ষ এবং এই আনন্দধারায় রেকর্ড কোম্পানির অবদান কতখানি তা এক কথায় বোঝানো যাবে না। এর আগেই দেবব্রত বিশ্বাস কি হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাঙালির কাছে পরিচিত কণ্ঠ ছিল। পরিচিত ছিলেন সুচিত্রা, কণিকাও। কিন্তু এই অবসরে ওঁরা ক্রমশ একেকটা 'লেজেনড' হয়ে উঠতে লাগলেন। গোটা ষাটের দশকই বোধ করি দেবব্রত এবং সুচিত্রা-কণিকার নিজস্ব দশক। ঘরে-ঘরে রবীন্দ্রসংগীত পৌঁছে দেওয়ার যে মহাকাজ সেটা এঁরা একটু-একটু করে মণিকার বা স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম দক্ষতায় করে গেলেন এবং যদি কণিকা-সুচিত্রার যুগ্ম এলপি 'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা'-র প্রমাণ নিই, সেকাজ এখনও করে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রসংগীতকে শুধু জনপ্রিয়ই নয়, ওঁরা তাকে প্রায় মার্গীয় দার্ঢ্য দিয়েছেন। পূর্বের সুবোধমতি শ্রোতা যে-গানকে শুধু ফুলেল কাব্যগীতিই ভেবেছিল সুচিত্রা-কণিকা তাকে করে তুললেন আমাদের রিক্ত সত্তার মুক্তিমার্গ। আমরা আর সেই আগের মতন রইলাম না। আমরা ঘরে তুলে আনলাম 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা'-র এলপি। আমাদের বিশ্রামের সন্ধ্যাগুলিকে স্নিগ্ধ করল রেকর্ডবদ্ধ 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং, অবশেষে, গান পেরিয়ে গিয়ে আমরা মুগ্ধ হতে থাকলাম নিছক শব্দে কথায়—কারণ রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের অমন বিচিত্রভাবেই আপ্লুত করে রেখেছেন। এইচএমভি উপহার দিলেন 'শেষের কবিতা'র ডিস্ক। 'শেষের কবিতা' কেবলই তো পাঠ শোনা নয়, স্মৃতিপটে উজ্জ্বল একটি মুড-উপন্যাসকে মনের পর্দায় ফিল্মের মতন প্রতিফলিত হতে দেখা। কিন্তু যদি কোনো মুহূর্তে মনে হয় এতখানি রোমানটিসিজম আমাদের যুগের প্রাপ্য নয়, যদি মনে হয় 'আমি তো পালিয়ে বাঁচছি!' তাহলে শ্রোতা একটি বারের মতন টার্নটেবিলে বসিয়ে দিন ঋতু গুহর এই সেদিনের এলপি-টি। আপনি শুনুন 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' কিংবা 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা।' গোটা জগতের কাছে নতুন করে নিজেকে ঋণী বোধ করবেন আপনি। আকাশের নীল, সকালের আলো, সন্ধ্যার মাতাল হাওয়ার সঙ্গে নিজের সখ্য খুঁজে পাবেন।

রবিশঙ্করের একটা কথা আমার প্রায়ই স্মরণে আসে। বলেছিলেন, আমরা রেকর্ডের থেকে মুক্ত হব না কোনোদিনই। কারণ আমাদের স্মৃতি, আমাদের অতীত, এবং তার যা-কিছু ডকুমেনটেশন তা ওই রেকর্ডের মধ্যে। আবদুল করিম কীরকম গাইতেন, ফৈয়াজ খাঁ-র ঢং-টা কী, কেমন কথা কইতেন পণ্ডিচেরীর শ্রীমা? এ আমরা অন্যভাবে জানব কী করে? আমাদের রেকর্ডই তো শাস্ত্র আমাদের, যেমন শাস্ত্র বই। উমা বসুর গান, শচীনদেব বর্মণের গান, আর এই সেদিনও যিনি হেসে চলে বেড়াতেন আমাদের মধ্যে সেই স্ফূর্তিময় নির্মলেন্দু চৌধুরীর গান শুধুই কি স্মৃতি? এই মুহূর্তে আমার এঁদের কথা মনে পড়ল কারণ এঁদের রেকর্ডগুলোই আমার হাতের কাছে। উমা বসুর 'ইন মেমোরিয়ম', শচীনদেবের 'দি ইনকমপেয়ারেবল শচীনদেব বর্মণ' এবং 'নির্মলেন্দু স্মরণে' রেকর্ডগুলি আমার কাছে পুরোনো ছবির অ্যালবামের কাজ করছে এখন। উমা বসুকে আমি দেখিনি, কিন্তু শচীনদেব এবং নির্মলেন্দুকে কাছ থেকে চিনতাম। আমার মনে পড়ছে এই অ্যালবামের অনেক গানই শচীনদেব আমাকে গুনগুন করে শুনিয়েছিলেন। তাঁর 'মন দিল না বধু' গানটিকে যবে থেকে মন দিয়েছিলাম তারপর থেকে সে মন আর আমি ফেরত পাইনি। পাবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। আর যদি বলেন নির্মলেন্দুর কথা তাহলে একটা ঘটনার উল্লেখই করতে হয়।

লন্ডনে (১৯৭৭, সেপ্টেম্বর) এক বন্ধুর বাড়িতে আলাপ হল নির্মলেন্দুর সঙ্গে। ওঁর গানেরই মতন বিলকুল খোলামেলা মানুষ। প্রথম আলাপেই জানতে চাইলেন ওঁর গান আমার কেমন লাগে। কিছু বলার আগেই ফের বললেন, আমার কিন্তু ষাঁড়ের ডাক। বললাম, তাহলে সেই ডাকটাই শুনি একবার। আর অমনি আমাকে অবাক করে দিয়ে নির্মলেন্দু নিখুঁত সুরে ডাক দিলেন 'বন্ধুরে...' ওই ডাক বলুন আর হাঁকই বলুন ও আমি আর কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আজ রেকর্ড কোম্পানি সেই ডাকটাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। 'বন্ধুরে অকূলে ভাসাইয়া' গানটির সঙ্গে। বলুন, আমি এই সংস্থাটির কাছে আর কত কৃতজ্ঞ হব?

আমারই চোখের সামনে এইচএমভি একটু একটু করে গড়ে দিয়েছেন নজরুল গানের রেওয়াজ। সেই ১৯৬৭ কিংবা ৬৮-তে 'লাভ সংগস্ অফ কাজী নজরুল' রেকর্ডটি কিনে কীরকম উন্মনা হয়ে ছিলাম কতদিন ধরে! আমাদের বাংলাদেশের এতজন শিল্পীর এত সুন্দর সমারোহ! সেই রেকর্ডে ধনঞ্জয়বাবুর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' কিংবা মানবেন্দ্রর 'এত জল ও কাজল চোখে' গান আজও আমার মনের চারপাশে ঘোরে। কিংবা পরে যখন শুনলাম সন্ধ্যা গাইছেন 'কেমনে রাখি বলো আঁখিবারি চাপিয়া' আর অঞ্জলি

মুখোপাধ্যায় গাইছেন 'সখি বলো বঁধুয়ারে' ততদিনে আমি নজরুলগীতির এক-গলা জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।। শুনি আঙুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, সুপ্রভা সরকারের গান। ইতিমধ্যে একদিন ঘটা করে অনুষ্ঠান আয়োজন করলেন এইচএমভি ওই প্রথম তিনজনের সম্মানে। আসরে আরও ছিলেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক এবং যূথিকা রায়। আসর-শেষে রেকর্ড রিলিজ করলেন কোম্পানি। আমরা ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়ার তিন-তিনটে অবিস্মরণীয় রেকর্ড পেলাম। সে আজ পাঁচ-ছ বছর হল! সন-তারিখ ভুলে গেছি। কিন্তু গানগুলো আর পুরোনো হয় না! 'চিরদিন কাহার সমান নাহি যায়' (আঙুরবালা), 'সখী বলো বঁধুয়ারে' (ইন্দুবালা)— কালোয়াতি ঢং, কিন্তু কী মধুর মূর্ছনা আর পরিবেশন! পুরোনো দিনর বৈঠকি মেজাজ, কিন্তু কাব্যের ছোঁয়াটুকু কোথাও এতটুকু বিপন্ন নয়। শব্দে, বর্ণে, সুরে যেন একটি বিশেষ সময় বাঁধা, আবার শব্দে, বর্ণে সুরেই যেন তা সময়োত্তীর্ণ।

নজরুলগীতির একটা বড়োসড়ো চল দেখেছি গোটা সত্তরের দশকে। যে কারণে অঞ্জলি, মানবেন্দ্র এবং ইদানীং কালে অনুপ ঘোষালের কাছে আমরা একটু বিশেষভাবেই ঋণী। ক্রমাগত নতুন কাব্য নির্বাচন করে নজরুলের বিশিষ্ট ঢং-এ এরা যেভাবে রেকর্ডের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাতে নজরুল গানের একটা স্থায়ী আসন হয়ে থাকবে আপামর বাঙালির হৃদয়মন্দিরে।। নজরুল বরাবরই আমাদের চেনা মানুষ, এখন তাঁর মনের ঠিকানাও আমাদের মনের পাতায় লেখা হয়ে রইল। যখন এই কথা লিখছি ঠিক তখনও হয়তো ঘরে-ঘরে বাজছে মানবেন্দ্র অনুপের যুগ্ম প্রয়াসের এলপি। যাতে মানবেন্দ্রর কণ্ঠে পাচ্ছি কবির এক গুচ্ছ গভীর রোমান্টিক গান এবং অনুপের পরিবেশনায় দেশাত্মবোধক, পল্লিগান এবং ঠুংরি-ভাঙা গানের একটা মনোহারী ডালি।

কিন্তু এর পরেও বুঝি রেকর্ড কোম্পানির কাছে আমাদের ফিরে যেতে হয় অন্য এক আকর্ষণে! কারণ এইচএমভি আমাদের পেরিয়ে গিয়ে আমাদের শিশুদেরও বেঁধেছেন এক পারিবারিক বন্ধনে। আমরা শৈশবে থোক থোক ৭৮ আরপিএম-এ পেতাম 'সাজাহান' কি 'আলিবাবা' নাটক। আমরা সে রস ভাগ করে নিতাম আমাদের বড়োদের সঙ্গে। কিন্তু কথাটা সত্যি যে তৎকালীন রেকর্ড-নাটক তৈরি হত বড়োদের কথাই মনে রেখে।

ছায়াছবিতে কি এবার গানের দিন ফিরে এল

পথচলা থমকে যেত। রেডিয়ো অথবা প্যান্ডেলের মাইক থেকে ভেসে-আসা এসব গান আমাদের মন এবং দিনটা ভালো করে দিত। আচমকা খেয়াল হত, তাই তো! ছবিটা তো দেখা হয়নি। কী জানি কীভাবে গেয়েছেন গানগুলো উত্তম-সুচিত্রা। 'সুরের আকাশে' গান পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে 'শাপমোচন' ছবির, 'আমি যে জলসাঘরে' ষাটের দশকের শেষভাগের ছবি 'এন্টনি ফিরিঙ্গী' ছবির। গোটা পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের বাংলা ছবির প্রচার অভিযান চলত তাদের মনোমুগ্ধকর গানে।

সুচিত্রা-উত্তম-সৌমিত্রর মতো ছবির মূলধন হত হেমন্ত, সন্ধ্যা, গীতা, মান্নার গান, নচিকেতা-রবীন চট্টোপাধ্যায়-হেমন্ত-সুধীন দাশগুপ্ত-অনিল বাগচীর সুরারোপ। যেমন ধারা বজায় ছিল বম্বের ছায়াছবিতেও।

সেই দিনও খুব সুদূরে নয় যখন রেডিয়ো সিলোনের 'বিনাকা গীতমালা' আরেকটু পরের সময়ে কলকাতার 'বিবিধ ভারতী' চ্যানেলে কান পেতে বসতাম আমরা লতার কণ্ঠে 'আ যা রে পরদেশি', রফির গলায় 'ইয়ে মেরা প্রেমপত্র পড়কর', মুকেশের কণ্ঠে 'দিল তড়প তড়পকে কহা রহা হ্যায়', তালাত মামুদের পরিবেশনায় 'জ্বলতে হ্যায় যিসকে লিয়ে', গীতা দত্তের গাওয়া 'জানে কিয়া তুহনে কহি', হেমন্তর নিবেদনে 'জানে ও কৈসে লোগোকা দিলসে', আশার গলায় 'ম্যায়নে পি লিয়া', মান্নার গাওয়া 'লাগা চুনেরিমে দাগ' কিংবা হায়! কিশোর কুমারের চিরচেনা দরাজ কণ্ঠে 'গাতা রহে মেরা দিল' অথবা 'ঘুংরুকি তরহ্ বজতা রহা হুঁ ম্যায়' শুনব বলে। কবে ফের রেডিয়ো বা মাইকে বাজবে এই গান সে-অপেক্ষা যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠত তখন সটান রেকর্ডের দোকানে ছুটতাম গানগুলোকে বরাবরের মতো গৃহবন্দি করব বলে। যাদের রেকর্ড প্লেয়ার নেই তারা পাঁচ সিকে কি দু-টাকা চার আনা পকেটে ফেলে লাইন দিতাম সিনেমা হলের সামনে। কারণ শুধু শোনা নয়, আমাদের কাছে খুব জরুরি হয়ে পড়ত চাক্ষুষ করা কীভাবে দিলীপকুমার, দেব আনন্দ, গুরু দত্ত, শাম্মী কাপুর, মধুবালা, বৈজয়ন্তীমালা,

ওয়াহিদা, সাধনা, সায়রা বানু বা পরের দিকে রাজেশ, শর্মিলা, অমিতাভ বা জিনাত সেসব গানে ঠোঁট ছুঁইয়েছেন রুপোলি পর্দায়। লিপ দিয়েছেন বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না, বলা উচিত প্রাণ দিয়েছেন। কারণ ওই গানগুলোই গড়ে তুলত ছবির অনেকখানি ভাবরস। মোটে একটি-দুটি গান আছে এমন বহু ছবিও স্মরণীয় হয়ে থাকত ওই একটি-দুটি গানের দাক্ষিণ্যে; ওই গানের ভেতর দিয়েই ছবিগুলো প্রবেশ করত আমাদের মনোরাজ্যে। হলিউডে এক সময় কমেডি ছবি যেমন কিং বা রাজা ছিল বাংলা-হিন্দি ছবিতেও একটা দীর্ঘ সময় ধরে রানি ছিল সুর, গান, গীতিময়তা। হিন্দি ছবির বিরাট বক্স ছিলেন ৫০-৬০ দশকে নৌশাদ, এসডি বর্মন, মদনমোহন, রোশন, শঙ্কর-জয়কিষেণ, ও পি নায়ার, সি রামচন্দ্র, চিত্রগুপ্ত, বসন্ত দেশাই, জয়দেব বা খৈয়াম। ৬০-৭০-এ বক্স তৈরি হল লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল, কল্যাণজি-আনন্দজি, আর ডি বর্মনের। কিন্তু সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে অমিতাভ বচ্চন বেশে রাগি যুবকটির প্রবেশ ঘটতে গানবাজনাকে স্টেজের উইঙে চালান করে দেওয়া হল। মঞ্চ জুড়ে তখন শুধু রাগী সংলাপ, একে-তাকে বেধড়ক প্রহার, দু-ভাইয়ের একজনের খুনি আর অন্য জনের পুলিশ হওয়া, রাগী নায়ককে সামাল দেবার মতো রাগী, ঢিসুম-ঢুসুম নায়িকা, আর বেদনাভরা, রোমান্টিক গানের বদলে স্ট্রোব লাইটে ঝিকমিক করা আলো-আঁধারির ডিস্কো ছন্দে ঝুমঝুমাড়ি তালবাজির গান। এই নতুন ধরনের অপভ্রংশ গান ছড়িয়ে পড়ল কোনো রোমান্টিক উদ্দেশ্যে নয়, নরনারীর শরীরকে ঘেঁষাঘেঁষি করে দেখানোর সুযোগ করে দিতে। হিন্দি ছবির সেন্সরের কাঁচি-তাড়া-করা যৌনতাকে, নগ্নতাকে নাচগানের 'শৈল্পিক' মোড়কে সাপ্লাই করতে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আশির দশকের অন্তভাগ অবধি সব হিন্দি ছবিই যে এহেন 'গানবর্জিত' তা হয়তো নয়, তবে পঁচানব্বই ভাগ ছবির গানই যে হল থেকে বেরুতে না-বেরুতে আমাদের স্মৃতি থেকে মিলিয়ে গেছে এ ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। একেক সময় ভাবলে কষ্ট হয় যে, কিশোরকুমার, লতা, আশার মতো শিল্পীকে কী অখাদ্য সুরে গান গেয়ে ছবির গানের বিভাগকে চালু রাখতে হয়েছে এসময়!

কিশোরের মৃত্যুর পর যে লতা মঙ্গেশকরও ফিল্মের গান থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন তার এক প্রধান কারণ হল যে এসব বস্তাপচা সুরে তিনি আর গেয়ে উঠতে পারছিলেন না। ক্ল্যাসিকাল তালিমে বসানো লতার অসাধারণ কণ্ঠ হাজারো রকমের গান দীর্ঘকাল ধরে গেয়ে এলেও ডিস্কো জমানায় তিনি সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। আশির দশকের গোড়ায় সুরকার হিসেবে নামডাক হল রাজেশ রোশন এবং বাপি



লাহিড়ির। দুজনই সংগীতের ঘরানার ছেলে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোমী। কিন্তু সস্তায় বাজিমাতের জন্য বাপি লাহিড়ি এমন একটা বিলিতি চাল ধরলেন যাতে বিবেকসম্মত ভাবে গান গাওয়া গুণী-মানী শিল্পীদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। নানাভাবে আমদানি করা এই সব বিলিতি সুরে গান গাওয়ারও সুযোগ কিছুই থাকছিল না এবং এ-কাজ করার জন্য প্রথম শ্রেণির গায়ক-গায়িকারও প্রয়োজন হচ্ছিল না। রফি, মুকেশ, কিশোর পারতপক্ষে মরে বেঁচে ছিলেন, লতার সামনে একমাত্র খোলা রাস্তা ছিল অবসর গ্রহণ।

তবে ৯০-এর দশকে পড়ে হিন্দি ছবির চরিত্রলক্ষণে কিন্তু একটা মস্ত বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। হঠাৎ করে মারদাঙ্গি ছবির বাজারে লক্ষণীয় ভাটা পড়েছে, 'কেয়ামৎ সে কেয়ামৎ তক', 'ম্যায়নে প্যার কিয়া', 'আশিকী', 'দিল' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে আনকোরা যুবক-যুবতীর প্রেম কাহিনি ফের ফ্যাশনেবেল হয়ে উঠেছে, জোরালো অভিনয়ের চেয়ে তরতাজা তারুণ্যের জোগান যেখানে বেশি, কাহিনির বিশ্বাসযোগ্যতার চেয়ে ভালো লাগা, ভালোবাসার ভাবাবেগের প্রশ্রয় যেখানে অধিক, ডিরেকশনের চেয়ে সেট ডিজাইনিং আর ফোটোগ্রাফির চাকচিক্য যেখানে ঢের বেশি চোখ কাড়ে দর্শকের আর, সর্বোপরি, গান যেখানে ছবির প্রাণ। আবহাওয়া।

অবশ্য শুরুটা ঠিক ৯০ সনে নয়, তার বছর দুই আগেই 'তেজাব' আর 'কেয়ামৎ সে কেয়ামৎ তক' ছবি দিয়ে। ১৯৮৯-এ এই হাওয়াটাই পালে লাগিয়ে দেদার সাফল্য পেল 'হাওয়া হাওয়া', 'লাল দুপাট্টা মলমলকা', 'জিনা তেরি গলিমেঁ', 'চাঁদনি', 'ম্যায়নে প্যার কিয়া' আর 'ত্রিদেব'। তবে ৯০ সনে এসে বাস্তবিক ঢল নামল সংগীতসমৃদ্ধ ছায়াছবির, যাদের অনেকের গানই এখন জনগণের ঠোঁটে ঠোঁটে। 'হম' ছবির 'জুম্মা চুমা দে দে' তো এতদিনে ভারতের বেসরকারি জাতীয় সংগীতে উত্তীর্ণ হয়েছে, হেন বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী নেই যারা বাপ-দাদাকে ছোটোখাটো লেকচার দিয়ে ফেলছে না গানটির মাহাত্ম্য নিয়ে।

তাদের প্রায় সবারই জানা আছে যে গানের সুরটি অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। বিদেশিনী মেরি কান্টের বিখ্যাত, জনপ্রিয় গানের হুবহু নকল। তারা এও জানে যে 'থানেদার' ছবিতে বাপি লাহিড়ির বানানো গান 'তাম্মা তাম্মা লোগ'-ও ওই একই গানের কার্বন কপি। কে প্রথম নকল করেছে তা নিয়েও দুই সংগীত পরিচালক ও ফিল্ম প্রযোজকের মধ্যে বেশ ভালো রকম উতোর-চাপান ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। তাতে অবিশ্যি লাভ হয়েছে উভয় পক্ষেরই; দুটো ছবিই সুপারহিট। এবং কারণ গান। তবে নকলবাজি যা-ই হোক—গত তিন বছরে সমস্ত হিট গানই বিদেশি হিট



গানের নকল— ওই গানই যে ইদানীংকার সব হিট ছবির পিছনে এইটা নিয়ে কোনো মহলেই দ্বিমত নেই। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যে কেতা ও প্রভাব দেখিয়ে গেছেন এসডি বর্মন।

শঙ্কর-জয়কিষেন, ও পি নায়ার কিংবা সত্তরের দশকে আর ডি বর্মন ঠিক তেমন ফিরে এসেছে এখনকার সংগীত পরিচালকদের ক্রিয়াকর্মে। এই নতুন প্রজন্মের পরিচালকদের কাজে স্বকীয়তা খুবই কম, কিন্তু এখান-ওখান থেকে নিয়ে-থুয়েও বাজারটাকে যে মাতিয়ে রাখছেন এটা ফিল্ম প্রযোজকদের কাছে খুব বিরাট ব্যাপার। ৯০-এর দশকের হিট ছবির আসরে আগের জমানার লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলালই বলতে গেলে টিকে গেছেন, কারণ 'টপ অফ দ্য চার্ট' বা সেরা বিক্রির দশটা ছবির তালিকায় দ্বিতীয় নামটি 'হম', যার সংগীত পরিচালক তিনি। 'টপ অফ দ্য চার্ট'-এ বাপি লাহিড়ির তিনটি গান ('থানেদার', 'আজ কা অর্জুন', 'ঘায়েল'), তবে বাপিকে সে-অর্থে আগের জমানার লোক বলা যায় না। যেমন বলা যায় না রাজেশ রোশনকে, যাঁর 'কিষেণ কনহাইয়া' চার্টের নয় নম্বর ছবি। এঁদের বাদ দিলে দেখা যাবে যে এক ঝাঁক নতুন সুরকার উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বম্বের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এবং সেখান থেকে নড়ার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছেন না। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আনন্দ মিলিন্দ, রামলক্ষ্মণ, নাদিম শ্রাবণ, অনু মালিক এবং ইলায়া রাজা। বড়ো গায়ক-গায়িকাদের যুগ ফুরিয়ে এসেছে দেখে এক ঝাঁক নতুন গায়ক-গায়িকাও রাতারাতি ছবিতে-ছবিতে গান জুড়ে দিয়েছেন এবং অকল্পনীয় সাফল্যও পেয়ে গেছেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, না-দাঁড়াবে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও আজকের বাজারের চাহিদা কিন্তু তাঁরা ভালোই মিটিয়ে যাচ্ছেন। আগের দিনে সব গানের পিছনে একটা পরিচিত কণ্ঠ থাকত, আজ আর সে দিন নেই। হিট গানের কলি লোকের মুখে ঝুলে থাকলেও গায়ক বা গায়িকার নাম নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। গানের পরিচয় এখন ছবির নাম দিয়ে। যাতে আখেরে লাভ হচ্ছে ছবিরই, সব সাফল্য গিয়ে ঠেকেছে ছবিতে, বাড়িয়ে যাচ্ছে ছবির রমরমা। গানের দিক থেকে বিচার করলে হিন্দি ছবির এখন চরম সুদিন। যে-কথাটা অবিশ্যি বাংলা ছবির সম্পর্কে বলা যায় না। 'গুরুদক্ষিণা' বলে সুপারহিট বাংলা ছবিটা গানের দাক্ষিণ্যে দাঁড়িয়ে গেলেও বাংলায় এখন বোম্বাই ছবির অন্ধ অনুকরণই জারি আছে। হালফিলের বোম্বাই ছবির সব চেয়ে অনুকরণযোগ্য বিভাগ, বাঙালি পরিচালকদের ধারণায়, হল শস্তা সমাজবাদ, নায়ক-নায়িকাদের আধিক্য, অ্যাকশন, কাহিনিহীন কাহিনি, ক্যামেরার হুড়োমস্তি এবং যখন-তখন নেই কথায় ডিস্কো বাদ্যি। ফলে আগের দিনের বাংলা ছবির রোমান্টিসিজম্

গত, অনুভূতিময় অভিনয় গত, পরিচালনাকর্ম গত এবং সঙ্গীত অন্তর্হিত। গত দু-তিন বছরে হিন্দি ছবিতে গান তার বড়ো ভূমিকায় ফিরে এলেও বাংলা ছবিতে তেমন কিছু নজরে আসেনি। আসার খুব একটা পূর্বাভাষও নেই, এখন যা গাওয়া হচ্ছে তত খারাপ গান বাংলা ছবিতে কোনোদিনও গাওয়া হয়নি। এত খারাপ সুরারোপে কখনও শোনা যায়নি, তাই আশা করা অমূলক যে হঠাৎ করে যে-কোনো দিন বপ্নের মতো কলকাতার ছায়াছবিতেও বাংলা গান ফের সর্বেসর্বা হবে। গায়নের পাশাপাশি সুরারোপের যে দুর্দিন চলছে এখন তা বলার বাইরে। শেষ দিকে বাংলা ছবির গান টিমটিম করছিল। কিশোরকুমারের গলায়, পরে কিশোর ও হেমন্তর মৃত্যুতে বাংলা ছবির রুপোলি পর্দা জুড়ে এক ধরনের নীরবতা। শব্দ প্রচুর আছে, কিন্তু গান নেই।

হিন্দি ছবির জেগে ওঠা সংগীতশিল্পকে অবিশ্যি যতটা খাতির করা যায় ততটা শ্রদ্ধা করা যায় না, কারণ 'ওয়ে ওয়ে' 'ঝুমা চুমা' 'পাগলা' ইত্যাদি গান মেগাহিট হলেও শিল্পের বিচারে এদের ঔজ্জ্বল্য মাত্র কয়েক কিলোওয়াটের। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের হিট গান ছিল গান হিসেবে চিরস্মরণীয়। আজও কোনো মেদুর দুপুরে কি বর্ষার সন্ধ্যায় 'চৌদভি কা চাঁদ' বা 'গাইড'-এর গান বাজলে মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটা কিছুটা যেন অপার্থিব হয়ে ওঠে। স্মৃতি ভর করে মনে, অশ্রু ভর করে চোখে, ভালোবাসা ভর করে হৃদয়ে। আজকের হিট গান ছ-মাস পরে বিস্মৃতির ওপারে উড়ে যায়। বছর কয়েক আগেও যারা 'ডিস্কো দিওয়ানে'-এর তালে নাচত সেইসব যুবক-যুবতীরাই আজ পুরোনো দিনের গান কিনে ঘর ভরিয়ে তুলছে।। 'ওয়ে ওয়ে', 'ঝুমা চুমা'র শ্রোতারাও বছর গড়ালে হয়তো ভুলে বসবে আজকের এইসব উন্মাদনা। শ্রোতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দিনের সুরের দিকেই তাদের ঝোঁক বাড়ছে। এখনকার হিন্দি হিটকে জিনস, জুতো, হেয়ারস্টাইল, চুলের শ্যাম্পু বা সিগারেটের মতো নিত্য নতুন ক্লায়েন্ট তৈরি করে নিতে হচ্ছে। তাই অনুরাধা পড়োয়াল, কুমার শানু, অমিত কুমার বা শ্যারন প্রভাকরের গায়ন বা কণ্ঠ নয়, তাঁদের গলার মোড়কে বিক্রি হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানি করা একটা মিউজিক স্টাইল। হিন্দি বাণীতে (তাও কী যে বাণী!) সাপ্লাই হচ্ছে বিলিতি স্টারদের হিট। অধিকাংশ শ্রোতাও জানে যে হিন্দি হিটটি বিলিতি কোনো হিটের জলছাপ। কারণ বাড়িতে বাড়িতে, গাড়িতে গাড়িতে, হোটেলে-রেস্তোরাঁয় এখন সারাক্ষণ বেজে চলেছে পল সাইমন, সিডি ও'কনর, ব্রুস স্প্রিংগস্টিন, হুইটনি হিউসটন, মাইকেল জ্যাকসন বা ট্রেসি চ্যাপমান। শোনার অভ্যেসে এখন অনেক কিছুই ঘটে যাচ্ছে সর্বত্র। শোনার ও ভোলার বদ অভ্যেসেও।

এত সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে ১৯৮৯ থেকে হিন্দি ছবিতে গানের প্রাধান্য শুভ সংকেত বহন করে। গানের টান বাড়লে কাহিনি ও রোমান্সের টান বাড়বে, মারদাঙ্গা ধুমধাড়াক্কার পরিমাণ কমবে। সুরের দাক্ষিণ্যে কাহিনির মোড় ঘুরলেও ঘুরতে পারে। রাস্তায় চলতে চলতে সুরের টানে আনমনা হয়ে মুগ্ধ শ্রোতা হয়তো ফের হলমুখো হবেন। বড়ো কথা, ভারতীয় ছবির প্রধান ও মৌল যে অবলম্বন সেই প্রেম ও ভালোবাসা ফের হয়তো ফিরে আসবে পর্দায় এবং দেখতে দেখতে কখনও না-কখনও বিলিতি ফ্যাশন ছেড়ে কিছু বলিষ্ঠ দেশজ সুর ও মৌলিক কণ্ঠশিল্পীরও উদয় হবে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে। পূর্ব উপকূলে, এই বঙ্গদেশে, সুর ও গানের যে কতটুকু কী হবে আন্দাজ করা মুশকিল। আপাতত এখানে রে রে করে বিকোচ্ছে পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রযোজনার ছবি 'বেদের মেয়ে জোসনা'-র গান। সুর ও কণ্ঠ সব ওপার বাংলার।

‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি’-র গায়ক

পাঁচের দশকের শেষ দিকে এক রাতভোর জলসার মধ্যভাগ। রং-বেরঙের শাল, র‍্যাপারে মুড়ি দিয়ে গান শুনছেন নারী-পুরুষ। গান শুনছেন এবং মধ্যে-মধ্যে ঘুমে ঢলেও পড়ছেন। তখন গিলে করা, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর বাহারি কাশ্মীরি শালে গা মুড়ে স্টেজে উঠলেন এক দোহারা চেহারার, উজ্জ্বল বর্ণ, নবীন গায়ক। উঠে মঞ্চের তিন দিকে বসা শ্রোতৃবৃন্দকে নমস্কার করলেন। যাঁদের অনেকেই তখন হয় তন্দ্রায় নয়তো ঘুমে আচ্ছন্ন। আর তারপর হারমোনিয়ম ধরে সামান্য আকারধ্বনি ছড়িয়ে ধরে বসলেন বছর দুয়েক আগের পুজোর গান ‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি’। তারপর কোথায় গেল শ্রোতার তন্দ্রা, শ্রোতার ঘুম, রাতটাকে প্রত্যেকের জন্যই যেন একটা মধুযামিনীতে পরিণত করলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এ আমার চোখে দেখা দৃশ্য। এ ছাড়া আরেকটি দৃশ্যের কথা আমি শুনেছিলাম মানবেন্দ্রর মুখেই। সেটা সম্ভবত আশির দশকের গোড়ার দিক। লন্ডনে এক গানের জলসায় একক আসরে গাইছেন তিনি। বিরতির পূর্বে শেষ গান গাইলেন ‘ও আমার চন্দ্রমল্লিকা বুঝি চন্দ্র দেখেছে।’ গান শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে দেখেন দশ-বারো জন প্রবাসী বাঙালি মহিলা অটোগ্রাফের খাতা হাতে দাঁড়িয়ে, কিন্তু খাতাটা এগিয়ে দিতে পারছেন না। তাঁদের চোখে জল আর বার-বার শুধু বলছেন, এ কী গান গাইলেন মানববাবু! আপনি আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ফিরিয়ে আনলেন। এই গান বুকে নিয়ে আমরা বড়ো হয়েছি, বেঁচে আছি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গানও বুকে নিয়ে বড়ো হওয়ার গান, স্মৃতিতে নিয়ে বেঁচে থাকার গান। শুধু বাণী নয়, গায়নের বৈশিষ্ট্যে, কণ্ঠের মাধুর্যে এবং সুরের গভীরতায় মানবেন্দ্রর প্রায় সব আধুনিকই এক ভিন্ন ধরনের, অবিস্মরণীয় প্রেমসংগীত। ভিন্ন ধরনের এজন্যই যে সাধারণ অর্থে লাভ সঙের যে বাংলা আধুনিক চেহারা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে চালু ছিল মানবেন্দ্রর গান সে গোত্রের নয়। প্রেমের গান

বললে একটা সরল, নির্ভার আর্তির গান বোঝায় যা নিজের নিজের ঢঙে গাইতেন হেমন্ত, শ্যামল মিত্র। কিন্তু মানবেন্দ্রর প্রেমের গানও জটিল সুরের বুনোটে থাকত সমৃদ্ধ। ফলে হৃদয়ে দ্রব বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে মগজেও চঞ্চল হয়ে উঠতে হত ওঁর গানে। তবে লক্ষণীয় হল যে, ওই জটিল সুরকেই একেবারে সরল ভঙ্গিতে গাইবার এক পদ্ধতি রপ্ত করেছিলেন শিল্পী, যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ কথার সঙ্গে সুরের কোনো দূরত্বই থাকত না। গানটা ভালোবেসে ফেলার পরই টের পেতাম গানটা বাস্তবে কত কঠিন। এরকম কিছু গান আজও তাঁর অগণিত ভক্তের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা অধিকার করে রাখে। এরকম কিছু গানের মধ্যে পড়ে 'যদি আমাকে দেখো তুমি উদাসী', 'ভালো লাগে না, তুমি না এলে', 'মুক্তোছড়া নেইকো কন্যা', 'কত আশা নিয়ে তুমি এসেছিলে', 'বনে নয় মনে মোর', 'যেও না মধুযামিনী' এবং অতি অবশ্য 'বারে বারে কে যেন ডাকে'। শুধু উচ্চাঙ্গ গানের ভিত্তি থাকলেই যে এই সব গান গাওয়া সম্ভব হয় না তা আজ আর কাউকেই বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভালো তালিমপ্রাপ্ত কণ্ঠে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাগের সুরটাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, বাণী ও সুরের সম্মিলিত রূপটা প্রায়শই অসম্পূর্ণ থাকে। ভালো প্রেমের গান, কণ্ঠের পাশাপাশি একটা হৃদয় ও মন দাবি করে, যেরকম এক হৃদয়, মন ও কণ্ঠের শ্রেষ্ঠ মিলন ছিল মানবেন্দ্রর গানে।

অথচ এই মানবেন্দ্ররই শ্রেষ্ঠ প্রেমের গানটি (বস্তুত, বাংলা আধুনিকেরই এক শ্রেষ্ঠ গান) 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি' কিন্তু একেবারে সহজ, সরল, হৃদয়াবেগের নিবেদন। মানবদা নিজে এই গানটিকে বলেছেন, 'ভূতে-পাওয়া গান', কারণ শ্যামল গুপ্তের লেখা প্রেমের লিরিকটির সুরটা তিনি অকস্মাৎ পেয়ে যান আকাশবাণীর পূর্বতন ঠিকানা গার্স্টিন প্লেসে এক নিঝুম সন্ধ্যায়। মানবেন্দ্র গিয়েছিলেন রেডিয়োর সিটিঙে, কিন্তু মগজে কেবলই ঘুরঘুর করছিল প্রেয়সী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে লেখা শ্যামল গুপ্তের ওই অসাধারণ গীতিকা। এমনিতেই গার্স্টিন প্লেসের ওই বাড়িকে হানাবাড়ি ভাবা হত, তার ওপর ওই নিস্তব্ধ, থমথমে সন্ধ্যা। মানবেন্দ্র একটু মুক্ত বাতাসের সন্ধানে গিয়েছিলেন নিরালা ছাদটার দিকে, তখন আপনা থেকে একটা পিয়ানোর সুর গজিয়ে উঠল মাথায় এবং কথার থেকে গান হয়ে উঠল 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি।'

হেমন্ত ও শ্যামলের গানের মতো মানবেন্দ্রর গান গেয়ে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়ত, প্রেমের আনন্দ, বিরহ, যন্ত্রণা উপভোগ করত, সহ্য করত। হেমন্ত বা শ্যামলের মতো মানবেন্দ্রর বিশাল ফ্যানশিপ তৈরি হয়নি, কারণ মন চাইলেই ওঁর গান গাওয়া যেত না। কিন্তু যার মনে



মানবেন্দ্র দানা বাঁধত তার আর কোনো মুক্তি ছিল না। ওই মধুর কিন্তু ঘন অলঙ্কৃত কণ্ঠে যা-যা প্রকাশ পায় তাই তাকে বারবার শুনতে হত এবং শেষে হতাশার সঙ্গে মেনে নিতে হত যে মানবেন্দ্রর গান শুধু বুকে ও স্মৃতিতে ধারণ করা যায়, গাইবার অধিকার কেবল ওই শিল্পীরই। মানবেন্দ্র-অনুরাগীদের সেই ধারণা ও আবিষ্কার আজও সত্যি। মানবেন্দ্রর বাস্তবিকই কোনো উত্তরসাধক হয়নি কারণ বাংলা গানে ওরকম একটা গলাই আর হয়নি। মীড়, তান, সরগম, জমজমা এসব তো ছিলই, অফুরান ভাবে ছিল দরদ ও অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তি, কিন্তু এহ বাহ্য।

মানবেন্দ্রর সেরা অস্ত্র কিন্তু ছিল আত্মার এক মিঠে আওয়াজ। আত্মার আওয়াজ বললাম এই কারণেই যে হেমন্তের মতো ভরাট রোমান্টিক ধ্বনি ওঁর নয়, শ্যামল মিত্রের অনুনাসিক টোনও ওঁর নেই, মস্ত কিছু রেঞ্জও নয় গলার, কিন্তু এমন একটা আমেজ আছে তাতে, এমন আন্তরিকতা ও বেদনার ছোঁওয়া আছে তাতে যা বুকে গিয়ে ধাক্কা মারে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ওঁর গলার এই ঝিম, অলস মাধুর্য নির্বাসিত হতে থাকে। সারাক্ষণ নজরুলগীতি গাওয়া কিছুটা যেন কাল হল্ল ওঁর। সুরের কোথাও দাঁড়ানোর চাইতে ক্রমাগত সপ্তকবিহারী হয়ে উঠেছিল ওঁর কণ্ঠ। তিনি আধুনিক গান গাওয়া বন্ধই করে দিয়েছিলেন।

আজ কিছুটা শ্লাঘা বোধ করি এ জন্যই যে, যে-ক'জন ভক্ত ও অনুরাগীর ক্রমান্বয় পীড়াপীড়িতে উনি ফের ফিরে এসেছিলেন আধুনিক গানে তাদের একজন আমি নিজে। কিন্তু ততদিনে কিছুটা যেন দেরিও হয়ে গেছে, হৃদরোগের শিকার হয়েছেন শিল্পী। মাথা ভর্তি সুর, গলাও মিষ্টি, কিন্তু দমে কুলোয় না।

তবে একটা কথা আছে না?—ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে! ঠিক সেই ধারায় শেষ দু-বছর যা বৈঠকি গানের রেকর্ড করে গেলেন তার কোনো তুলনাই হয় না। শুনতে শুনতে মনেও হত যে, বাবু-চেহারার লোকটি আসলে কলকাতার পুরোনো বাবুই। কী মেজাজে, কী হৃদয়ে, কী ভঙ্গিতে। বাংলা রাগপ্রধানের এমন সূক্ষ্ম-সহজ পদ্ধতি পাঁচ-ছয় দশকের বাংলা আধুনিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, যে আমার কাছে অন্তত ওঁর স্থান হেমন্ত, ধনঞ্জয়ের পরে-পরেই। এবং ওঁর 'এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'-র স্থান সমস্ত বাংলা আধুনিক গানের একেবারে মাথায়।

মানবেন্দ্রর নজরুলগীতিও আমাকে মুগ্ধ করেছে, তবে সেসব ওঁর প্রথম দিককার গান। 'এত জল ও কাজল চোখে', 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান', 'কোন কূলে মোর ভিড়ল তরী', 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'অরুণকান্তি কে গো

যোগী ভিখারি', 'পায়েতে বিঁধেছে কাঁটা', 'কেন কাঁদে পরান'.... এরকম বহু গানই আছে যা বাজলে আমার চোখে জল আসবে আজও। কিন্তু আমি আমার সমস্ত কান্না বেঁধে রাখতে চাই ওঁর সেইসব আধুনিকের জন্য, যার সঙ্গে আমার এবং আমার মতো অগণিত মানুষের বাল্য ও প্রথম যৌবনের শীতের দুপুর, বর্ষার সন্ধ্যা, গ্রীষ্মের তারা ভরা আকাশ ও রাত্রি মিশে আছে। 'লালু-ভুলু' ছবির গান, 'বসন্ত বাহার' ছবির গান এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির মুহূর্তে রচিত গান 'এই গঙ্গা, সেই পদ্মা'-ও যুক্ত হবে সেই তালিকায়। কয়েক প্রজন্মের বাঙালি শ্রোতার চোখের জল বাঁধ ভাঙবে ফের যেদিন রেডিয়োতে বাজবে 'আঁধারে আমি তোমায় খুঁজে মরি।' আর আমি, ব্যক্তিগতভাবে, ওঁর ওই একটি গান শুনতে শুনতে বুড়ো হয়ে যেতে চাইব (মরতেও চাইতে পারি!)—'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি।' আমার ধারণা যে এই আকাঙ্ক্ষায় আমি খুব নিঃসঙ্গ নই। বহু পুরুষ, বহু নারীও আছেন আমার সঙ্গে।

বিরহীর প্রস্থান

প্রায় হঠাৎ করে, সামান্য রোগভোগে, যেভাবে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন সেটা ওঁর চরিত্র এবং গানের সঙ্গে খুব মানানসই। ধুতি-শার্টে, শীতকালে র‍্যাপার জড়িয়ে, অধিক শীতে মাথায় মাফলার বেঁধে সতীনাথবাবু ছিলেন পুরোদম আটপৌরে বাঙালি। পেশাদার আধুনিক শিল্পীদের মাঞ্জা বলতে যা বোঝায় তা কোনো দিনও তাঁর ছিল না। তাঁর বিরলকেশ, গোঁফের ছাঁট, আনমনা চাহনি আর নামানো কণ্ঠস্বর, সব কিছু দারুণ মিশ খেত ওঁর নিরভিমান, হইচই-হীন জীবনধারার সঙ্গে। এই জীবনধারাটাই ছিল তাঁর শিল্পের ভিত্তি। আটপৌরে বাঙালি ভদ্রলোক সারাটা জীবন গানের মাধ্যমে বাঙালির মনের কথা কয়ে গেছেন। বীরত্ব, স্ফূর্তি, গতি, ঝুমঝুমারি যেহেতু রোমান্টিক বাঙালির মনের ব্যাপার নয়, সতীনাথ বরাবর গেয়ে গেছেন বিরহ বেদনা, নিঃসঙ্গতা, নিরালা, অন্ধকার আর নীরবতার গান। সতীনাথের সমস্ত স্মরণীয় গানই আসলে একটাই গান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরে ও শব্দে ধরা এক গভীর দুখানুভূতির গান। এবং সেই গানটি একটি মহৎ গান।

সংগীতজগতে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় হেমন্ত ও ধনঞ্জয়ের চেয়ে ঢের নবীন। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় যখন তাঁর 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম' গানটির ডিস্ক বেরুল শ্রোতারা টের পেয়েছিলেন যে বাঙালির মন-বোঝা আরেক স্থায়ী কণ্ঠ বাজারে এসেছে। বড়ে গুলাম আলি খাঁ ও চিন্ময় লাহিড়ির কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকটি কিন্তু তান, তার্কিব, হরকত, তেহাই দিয়ে আসর মাতের চেষ্টাই করলেন না, তালিমি গলায় ছুটোছুটির লেশমাত্র নেই। বাংলা আধুনিকে তিনি নিয়ে এলেন এক ঝিম, উদাস ভাব। প্যাঁচ, মোচড়, ধাক্কার বদলে তিনি বেছে নিলেন স্পর্শ, আন্দোলন, স্বরের মূর্ছনা। ফলে তাঁর গানে ভর করল প্রায় এক নিরাভরণ, নিরলংকার সৌন্দর্য। রুদ্ধ কান্নার স্বর ছেনে তৈরি হল তাঁর সুর। এই সুর ও এই গায়ন যে বড়ো কঠিন ব্যাপার এবং এই গানই যে প্রকৃত বাংলা আধুনিক গান, এতশত না-বুঝেও বাঙালি শ্রোতা কিন্তু অচিরে ভক্ত হল সতীনাথের, সংগীতজীবনের প্রথম থেকেই



যশস্বী হলেন শিল্পী। কিন্তু তাঁর মেজাজ-মর্জি, চেহারা-চরিত্র কিছুই বদলাল না। বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স সতীনাথের হিসেবের মধ্যে কোনোদিনই ছিল না, ছোট্ট সরকারি ফ্ল্যাটেই কাটালেন জীবনের শেষ ক-টি বছর, কিন্তু পূর্ণ মনোযোগে, আপসহীনভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর অন্তর্মুখিন গানের স্টাইল। প্রায় প্রেমের সংলাপের মতো করে বলা এই করুণ গানগুলি হল যেন একটিই নারীকে উদ্দেশ করে জীবনভোর গাওয়া। Style is the man এই ইংরেজি প্রবচন যদি আজও মান্য থাকে এই deconstruction-এর যুগে তবে বলতে হবে এটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও গান।

প্রেয়সীর প্রতি সংলাপের কথা বলেছি বলে উল্লেখ করতে হয় ওঁর গান 'যদি তুমি না এ গান কোনোদিন শোনো'। অভিমানে ভরা এই গান কথায়, সুরের অন্দোলন এবং গায়নে স্মরণে আনে আরেকটি চিরস্মরণীয় অভিমানী গান, শচীনদেবের 'মন দিল না বধু'। নিরালার প্রসঙ্গ উঠলে উল্লেখ করতে হয় দুটি গানের, যার একটি তাঁর গাওয়া, অন্যটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য সুর-করা। নিজের গানটি 'আজ মনে হয় এই নিরালায়' আর হেমন্তবাবুর জন্য সুর করেছেন যে-বাণীতে সেটি 'তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই'। শিল্পীর নিজের গানে ছন্দের দোলা আছে, কিন্তু তাঁর তৈরি সুরে যেন ধ্বনির মাধ্যমে ধরার চেষ্টা হয়েছে নৈঃশব্দ্যকে। বলতে নেই, এ এক অসাধারণ সুরারোপকীর্তি।

হেমন্তবাবু গানটিকে তাঁর প্রিয়তম গানগুলির একটি বলে উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, এ-গানের সুর হল নিস্তব্ধতার সুর।

সতীনাথবাবুই প্রথম বাংলা আধুনিক গাইয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে— 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে'। এও এক বিরহ ও নৈঃসঙ্গ্যের গান, এবং সুরটি একেবারে আগমার্কা সতীনাথ। শুধু নিজের গানেই নয়, সুরারোপের মাধ্যমে অন্যের গায়নেও তাঁর স্টাইল ঢেলে দিতে পারতেন সতীনাথ। তবে যে-কারণে 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে' গানটির প্রসঙ্গ তুললাম তা হল এ গানে একটা অন্ধকারের ছবি আছে, যার যতটা আভাস বাণীতে প্রায় ততটাই সুরে।

'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' পঙ্‌ক্তিটি খুব টেনে টেনে, ওপরে নিয়ে হালকা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। 'আকাশপ্রদীপ' কথাটায় যে-অন্ধকারের প্রেক্ষাপট রচনা হয় তাকেই সুরের মাধ্যমে গভীর করা হয় 'দূরের তারার পানে চেয়ে'-র সুরাংশে। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত মুড সং। চার দশকেও যার গায়ে এতটুকু মরচে ধরেনি।

সতীনাথবাবুর কণ্ঠের সম্পদ ছিল সারাক্ষণ সুরে ভিজে থাকা। দাপুটে তো নয়ই, গমগমে, নায়কোচিত গলাও নয়। অসহায় এক প্রেমিকের মনভাঙা স্বর। সতীনাথ এই কণ্ঠকে ব্যবহার করতেন তুলির মতো, বেদনার ছবি আঁকার জন্য। গভীর প্রেম ছিল স্ত্রী উৎপলা সেনের প্রতি, সব গানই যেন ওঁরই উদ্দেশ্যে গাইতেন। অথচ যে-কোনো নারীই ভেবে নিতেন এ যেন তাঁকেই নিবেদিত গজল। সজ্জন, রোমান্টিক, বাঙালি মধ্যবিত্ত মনে করে নিতেন সতীনাথ তাঁদের কণ্ঠস্বর, তাঁদের প্রেমের দূত। সম্ভবত ওঁর সব চেয়ে বিখ্যাত গান 'জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো' এক কালে বাঙালি যুবার একলা বসে সময় কাটাবার গান ছিল। সতীনাথের গান ছিল, বলতে গেলে, চিত্তশুদ্ধির গান। সুখী স্বামী সতীনাথবাবুকে শেষ বয়সে দেখেও ধন্ধ জাগত—এত দুঃখ মানুষটি বুকের কোথায় রাখেন? নজরুলগীতি (যা তিনি অতি চমৎকার গাইতেন) বাছলেও শোনাতে ভালোবাসতেন 'শাওন রাতে যদি'। হয়তো বাগেশ্রীতে রাগপ্রধান গাইছেন, সেখানেও এমন বেদনার ছোঁয়া এনে দিতেন যে, চল্লিশ বছর ধরে সতীনাথের গানের ঘোর আর কাটল না বাঙালির। এর মধ্যে কত ওঠাপড়া গেল সমাজের, কত বিপ্লব, রক্তপাত, রাজনৈতিক পটবদল, কিন্তু বাঙালি যে ভিতরে ভিতরে সেই বাঙালিই আছে—জীবনানন্দ, উত্তম-সুচিত্রা, হেমন্ত-সন্ধ্যা, চুনী-পিকে, প্রেম-বিরহ অন্ত প্রাণ—তার আরেক প্রমাণ তার সতীনাথ-প্রেম। আত্মজীবনী উচ্চারণের মতো নিজের গান তিনি গেয়ে গেছেন—ধারাবাহিকভাবে যেন একটাই গান—এবং নিজের একটি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন বাঙালি হৃদয়ে। এ তো গেল গানের দিক; জীবনেও তিনি সতীনাথ অর্থাৎ শিব, আত্মভোলা আদর্শ মানুষ। ক-দিন আগে অবধিও শিবরাত্রির সলতের মতো জ্বলছিলেন এক ধস্ত, অন্ধকার বাঙালি পরিবেশে।

কিশোরকুমার : বাঙালির অহংকার

কলকাতা শহরে কিশোরকুমারকে নিয়ে এখন 'ভুলছি না, ভুলব না' রব সর্বত্র। কিশোরের নিজের স্বর্ণকণ্ঠও যখন-তখন ভেসে আসছে রেডিয়ো, টিভি, রেকর্ডের দোকানে বাজানো ক্যাসেট থেকে। এক রবিবার দূরদর্শনে দেখানো হল ওঁর 'চলতি কা নাম গাড়ি' ছবি, যে-দুর্ধর্ষ হাসির ছবিটা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়ে, দেখে অধিক রাতে চোখের পাতা ভিজে এল কান্নায়। এই মানুষটা, কপাল দোষে ঠিক এই মানুষটাই, নেই! কিশোরকে নিয়ে এই কান্না আমাদের কবে যে শেষ হবে তার কোনোই ধারণা নেই কারও। বাঙালিদের মধ্যে থেকে এরকম এক 'splendid entertainer', বিনোদন শিল্পী আর কবে যে কেউ উঠে আসবেন তারও কোনো হদিশ কারও নেই। চরিত্রে ও মেজাজে নিটোল বাঙালি, খ্যাতি ও শিল্পীমাহাত্ম্যে সর্বভারতীয়, সুদূর মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায় ভূমিষ্ঠ কিশোর ছিলেন কলকাতার অহংকার। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর গানের অনুষ্ঠানে চারিদিক থেকে রব উঠত 'গুরু গুরু!' তাঁর মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সংযোজিত জীবনী পড়ার আগে কারই বা জানা ছিল তিনি ভিনপ্রদেশী বাঙালি?

কলকাতাকে তিনি উল্লেখ করতেন নিজের শহর বলে, বাংলা গান গাওয়ার সুযোগ পেলেই লুফে নিতেন, পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে প্রযোজনা, অভিনয় ও গান গেয়ে তৈরি করেছিলেন জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'লুকোচুরি', দু-বছর প্রেম করে ১৯৫০-এ বিয়ে করেছিলেন প্রবাসী বাঙালি মেয়ে রুমা (গুহঠাকুরতা) দাশকে, পরে হিন্দি ফিল্মি গানের অবিসংবাদিত সুপারস্টার হয়ে ওঠার পর সত্তর দশকের গোড়ায় ফিরে এসেছিলেন বাঙালিদের মধ্যে 'অমানুষ' ছবির বাংলা গান নিয়ে। ষাটের দশকের এক সময় মামাশ্বশুর সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' ছবিতে গেয়েছিলেন রোমান্টিক রবীন্দ্রসংগীত 'আমি চিনি গো চিনি', আশির দশকের গোড়ায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় করেছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের এক চমকপ্রদ এল পি। যা শুনে অনেকেরই সে সময় মনে পড়ে গিয়েছিল কে এল সায়গলের রবীন্দ্রসংগীত।



কথা ছিল সামনের বছর করবেন নজরুলগীতির একটা লং প্লেইং। কিন্তু হায়! এক ধরনের পূর্ণ নির্ভরতা যখন তৈরি হচ্ছিল মানুষটির প্রতি, ধারণা হচ্ছিল এঁকে দিয়ে হবে না গানের এমন কাজ নেই, সুপারহিট হওয়ার জন্য হিন্দি ছবির মতো বাংলা ছবিও কিশোরনির্ভর হয়ে উঠছিল ঠিক তখনই, অলক্ষুণে ১৩ তারিখের (অক্টোবর) সন্ধ্যায় হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ করার মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দূরদর্শনের খবরে, কিশোরকুমার নেই।

তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কিশোরকুমারকে সকলে 'প্রতিভা' বলে উল্লেখ করেছেন। এত এত অসংখ্য চিরস্মরণীয় গান যিনি গেয়েছেন তাঁকে 'প্রতিভা' বলে উল্লেখ করা কেন? প্রতিভা ছাড়া যদি লতা, আশা, রফি বা হেমন্ত হওয়া না যায় তবে কিশোরই বা হওয়া যাবে কেন? অত বড়ো শিল্পীর পক্ষে প্রতিভাধর হওয়া তো অবধারিত। আসলে কথাটা চালু হল কারণ প্রথাসিদ্ধভাবে তালিম না-পাওয়া কিশোর জীবনের একেক পর্যায়ে একেক ধরনের বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিয়েছেন গানের ক্ষেত্রে। সেইসব গান যে ওঁর পক্ষে কখনও গাওয়া সম্ভব ছিল তা ওই গান রেকর্ড হওয়ার আগে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। পঞ্চাশের দশকের কিশোরের গানের একটা নকশা, প্যাটার্ন ছিল। ইয়ডলিং করে, অদ্ভুত অদ্ভুত কমিক ধ্বনি করে, সুরের জাগলারি করে, নানান বিদেশি অলংকার গলায় রপ্ত করে, আর সেই সঙ্গে ভারী খাদের আওয়াজে রোমান্টিক মূর্ছনা সৃষ্টি, হামিং ইত্যাদি করে এক নিজস্ব স্টাইল বানিয়ে নিয়েছিলেন। পরে ষাটের দশকের মাঝামাঝি 'গাইড' ছবিতে শচীনদেব বর্মনের নির্দেশনায় 'গাতা রহে মেরা দিল' গেয়ে তাঁর যেন এক নবজন্ম হল। এরপর গত বিশ-বাইশ বছরে কত যে কী গান তিনি গাইলেন কত ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ ও স্টাইলের, যে তাঁর মৃত্যুদিন অবধি আমরা বুঝে উঠতে পারিনি কিশোরকুমারের গানের সত্যিকারের জোর কোথায়। শুধু এই জেনেছি যে খোলা, উদাত্ত, দরাজ এই গলা দিনে দিনে একটা যৌবনের ধ্বনি হয়ে উঠেছিল। তাবৎ ভারতীয় যুবার অন্তঃস্থিত প্রেমের অনুভূতি তিনি পূর্ণ দরদে নিবেদন করেছেন হালকা, মাঝারি কিংবা ভারী গানে। যুবসমাজের প্রেমকে তিনি সুর দিয়েছেন।

এই প্রেমিক, দরদি মানুষটিই কিন্তু জীবনে কেবলই, কিছুটা বিফলেও, প্রেম খুঁজে ফিরেছেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রী রুমা গুহঠাকুরতা ১৯৮২-তে 'রূপসা' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন তাঁদের পরিচয়পর্ব ও বিবাহ সম্পর্কে—"সম্ভবত ১৯৪৬ বা '৪৭ সাল হবে। আমি তখন বম্বে টকিজে অভিনয় করতাম। সেইখানেই ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় একসময় চলে আসে ঘনিষ্ঠতায়। এরকম বছর দুয়েক চলার পর '৪৮ সালে আমাদের বিয়ে হয়। এগুলো কোনো নতুন কথা নয়।

‘বিয়ের পর আমরা আট বছর বম্বেতে একসঙ্গে ছিলাম। যদিও প্রথম দু-বছরই ঠিক মনের মিল ছিল। তখন আমিও বম্বেতে অভিনয় করতাম। বিয়ের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রজনী’ ছবিতে অভিনয় করি। তখন আমার অন্ধ মেয়ের চরিত্রটি দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। তবু অভিনয় ছেড়ে দিলাম। কারণ সে মুহূর্তে মনে হয়েছিল শুধু সংসার নিয়েই থাকব। সে ভাবে চলছিল। কিন্তু উনি ক্রমশই অভিনয় ও গান দুটো নিয়েই চলচ্চিত্রের সঙ্গে এত বেশি জড়িয়ে পড়েছিলেন যে সংসারের দিকটার গুরুত্ব ওঁর কাছে অনেক কমে গেল। স্বভাবতই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।”

রুমার এই বক্তব্য তাঁর একান্ত নিজের; এ নিয়ে কিশোরকুমারের কোনো বক্তব্য আমরা পাইনি। এই বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কিছু কাল বাদে তিনি বিবাহ করেন হিন্দি চলচ্চিত্রের পরমাসুন্দরী অভিনেত্রী মধুবালাকে। দুজনাই ছিলেন একে অন্যে মুগ্ধ। দূরদর্শনের পর্দায় ‘চলতি কা নাম গাড়ি’তে দুজনকে দেখে ওঁদেরকে রূপ ও মেধার বিরল পরিণয় বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু কিশোরের এই শুভপরিণয়ও ছিল পদ্মপত্রে নীড়ের মতোই স্বল্পস্থায়ী। সামান্য কিছুদিন বাদে দুরারোগ্য লিউকেমিয়ায় মধুবালার মৃত্যু হল। কিশোর চিকিৎসার জন্য ওঁকে বিদেশেও নিয়ে গিয়েছিলেন। মধুবালার মৃত্যুর পর কিশোর আরও দু-বার বিয়ে করেছিলেন। তৃতীয় স্ত্রী যোগিতা বালির সঙ্গেও সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি; চতুর্থ স্ত্রী লীনা চন্দ্রভারকর ছিলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে শিল্পীর যখন মৃত্যু হল। এইসব প্রাপ্ত, অপ্রাপ্ত প্রেমের স্মৃতি ভর করে থাকত কিশোরের কিছু কিছু অসাধারণ করুণ গানে। যার একটি ‘ঘুংরুকি তরহ বাজতা রহা হুঁ ম্যাঁয়/কভি ইস পদ্‌মে, কভি উস্ পদ্‌মে’। জলসায় এইসব গানের সময় কিশোরের মুখ যাঁরা মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন তাঁরা জানেন হাসি আর হুল্লোড় ভরা মানুষটার ভেতর একটা রিক্ত, ব্যথাতুর মানুষ স্তব্ধ থাকতেন।

কিশোরের গানের জীবনের ধ্রুবতারা ছিলেন কে এল সায়গল। ওঁর কিছু কিছু গানে সায়গলের স্মৃতি ফিরে আসে। তবে কিশোর ছিলেন বাস্তবিক অর্থে স্বশিক্ষিত, নিজের মেধার দ্বারা চালিত, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ। বেশ কিছুকাল আগে এক দীর্ঘ, আন্তরিক সাক্ষাৎকারে লতা মঙ্গেশকর বর্ণনা করেছেন এক সদ্য তরুণ কিশোরকুমারের। দুজনেই তখন বম্বেতে এসেছেন গানের ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্যে। দুজনে ভিড়ের ট্রেনে শহরতলি থেকে আসেন স্টুডিয়ো পাড়ায়। লতা দেখতেন কিশোরের চোখে-মুখে উচ্চাকাঙ্ক্ষার আভাস। লতা জানতেনও ছেলেটি এক বিরল ক্ষমতার অধিকারী। ক্রমে লতার নাম হতে থাকল গানে আর কিশোর তাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখতে থাকলেন অভিনয়, পরিচালনা, ছবির গল্প লেখালিখি এবং

অবশ্যই গানে। গানের কেন্দ্রে ফিরে আসতে এই উৎকেন্দ্রিক চরিত্রটির সময় লেগে গেল অনেকখানি। কিন্তু যে-সময়ে লোকে প্রায় ধরে নিতে বসেছে যে এক বিশেষ ধরনের গানেই কিশোরের প্রতিভা ঠিক তখনই এক বিস্ময়কর চেহারায় দর্শক ও শ্রোতৃসমাজে ওঁকে পেশ করলেন শচীনদেব বর্মন 'গাইড' ছবির 'গাতা রহে' গানে।

শচীনদেবের সঙ্গে কিশোরের সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ওর এই গানের জগতে আসার পিছনে শচীনদার অনেকখানি অবদান আছে। শচীনদার সুরে যে-গানই ও করেছে তা হিট। ...ও সত্যিই ট্যালেন্টেড। ওর ক্ষমতার শেষ নেই। ওরও তো আমার মতো রেওয়াজ করা গলা নয়, খোলা, ন্যাচারাল গলা। কিন্তু যেটা ওর বিশেষত্ব তা হল সুরের ওপর ওর অসাধারণ দখল। যে-কোনো কথা দিয়ে, যা খুশি গাইলেও ওর গান হিট করবেই। হালকা গান তো ও কম করেনি। কমেডিধর্মী গান। হা হা হো হো করতে করতেও কিন্তু এক চুলও সুর থেকে সরে যায় না। যেমন 'বোমচিকা, বোমচিকা' গানটার কথাই ধরুন না কেন, সারা গানটায় কী আছে? কিন্তু ভয়েস মোল্ডিং করে সুরে পড়ার সময় সুর ঠিক রেখে, একেবারে মাতিয়ে রেখে গেছে। ... হেসে, কমিক করেও ঠিক সেই মূল গানে গিয়ে পড়ল। একেবারে সুর মেপে গেয়ে গেল। ... তবে হালকা গানে ও যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, সিরিয়াস গানেও কিন্তু ওর ক্ষমতা কম নয়। আমি তো জানি, ওর ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখছি, সিরিয়াস গানও ও কী ভীষণ দরদ দিয়ে গাইতে পারে।'

কিশোরের বহুদিনের বন্ধু কমল কুমার ঘোষ (মেগাফোন রেকর্ডিং কোম্পানির কর্ণধার) কিশোরের মেজাজি, দেমাকি চেহারার ভেতরকার কুসুমকোমল মানুষটির কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। কমলের ভাষায়, ওকে একদণ্ডও কাজ ছাড়া থাকতে দেখিনি।

শেষে এই অতিরিক্ত কাজই ওঁর কাল হল। কাজ কাজ আর কাজ যাঁর জীবন, হার্ট অ্যাটাকের পর অবসর-গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেও যিনি কাজ ছাড়া থাকতে পারলেন না সামান্য আটান্ন বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যুর শারীরিক, ডাক্তারি কারণের জন্য খুব দূরে আমাদের যেতে হবে না। কিন্তু ওঁর কাজ ছিল এমনই প্রকৃতির যা কর্মীকে কোনো দিনই নিস্তার দেয় না। কারণ ওঁর কাজ ছিল গান।

আমাদের মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাবতরঙ্গের মতন

আমার বাবার প্রিয়তম গায়ক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়, আর তাঁর প্রিয়তম গান 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে।' কৃষ্ণচন্দ্রের ওই গানটি সারাক্ষণ বাড়ির গ্রামোফোনে বাজত আর বাবা যতবারই ঘরের পাশ দিয়ে খড়ম পায়ে হেঁটে যেতেন ওই গান শোনামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। খড়মের আওয়াজ বন্ধ হলেই আমরা টের পেতাম বাবা ওঁর বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুর গান শুনছেন।

বেশ কয়বার কৃষ্ণবাবুকে আমাদের বাড়িতে আসতে দেখেছি; এলেই দেখতাম হাত দিয়ে স্পর্শ করে বাবাকে স্নেহ জানাচ্ছেন। এরকম এক দর্শনের ক-দিন আগে ওঁকে সিনেমার পর্দায় গাইতে দেখেছিলাম 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বধূ, ওইখানে থাকো।' তাতে বেশ রোমাঞ্চ হয়েছিল আমাদের এই ভেবে তাহলে বাবার বন্ধুরাও সিনেমায় নামে। এখন স্মরণ করলে খেয়াল হয় যে আমার ছেলেবেলা দখল করে রেখেছিল মূলত দুটি ধ্বনি— কৃষ্ণচন্দ্রের কণ্ঠে 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার' আর বাবার নিজের কণ্ঠে বায়রন থেকে অবৃত্তি 'রোল অন, রোল অন, দাও ডার্ক অ্যান্ড ডিপ ব্লু ওশান রোল।'

এইরকম এক পরিস্থিতিতে একদিন সৌভাগ্য হল কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর ঘোষ লেনের বাড়ির ওপরের তলায় বাবার পাশে বসে ভদ্রলোকের গান শোনার। সাদা ফরাশ পাতা ঘরে অন্ধ গায়ক প্রাণ উজাড় করে একের পর এক গান গেয়ে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর ঈষৎ পিছনে বসে তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে যাচ্ছিলেন এক অসম্ভব সুরেলা কণ্ঠ যুবক, যাঁর নাকি ইতিমধ্যেই বেশ নামডাক হয়েছে সর্বত্র। কৃষ্ণবাবু সকলের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়েছিলেন 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র' বলে। আসরের পর ছাদে বসিয়ে শিল্পী আমন্ত্রিতদের আহার করিয়েছিলেন মাংসের চাঁপ এবং পরোটা। সে-স্মৃতি আজও ভুলিনি কারণ আমার জীবনে প্রথম মাংসের চাঁপ খাওয়া ওই সন্ধ্যায়। ভুলিনি কৃষ্ণবাবুর অলৌকিক সেইসব গান, যার শুধু একটির সঙ্গেই প্রকৃত পরিচয় ছিল

ততদিনে। আর ভুলিনি সেই তরুণ গায়ককে, আর ক-দিনের মধ্যেই যাঁর নাম আমাদের বাড়িতে হাওয়ার মতো ঘুরতে লাগল : মান্না দে। এ হল তিপান্ন-চুয়ান্ন সালের ঘটনা।

তবে সেই প্রথম দিনের মান্না দে-কে পেতে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে। রাজকাপুরের ছবির দৌলতে সবাই যখন ওঁর নাম করছে, হিন্দি ছবির এই মস্ত গুণী কণ্ঠের ভক্তের তালিকায় সবাই যখন নাম ওঠাচ্ছে সেই তখনও আমি মান্না দে বলতে অভিমানী তরুণকেই দেখতে পাই মনের পর্দায়। ঋষিতুল্য কাকার পাশে বসে চোখ বন্ধ করে একের পর এক সুর লাগাচ্ছেন। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য!—এর কিছুদিন পর যখন বাংলা গানের বাণী ও সুর নিয়ে ভেবে ভেবে গান শুনতে শুরু করেছি ঠিক তখনই বছরে কয়েকটি করে অবিস্মরণীয় বাংলা গান উপহার দেওয়া শুরু করলেন মান্না দে। এক সময়োপযোগী অথচ এত সময়োত্তীর্ণ গান সেসব যে আজও আমার সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে রাত দখল করে রেখেছে তারাই। মহাশূন্যের মতো মনেও নাকি স্থানাভাব হয় না কখনও; তাহলে পঞ্চাশ আর ষাট দশকের পর হৃদয় এত কৃপণ হয়েও উঠল কেন? কেন হৃদয়ের সেই 'অনুরোধের আসরে' এত প্রতিরোধ নতুন গানের প্রতি? কেন কাঁদতে হলে আজও তুলে নিই মান্নার গান? কেন সুখ হলে শুনতে চাই মান্না দে-কে? কেন আজও আনমনে ওঁর গানকে বাহন করি স্মৃতির? তার কারণ শুধু এটাই নয় যে তিনি খুব মস্ত বড়ো তালিমদার গায়ক, কারণ এও নয় যে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে সারাক্ষণ আমরা ওঁর, হেমন্তর, ধনঞ্জয়ের, সতীনাথ, শ্যামল, মানবেন্দ্রর গান শুনলাম। কারণ যদি থাকে (প্রেমের মতো প্রেমের গানেরও খুব একটা কারণ হয় না) তবে তা হয়তো এটাই যে, হেমন্তর মতো মান্নাও একটা যুগ এবং সমাজের অনুভূতিকে প্রকট করছিলেন গানে গানে। মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রেমই ছিল মান্না দে-র সেইসব বেসিক রেকর্ডের গানের ভিত্তি। এক অভিমানী তরুণ সমাজের ডায়েরির ছেঁড়া পাতার মতো ছিল সেই গান। একেকটা গানে এতখানি করে সময় ও সমাজ আর ধরা পড়েনি পরবর্তী কালে। বাল্য থেকে কৈশোর হয়ে যৌবনে এসেও দেখলাম সেই গানই আমাদের ঘিরে আছে, আমাদের ধারণ করছে। আর এতকাল পরেও সেই গান থেকে কিছুমাত্র মুক্তি নেই। এহেন গায়কের গানেরই তো সুবর্ণজয়ন্তী হয়! ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির এম.এ ক্লাসে, অফ পিরিয়ডে, দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের সেই ঘরে যে সহপাঠীটি দিনের পর দিন গাইত মান্নার 'এই তো সেদিন তুমি আমাকে বোঝালে' বা 'এরই নাম প্রেম' তার গানেরই রজতজয়ন্তী পড়ল এবছর। মান্না দে শুধু আমাদের গানই



গেয়েছেন। শুধু সুর ও বাণী নয়, এক নিয়তির বন্ধনেও আমরা বাঁধা আছি ওঁর সঙ্গে।

পাঁচের দশকের শেষ ক-টা বছর এবং ছয়ের দশকের প্রথম ক-টা বছর বেসিক রেকর্ডের যে-সব গান মান্না গাইলেন তার একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমরা তখনই লক্ষ করেছিলাম। গানগুলো সবই প্রেমের এবং প্রায় সবই বিরহের, অথচ বাণী, সুরারোপ এবং বিশেষত, গায়নে অপূর্ব বৈচিত্র্য। 'এই তো সেদিন', 'আমি সাগরের বেলা' আর 'এরই নাম প্রেম' এই তিনটে গানেরই সুর বিরহের, খুব টেনে টেনে গাওয়া এবং কথার মতো সুরেও কান্নার বৃহৎ ওজন ও মন্থরতা ধরা পড়ে। অথচ এই কথা, এই সুর শিল্পী গাইলেন এমনই এক ধ্বনির বিকাশে, এমনই এক levitation বা নির্ভার কণ্ঠমাধুর্যে যে গানগুলো শুনে প্রাণ হালকা হয়, বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে না বুক। কবি শেলির সেই বহুউদ্ধৃত কথাটি (Our sweetest songs are those / That tell of saddest thought) অতিসরলীকৃত হতে হতে প্রায় নিরর্থক হয়ে গেছে; বেদনার গান হলেই তা মধুর হয় না। বেদনার গান যখন গায়নগুণে শ্রোতাকে বেদনার থেকে কিছুটা মুক্তি দেয় তখনই তা মধুর হয়। রবীন্দ্রনাথের বিরহের গান আমাদের (নিজেদের অজ্ঞাতেই) বেদনা লাঘব করে বলেই তা মধুর। কীর্তন আমাদের কাঁদিয়ে catharsis বা ভারমুক্ত করে বলেই তা মধুর। কিন্তু গাইতে না পারলে এই গানই পাথর হয়ে জমে কানে, মগজে, হৃদয়ে। অতিশয়োক্তি না করেই বলতে চাই যে, মান্নাবাবুর গান আমাদের আধুনিকতম কীর্তন, সেখানে পাত্রপাত্রী রাধাকৃষ্ণ নন, আমরা সবাই—এখনকার নারী ও পুরুষ। মৈথিলীতে বিচ্ছেদজনিত বিরহের একটা ছবি এরকম 'হরি গেয়ো মধুপুর হম কুলবালা/পথিপর লুটয়িত মালতিমালা।' আমাদের আধুনিক বিরহকীর্তনে হারানো নয়, ফিরে পাওয়ার শোক ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—'সেই তো আবার কাছে এলে/এতদিন দূরে থেকে বলো না কী সুখ তুমি পেলে...' এই শোকের ভিত্তি অভিমান, মান্নাবাবুর গায়ন এই অভিমানকেই সুর দিয়েছে। কিন্তু মান্নাবাবুর একটা মস্ত গুণ অথবা দোষ হল যে, এই অভিমানকে তিনি নির্লিপ্ত, স্তব্ধ রাখতে পারেন না বা চানও না, তিনি বাণীর মুক্তি খোঁজেন কান্নায়। কীর্তনের মতোই। 'এই তো সেদিন' গানে, 'দুটি হাত ধরে তুমি আমারে বোঝালে/এ শুধু আমার, তুমি কেঁদো না' কিংবা 'সেই তো আবার' গানে 'বলো-না কী সুখ তুমি পেলে' কথাগুলিতে তিনি গলার যে-আঁশ কাজে লাগিয়েছেন, স্বরের যে-প্রকম্পন প্রয়োগ করেছেন তা কীর্তনের কান্নার সমগোত্রীয়। ফলে হঠাৎ করে মধ্যবিত্ত বাঙালির অনুভূতির দুই মেরু আমরা পেয়ে গেলাম যুগের দুই শ্রেষ্ঠ গায়ক হেমন্ত ও মান্নার মধ্যে।

হেমন্তর বিরহের গানে পেলাম এক নির্মোহ মুক্তি আর মান্নার গানে আবেগবিধুর আত্মসমর্পণ এবং এই দোলাচলই নিটোল ভাবে ব্যক্ত করেছে বাঙালির কান্না, বাঙালির প্রেম।

হেমন্তর নির্মোহ পর্যবেক্ষণ বা মান্নাবাবুর তন্নিষ্ঠ মূর্ছনা দুই-ই বিরলতম প্রতিভা ও ধ্যানের ফসল। হেমন্ত গানকে দেখতেন ছবির মতো, মান্নাবাবু নাটকের মতো। বিস্তর তালিমপ্রাপ্ত কণ্ঠে মান্না দে যে-কোনো অলংকার— স্পর্শ, আন্দোলন, খট্‌কা বা জমজমা বা হরকত তান— প্রয়োগে এক অদ্ভুত নাট্যময়তা সঞ্চারিত করতে পারতেন গানে। আনন্দ অথবা বেদনা এই দুই ধরনের গানেই এক অতুলনীয় দখল ছিল তাঁর। কী হিন্দি, কী বাংলা গানে আনন্দ অথবা বেদনার গানে তাঁর এই সহজ বিচরণ চিরকাল আমাদের অবাক করেছে। মেহমুদের প্লে-ব্যাকে যিনি মজার গান গাইছেন, তিনিই আবার দরবারি কানাড়ায় বাঁধা 'ঝনক ঝনক মোরে বাজে পায়েলিয়া' গাইছেন। হিন্দিতে গানের মুড ও বিষয়ের এই রেঞ্জ বা ব্যাপ্তি আমরা পেয়েছি কেবল রফি ও কিশোরের মধ্যে, বাংলায় কারও মধ্যে নয়। তবে বাংলায় ওঁর স্ফূর্তির সেই গানগুলোই বেশি স্মরণে আসে যেখানে ছদ্ম-আনন্দের আড়ালে কোনও গভীর শোকের ছায়ার আভাস থাকে। যেমন 'এক দিন রাত্রে' ছবির গান 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি', কিংবা কাওয়ালির আদলে ধরা 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে।' শুধু আনন্দ, শুধু বিরহ নয়, আনন্দ-বিরহের এক গোধূলিবেলায়, সন্ধি এলাকায়ও সূক্ষ্ম যাতায়াত ছিল মান্নাবাবুর। শুধু একটি শব্দে যদি মান্নাবাবুর গানের মাহাত্ম্য বোঝাতে হয় তো সেটা হবে range, বৈচিত্র্য।

আর এই বৈচিত্র্যের উৎস হল তাঁর তালিম, তাঁর ব্যাপক উচ্চাঙ্গ পটভূমি। বছর পনেরো-ষোলো আগে 'আনন্দলোক'-এর জন্য একটি ছোটো সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় জেনেছিলাম (ওই একবারই আলাপ হয়েছিল ওঁর সঙ্গে এবং ওঁর ওই শিমলের বাড়িতে, আর খুব চমৎকার সিঙাড়া খাইয়েছিলেন, ওঁর পাশে তখন বসে গীতিকার গৌরীপ্রসন্নবাবু, এবং আমাকে শুনিয়েছিলেন সেবারের পুজোর প্রস্তুতি, নান্দ রাগে বাঁধা 'কী দেখলে তুমি আমাতে' গানটি) যে ওঁর একটা মস্ত ঝোঁক কাওয়ালি ও কাওয়ালদের প্রতি। সুফি গানের এই রুচির ভিত্তি বোধ করি কীর্তনের প্রতি ওঁর আনুগত্য, যার উৎস অবশ্যই ওঁর মহৎ কাকার সাহচর্য। বাংলা আধুনিকে 'ললিতা গো, ওকে আজ চলে যেতে বল না', এই হালকা শৃঙ্গার শ্রেণির গানটি তাঁর প্রত্যক্ষ কীর্তনাঙ্গ নিবেদন হলেও ওঁর তাবৎ প্রেমের গানেই কিন্তু কীর্তনের প্রচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত প্রভাব। 'রামকৃষ্ণায়ন' ডিস্কে অবশ্য মান্নাবাবুকে সরাসরি ভক্তিগীতিতে পেয়ে যাই আমরা দেড় দশক আগে।

বলা যায় আমি নতুন করে প্রেমে পড়েছিলাম মান্না দে-র 'এন্টনি ফিরিঙ্গি' ছবি দেখতে দেখতে। নিঃসন্দেহে 'এন্টনি ফিরিঙ্গি' সর্বকালের সেরা এক বাংলা মিউজিক্যাল ফিল্ম; কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। মান্না এবং সন্ধ্যাকে নিয়ে অনিল বাগচি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, রাগপ্রধান গান দিয়েও আপামর জনতাকে মাতানো যায়। হলিউডের সেরা মিইজিক্যাল ছবিগুলিও যে ক্ল্যাসিকাল-ভিত্তিক (যেমন 'দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক', 'মাই ফেয়ার লেডি' বা 'সাউথ প্যাসিফিক') তা আমরা সর্বক্ষণ স্মরণে রাখি না।। এক-কাঁড়ি গান থাকলেই যে ছবি 'মিউজিক্যাল' হয় না (তাহলে তো এখানকার সব হিন্দি ফিল্মই মিউজিক্যাল) এটা নতুন করে প্রমাণ করার দরকার নেই। তবে বাংলা ছবিতে রাগপ্রধান গানের ঢালাও ব্যবহারে যে কী এফেক্ট আনা সম্ভব তা ষাটের দশকের শেষ পাদে অনিলবাবু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আর মান্নাবাবু ও সন্ধ্যা গেয়ে দেখিয়ে দিলেন। যে ভারী অঙ্গের গানকে কতখানি মধুর ও জনগ্রাহ্য করে গাওয়া যায়। মান্নাবাবুর কণ্ঠে 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়ারি ঝাড়', আভোগী রাগাশ্রিত 'চম্পা চামেলি' বা বিলিতি ঢঙে 'আমি যামিনী, তুমি শশী হে' শুনে সেদিন বাস্তবিকই পাগল হওয়ার দশা হয়েছিল আমাদের। কত সহজে গানগুলো বসে গেল স্মৃতিতে, বারবার শুনে বা গেয়েও যাদের বিন্দুমাত্র পুরোনো করা গেল না এতদিনেও।

এই দ্বিতীয় প্রেমপর্ব থেকেই একটা নতুন জ্ঞান হল মান্না দে-র গান সম্পর্কে। খেয়াল করলেই দেখছিলাম যে নানা অলংকারখচিত গানকেই মান্নাবাবু নিবেদন করেন এক সহজাত সরলতায়। দেখতেই পাচ্ছি তানগুলি বক্র কিংবা বিচিত্র, অথচ গাওয়া হচ্ছে আধুনিক গানের সরল পরিচ্ছন্নতায়। নিজে গাইবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়েছে গানের চলনটা দখলে রাখা কতটা কঠিন। এ ছাড়া লয়দার শিল্পী ঝোঁক ফাঁকের কারিকুরি কত সহজে সামলেছেন, যাতে শ্রবণকালে শ্রোতার মধ্যে আরাম বিঘ্নিত না হয়। কী সুন্দর ছন্দে ছন্দে সংলাপের মতো গেয়ে গেছেন 'স্ত্রী' ছবির গান 'হাজার টাকার ঝাড় বাতিটা'; ফলে পর্দায় উত্তমকুমার গানটি গেয়ে গেছেন সংলাপের ঢঙেই। নিজেরা কণ্ঠে মক্‌শ করতে গিয়ে বুঝেছি সুরকে কীভাবে বেঁধে বেঁধে ছোড়া হয়েছে নাটকীয় সংলাপ সৃষ্টির জন্য। তেমনই আরেকটা গান 'বাজে গো বীণা', যাকে একটা নাটকীয় স্বগতোক্তি, মনোলগ হিসেবে শোনা যায়। গানের আবছা বিষণ্নতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, নুমতোমের ছন্দময় স্ফূর্তি। গানটা শেষ অবধি আনন্দের গান হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কঠিনকে সহজ করাই হেমন্ত ও মান্নার শ্রেষ্ঠ অবদান বাংলা আধুনিকে। হেমন্তবাবু সুরের প্রয়োগই করতেন খাড়া ভাবে, সহজ পদ্ধতিতে; মান্নাবাবু

জটিল সুরই গাইতেন তাঁর সহজাত সহজ ভঙ্গিতে। এ ছাড়া যে-সুরই তিনি গাইতেন তাতে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ রাখতেন। বাংলায় ঠিক মজার গান নয় ('আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্নার' মতো কিছু গান বাদ দিলে), তিনি গাইতেন স্ফূর্তির গান, বাণী, তাল, লয়, সুর ও মেজাজের মেলামেশায় এক অবারিত উচ্ছ্বাসের গান। যার এক নিপুণ নিদর্শন হল, 'তিন ভুবনের পারে' ছবির 'জীবনে কী পাব না, ভুলেছি সে ভাবনা।' এও তো আধুনিক মেজাজ ও রসের গান, কিন্তু কত আলাদা আজকের অশ্রাব্য ঝুমচাক কাণ্ডকারখানার থেকে। আজও শুনলে মনটা নেচে ওঠে, আমার ভালো লাগে, আমার বালিকা কন্যারও ভালো লাগে। গানটার গায়ে বয়সের কোনো ছাপই ধরেনি।

যতদূর মনে পড়ে আমার মান্না দে-র প্রতি অনুরাগের সূত্রপাত 'ও আমার মন-যমুনার অঙ্গে অঙ্গে ভাব তরঙ্গে' গান দিয়ে। যেদিন রেকর্ডে শুনলাম এই গান আমার প্রথম দেখা অভিমানী যুবকটি ফিরে এলেন মনের চোখে। পাশাপাশি শুনছিলাম 'এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি।' আগেভাগে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হলেও মান্না দে বাঙালি মানসে স্থান নিলেন পঞ্চাশ দশকের দ্বিতীয় ভাগে। হেমন্ত, ধনঞ্জয়, অখিলবন্ধু, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, শ্যামল, দ্বিজেন, তালাত মাহমুদ অধ্যুষিত বাংলা আধুনিকে ভরা জোয়ার তখন। এঁদের সবার থেকে ভিন্ন এক কণ্ঠ তিনি, একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজের গানগুলি গেয়ে যাচ্ছেন। আমার মতো ভক্তের কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় তখন তাঁর হিন্দি গান নয়, যদিও সেইসব হিন্দি গানও সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন জাতের। কিন্তু আমি যেহেতু বাল্যে বাবার পাশে বসে ওঁর কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম কৃষ্ণচন্দ্রবাবুর আসরে তাই বাংলা গানে ওঁর প্রসারকে return of the prodigal son হিসেবেই দেখছিলাম। ওঁর যে-সব গান পরে 'মান্না দে হিটস' বলে অ্যালবাম হয়েছিল সেসব শুনতে শুনতে বারবার ফিরে গেছি তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন সালের সেই অলৌকিক সন্ধ্যার স্মৃতিতে। পূর্ণ বিকশিত মান্না দে-কে শুনতে শুনতে আর মুগ্ধ হতে হতে কেবলই মনে পড়েছে সেই সন্ধ্যা, যাকে সন্ধিলগ্ন বলেই মনে করা যায়, যখন কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ঈষৎ পিছনে বসে এক যুবক আভাস দিচ্ছিলেন এক নতুন প্রজন্মের বিকাশের। এর কয়েক বছর পর কৃষ্ণচন্দ্র দেহরক্ষা করেন এবং ততদিনে সংগীতসমাজ জেনে গেছে যে, কেষ্টবাবুর ঘর রক্ষা করার মতন এক নতুন অভিভাবক এসে গেছেন।

আর আজ, এই ১৪০০ সালে, আমাদের মন-যমুনার অঙ্গে অঙ্গে এক ভাবতরঙ্গের মতন হয়ে আছেন মান্না দে।

বেগম আখতার

কলকাতা থেকে লখনউ 'দূর অস্ত'। সেই সঙ্গে হিন্দুস্থানি ঠুংরি গানের অনান্য পীঠস্থানগুলি। পুরোনো কলকাতার লোক বারাণসী যেতেন পুণ্য করতে, ধর্মকর্ম সারতে। তাই কলকাতা কীভাবে ক্রমে লখ্নৌয়ী ঠুংরির খাসমহল হয়ে উঠেছিল তা যে-কোনো বাঙালি সংগীতরসিকের একটা না-একটা সময় জানতে ইচ্ছে যায়।

সে শুরু লখনউয়ের শেষ নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আখড়া গাড়ার থেকেই। যুক্তি স্মৃতি স্নেহ দিয়ে গড়ে তোলা মেটিয়াবুরুজের সেই মেহফিল বেশ সুন্দর মানিয়ে গিয়েছিল কলকাতার পাঁচমিশেলি গানের পরিবেশের সঙ্গে। তবে ঠুংরির আঞ্চলিক বিশেষত্বগুলির যোগসাজশ ঘটল আর কিছুদিন পর। ধূর্জটিপ্রসাদের কথায় বলতে গেলে সেটার সূচনা অজ্ঞাতকুলশীল মৈজুদ্দিন সাহেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কেউ জানেনি মৈজুদ্দিন 'কাঁহাকে লোগ', 'কিস ঘরানেকা'।

শোনামাত্রই বোঝা গেছল ঠুংরির ভবিষ্যৎ কতখানি।

ঠিক সেই সময় কলকাতায় আর ছিলেন ভাইয়া সাহেব গণপত রাও। শোনা যায় গহরজান, মালকাজান, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, রাজাবাবুরও চোখের জল ফেলাতেন মৈজুদ্দিন। ভাইয়া সাহেবও অজান্তে একদিন এই 'অজনবি'র গুণগ্রাহী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু এই সমস্তই ইতিহাস। কলকাতার এবং ঠুংরি গানের। শব্দ-ধ্বনির এই ঢঙের বাঁধুনির সঙ্গে বাঙালি মনের পরিচয় ঠিক আজকের দিনে জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য বিষয় আর নেই। বাঙালির জেগে থাকা, স্বপ্ন দেখা, গভীর ঘুমের স্বাদ নেওয়া, ভালোবাসা, অনুকম্পা-অনুনয়ের আড়ালে চলে যাওয়ার মধ্যেও বুঝি শেকড় গজিয়েছে ঠুংরির। বারবার এই কথাই মনে হল সেদিন বেতারের একটা ছোট্ট অস্বাভাবিক ঘোষণা শুনে, বেগম আখতার কাল পরলোকগমন করেছেন।

রাইবাবু (রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়) বলেন, '৩৫-'৩৬ সালের এক ঘরোয়া মেহফিলে প্রথম যেদিন বেগমকে শুনলাম সত্যিই বর্তে গেলাম। ভাষার ঝোঁক ধরার কী পরিশীলন! ধ্বনিময়তার সঙ্গে এ কী শব্দ ব্যঞ্জনা!

কিন্তু মনে রাখতে হয় সেটা '৩৫-'৩৬ সন। বেগম তখনও বাঙালির কাছে জনৈকা সুরেলা গায়িকামাত্র।

ঠুংরিটা ভালো বোঝে। বোল বানালে মন গলে যায়।

আমার প্রথম দেখা বেগম একটু অন্যরকম। গলায় প্রচণ্ড গাম্ভীর্য, মীড় মুড়কি-কান-ঝটকা-পুকারে অসামান্য রেশ, শব্দের ওপর এক ধরনের দক্ষ গৃহিণীপনা। সাবেকবাড়ির বড়ো বউ যেমন চাবির গোছাটা নিয়ে চাপা আহ্লাদে থাকতেন, কারণ ঘরের সব দরজা, দেরাজ, আলমারি তার চাবির ডগায়, সেরকম এক দাপটের সঙ্গে একের পর এক আসর মাতাচ্ছিলেন বেগম কলকাতায়। সব মনই খোলে তাঁর সামান্য একটু সুরের কী শব্দের মোচড়ে। বেগমের গান থাকলেই বাড়ির ভাত জুড়োত নিয়মমাফিক।

অথচ একদিন কীরকম এক ভাবনায় পড়লাম বেগমেরই এক আসরে বসে। গজল-দাদরা-কাজরি-চৈতি-ঠুংরি যে গায় সে তো মাতাবেই! মিশ্র ঠাটের রাগ মিলিয়ে, মন ভোলানো কথা সাজিয়ে কে কবে না ভোলালে? তাহলে বেগম কি সেই '৩৫-'৩৬-এর সুরেলা গায়িকামাত্রই?

উত্তর পেয়েছিলাম আরও বছর তিনেক পরে। কলাসংগমের এক আসরে শিল্পী ছিলেন দুজন—বেগম আর আমীর খাঁ। ভেবেছিলাম সুরোন্মাদনা আর ধ্যানের সহাবস্থান দেখব। আত্মহারা হবার পর আত্মোপলব্ধি ঘটবে।

ভুল ভাঙল সেদিনই। ধ্যানের পূর্বে ধ্যানই দেখলাম। প্রচলিত ঠুংরি গানের চলন্তিকার বাইরের স্পর্শ বেগমের গানে। বিলম্বিত খেয়াল সেখানে তার গভীর স্বাক্ষর রাখছে। গজল-দাদরাও যেন বাঁক নিচ্ছে চেনা রাস্তার বহু দূরেই। মন খতিয়ে বেগমকে চিনতে গিয়ে নিজেকে আরও চেনা হয়ে গেল। আসলে আমরা শুনতে পাই ততটাই, শুনতে চাই যতটা। আমার আগের ক-বছরের বেগমকে শোনার মধ্যে যেটুকু প্রাপ্তি ছিল তা বেগমেরই অহৈতুকী কৃপা। বাড়তি পাওয়া পেলাম যেদিন সত্যিকারের অভাব বোধ করলাম। অবশ্য তার পরেও কথা থাকে।

হালে শোনা বেগমের গানের সার্বিক উত্তরণে কিন্তু শেষ অবধি সবচেয়ে বেশি অবদান বেগমেরই। শের নির্বাচন, তার ব্যাখ্যা, তাতে সুরের প্রয়োগ, তার প্রচলিত কাঠামোর হেরফের, চটুল অনুভূতির পরিবর্তে গভীর উপলব্ধির অনুসন্ধান, আরও বেশ-কিছু যত্ন শেষদিকের আখতারি বাইয়ের গানের মেজাজ বদলে দিয়েছিল। শিল্পবদ্ধ গানের জগতে এই ধরনের স্বৈরতন্ত্রই নতুন

যুগের আভাস আনে। রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, প্রেম, ভালোবাসা, সমাজব্যবস্থা, চিত্রকলা, এমনকি সঙ্গীতেও (ধরুন না গোটা রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই) এই বিপ্লব বাঙালির সর্বকালের ধ্যানের ধন। সম্ভবত ভুল হবে না যদি বলি জীবনের শেষ তিনটে বছর দিয়েই বেগম বাঙালিকে একেবারে নিজের করে নিয়েছিলেন। উপরন্তু এই ক-টা দিন আখতারিবাই বাংলা বাণীতেও গান বেঁধে গেলেন। খুব সমীচীনভাবেই তুলনাটা এসে যায় প্রবাসী নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের সঙ্গে। কলকাতাকে, বাঙালিকে বড়ো ভালোবেসে ফেলছিলেন নবাব সাহেব তাঁর শেষ জীবনে।

বেগমের ইদানীংকালের গভীরগত অনুভূতির কাজে একটা দার্শনিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই কিংবদন্তিপ্রায় নিখুঁত ঠুংরি 'কোয়েলিয়া মৎ করে পুকার'কে ঢেলে নতুন করে সাজানোর মধ্যে যে লক্ষ্মীছাড়া আবেগের খোঁজ পাওয়া যায়, তারই পাশাপাশি শিল্পীর গজলগানের কথায় নাড়াচাড়াগুলোও বিস্ময়কর ঠেকে। মীর্জা গালিব, জিগর মুরাদাবাদী কী কায়ফি আজমি যাঁরই কথা হোক বেগম তাতে নিজস্ব ভাবের এক বিষণ্ণতা অর্পণ করতেন। সেটা সুরে এবং কথা ভাঙার চলনে ধরা দিত। দেশ, বাগেশ্রী, মল্লার কী বেহাগ দিয়ে গড়তেন গজলের ভাবমূর্তি। রাগের প্রসারও দেখাতেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবিষ্কারের মধ্যে।

এই সঙ্গে আরও একটু চিকণতার কাজ ছিল বেগমের দেশওয়ালি গানের পরিবেষণে। যেখানে লোকসংগীতের লাবণ্যের পাশে বেগম বসালেন শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য। 'ও বেদরদি সপনেমে আ যানা' শুনলেই যে-কথাটা মনে পড়ে।

বেগম করেছিলেন আরও একটু কাজ। অত্যন্ত তিক্ত-বিষণ্ণ অভিজ্ঞতাকে বাঁধতে চেয়েছিলেন মনোরম সুরে, যাতে জীবনের ওই সম্পদটুকুও ক্রমে সহজ স্মৃতি হয়ে ওঠে। বাঁধলেন জিগর মুরাদাবাদীর কথা—

জহিদকো ছোড়া না তো মৈখানেমে মগর কিয়া কম হ্যায় যো শিকোওয়ারে ডরোমে নেহি—বাঁধলেন মধুর সুরের নান্দ রাগে।

জীবনের শেষ রেডিয়ো রেকর্ডিং অবশ্য করলেন এক অদ্ভুত সুরে যার ব্যাকরণগত পরিচয় মূল্যহীন। কথা ছিল বন্ধু কায়ফি আজমির, যা কবি প্রথমেই পড়ে শোনালেন। আধুনিক কবিতার লাবণ্য এবং দুর্বোধ্যতা এবং হতাশার ছোপ তাতে। ভাবের দিক থেকে তা কেবল না-পাওয়ার থেকে না পাওয়ার থেকে না পাওয়া... আকাশ জমি থেকে তা একসময় ঈশ্বরে পৌঁছোল এবং তারপর?

ম্যয় ঢুডতা হুঁ যিসে
ও জহাঁ নেহি মিলতা

নঈ জমিন, নঈ আসমান নেহি মিলতা
নঈ জমিন, নঈ আসমান মিল যায়ে
তো এক খুদা নেহি মিলতা
তো ইতনা মৌসমকা...

পরিষ্কার করে কথাগুলো মনে করা কষ্টকর। সবটাই ছেয়ে আছে বেগমের সেই চেনা-অচেনা সুরে।

দেবব্রত বিশ্বাস

একেক সময় বিস্ময় লাগে দেবব্রত বিশ্বাস কী করে তৈরি হয়েছিলেন ভেবে। গানের মাস্টার বলে কেউ ছিলেন না, পনেরো ঘণ্টা রেওয়াজ করে বানানো গলা তাঁর নয়। দু-বেলা ধূপ-ধুনো দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পুজো করার লোকও তিনি ছিলেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে খুব সহজে, প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর বাড়ির লোক বানিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ১৭৪ই রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ওই একটেরে ঘরটায় যতটা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেত ততটা আর কোথাও নয়। আমার নিজের ধারণা জর্জদার সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথ' আলোচনা করার সব চেয়ে বড়ো তৃপ্তি ছিল এই, যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটা জ্যান্ত, রক্ত-মাংসের সত্য বলে দেখতেন। রবীন্দ্রনাথকে একটা প্রতিষ্ঠান, কিংবা হিন্দুধর্মের একাদশ অবতার, বা একটা প্রত্নতত্ত্বের বিষয় বানানোর ব্যাপারে ছিল তাঁর ঘোর আপত্তি। এ ব্যাপারে বিচক্ষণ ইংরেজদের সঙ্গে মনের মিল পাওয়া যায় জর্জদার। ওঁরা যেভাবে ভালোবাসা এবং সমালোচনা মিশিয়ে শেকসপিয়র কিংবা মিলটনকে বহতা রেখেছেন নিজেদের সমাজ এবং চেতনায় প্রায় সেরকম এক সম্পর্ক ছিল জর্জদার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এই অবাঙালি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছে জীবনভর।

জর্জদার রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা বন্ধ হয়ে যায় ১৯৭১ সালে। তাতে কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। উপরন্তু তাঁর সেই আগের রেকর্ডগুলোই হু-হু করে বিকোতে থাকে বাজারে। এটা কেন? বলা যেতে পারে তাঁর মতন দরদ আর কারও গানে পাওয়া যেত না তাই। তাঁর ওই রোমান্টিক গলা, ওই বেস আওয়াজ, ওই উদাস করে দেওয়ার মতন সুরের রেশ—এ সবই সত্যি। তবে এর চেয়েও বড়ো সত্য হয়তো এই যে, জর্জদা রবীন্দ্রসংগীতে একটা খোলামেলা, প্রাণের হাওয়া এনেছিলেন। কিন্তু সেটা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। আমি স্বরলিপি ভাঙার কথা একবারও বলছি না। আমি একটা নতুন গায়নভঙ্গির কথাও বলছি না। আমি বলছি একটা নতুন স্পন্দনের কথা, একটা জ্যান্ত সুরের প্রবাহের কথা। গানেরও একটা রক্ত-মাংসের

চেহারা আছে, নিছক স্বরলিপি সাধনায় যা মূর্ত হতে পারে না। রবীন্দ্রসংগীতের যে-একটা স্বাধীনতার দিক আছে, একটা বিপ্লবের দিক আছে সেটা ধরা পড়ে জর্জদার গানে। পাশ্চাত্যের ক্ল্যাসিকাল সংগীতে এর দুটো উপমা আছে—হাইফেৎজের বেহালা এবং আঁদ্রে সেগোভিয়ার স্প্যানিশ গিটার।

নোটেশান করা ধ্রুপদী সংগীতই বাজাতেন হাইফেৎজ। কখনও মোৎজার্ট, কখনও ভিভালদি কখনও শপ্যাঁ। কিন্তু যাই বাজান না কেন তিনি বেহালায় একটা জিপসি টাচ ছুঁইয়ে দিতেন। ধ্রুপদী সংগীত শুদ্ধ ধ্রুপদীই থাকত, কিন্তু তার মধ্যেই বহে যেত একটা প্রাণের হাওয়া। এই জাদু ছড়িয়ে আছে আঁদ্রে সেগোভিয়ার স্প্যানিশ গিটারে। ওঁর হাতে বাখ-এর শাকন কিংবা ভারী অঙ্গেরও কোনো বাজনাতে একটা দোলা আছে। আর তাই শুনেই মানুষ পাগল। একটা বিশেষ ধরনের জিনিয়াসের সঙ্গেই একটা বিশেষ ধরনের স্বাধীনতা কাজ করে। জিনিয়াসের যেটা প্রাপ্য। বেহালার ইতিহাসে নিছক তন্ত্রবাদীর দিকটা দেখলেও একমাত্র ক্রাইস্লার ছাড়া হাইফেৎজের তুলনা আর কেউ নন। সেগোভিয়া তো ওঁর যন্ত্রে অনন্য। রবীন্দ্রসংগীতেও এরকম একটা আত্মার ঝংকার শুনিয়ে গেছেন দেবব্রত এবং এ হচ্ছে সেই রবীন্দ্রসংগীত যা রবিশঙ্কর, ঋত্বিক ঘটক, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সাধারণতম বাঙালিকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। এক অর্থে এ হল রবীন্দ্রসংগীতের মুক্তি।

১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে একটা ইংরেজি পত্রিকার জন্য নেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে দেবব্রত আমাকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান গাইবার সময় তাঁর মনের মধ্যে কোনো বিশ্বকর্তার ছবি ফুটে ওঠে না। গান গাইবার সময় তাঁর সমস্ত মনটাই থাকে গানের সুরগুলোর প্রতি। গানকে তিনি দেখেছিলেন একটা 'কাজ' হিসেবে, তা যত ভালোভাবে সারা যায় ততই ভালো। দেবব্রতর এই দর্শনের সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁর গান শুনে একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রবেশ করা যায়। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা দেবব্রতর গানে ঈশ্বরের ছোঁয়া পেতেন, ঋতুবৈচিত্র্য অনুভব করতেন, চোখের জল ফেলতেন কিংবা প্রাণের আনন্দে নিজেরাও গেয়ে উঠতেন। পরোক্ষে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথকে এত এত মানুষের চেতনার এত গভীরে আনার জন্য দেবব্রতর যে-অবদান তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন অদূর ভবিষ্যতে হবে। সেসময় দেবব্রতর গানের বিপ্লবী চরিত্রটুকুর মাহাত্ম্য বুঝতে পারবেন মানুষ, এই আমার বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে দেবব্রত বিশ্বাসের বয়স হয়েছিল ৬৮। জীবনের সাঁইত্রিশটা বছর তিনি জীবনবিমা অপিসের কেরানি ছিলেন। অহেতুক উচ্চাকাঙ্ক্ষায়

তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না, তা সে চাকুরি-জীবনেই হোক, কিংবা শিল্পী-জীবনে। অকৃতদার দেবব্রতর আসল খুঁটি ছিল জনগণ, এবং তাদের ভালোবাসা। নিত্যদিন ভক্তদের অসংখ্য চিঠি পেতেন তিনি, এবং তৎক্ষণাৎ সেসবের উত্তর লিখে ফেলতেন দুই কপি। এক কপি পোস্ট করে কার্বন কপিটি ফাইলস্থ করতেন। এরকম অনেক চিঠি দিনের পর দিন তিনি পড়ে শুনিয়েছেন আমাকে। পারতপক্ষে যে-লোকই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁরই কাজ হত দেবব্রতর পত্র বিনিময় শোনা। বহু চিঠিতেই পড়েছি অসংখ্য মহিলারা (বয়সের কোনো বাছবিচার নেই) তাঁকে ভালোবাসা হয়তো বা প্রেমই জানাচ্ছেন।। কিন্তু নিজের ভাষাতেই দেবব্রত ছিলেন প্লেটোনিক লাভার, তিনি মনের ভালোবাসা চাইতেন, দেহের নয়। দেবব্রত কিন্তু চিঠির উত্তর জানাতেন রঙ্গরস করে, মেয়েদের সঙ্গে যেটা সব চেয়ে বেশি কার্যকর। আর ভালোবাসা, প্রেম? সেটা তাঁর গান। আমার এক ফরাসি বন্ধু, যিনি হালে কলকাতায় ছিলেন, বললেন, তোমাদের এই মানুষটির গলায় যে-মাদকতা, যে-ইনটিমেসি তার সঙ্গে তুলনা চলে ফরাসি গায়ক জাঁক ব্রেলের। জাঁক ব্রেল ছিলেন ফরাসি গানের জগতের উত্তমকুমার। অল্প বয়সে, খ্যাতির শিখরে আত্মহত্যা করেছিলেন। জানি না আমার বন্ধুর তুলনাটা কতখানি ঠিক; ওঁর অনুভবটাই আসল।

দেবব্রতর জন্ম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে। যে-শহরের বর্ণনা অক্ষয় হয়ে আছে কিশোরগঞ্জের অপর কৃতী পুরুষ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান' বইতে। দেবব্রতর পিতা ছিলেন দেবেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস। দেবব্রতর পিতামহ কালীকিশোর অল্প বয়সে দীক্ষিত হন ব্রাহ্মধর্মে। হয়তো বা এই কারণেই ছেলেবেলায় হিন্দুপ্রধান কিশোরগঞ্জে দেবব্রত অন্য ছেলেদের কাছে ম্লেচ্ছ ছিলেন। সেসময় তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ ছিল কিছু মুসলমান রাখাল বালক এবং কিছু খ্রিস্টান পরিবারের সন্তান-সন্ততি। এতে অবশ্য দেবব্রতর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ কোনোদিন ছিল না, কারণ তাঁর পরম সৌভাগ্য ছিল তাঁর দুই বোনের সঙ্গে মায়ের কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত শোনার। কখনো-কখনো ওই মাতৃকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে পাঠ। বাল্যের সেই রবীন্দ্রানুরাগ চরিতার্থ হয় ১৯২৯ সালের ৬ ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে দেখার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর দুর্বল কণ্ঠে গেয়েছিলেন একটি ব্রহ্মসংগীত। এর কিছুকাল পরে, বিদ্যাসাগর কলেজে বিএ পড়ার সময় দেবব্রতর আলাপ হয় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত এবং শৈলেশ দত্তগুপ্তের সঙ্গে। তখন

রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি তিনি গাইতেন সুরসাগরের সুরের গান, কিংবা শচীনদেব বর্মন ও কে এল সায়গলের গান।

কালক্রমে দেবব্রত শরিক হয়েছিলেন ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের। গণনাট্য সংঘের সঙ্গে ছিল তাঁর বহুদিনের যোগ। তাঁর বন্ধু হয়েছিলেন গণনাট্য সংঘের বড়ো বড়ো শিল্পীরা এবং সবাই একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন মানুষ এবং শিল্পী দেবব্রতর মহিমায়। তাঁর গান শুনে তাঁর ভক্ত হলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। ঋত্বিক ঘটক পরবর্তীকালে তাঁর গান প্রয়োগ করলেন তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'কোমল গান্ধার' ছবিতে। গণনাট্য সংঘের 'ছেঁড়াতার' নাটকে শম্ভু মিত্রের অভিনয় দেখা এবং দেবব্রতর গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল সেদিনের বাঙালি দর্শককুলের। দেবব্রত পরে রহস্য করে তাঁর এই বামপন্থী জীবনযাত্রাকে বলেছিলেন, 'বাঁয়ের রাস্তার কীর্তিকলাপ।' এ ছাড়া দেবব্রত ওই চঞ্চল আবেগপ্রবণ আদর্শবাদী দিনগুলিকে তাঁর চিরকুমার জীবনের 'মধুচন্দ্রিমা' বলেও অভিহিত করতেন।

পঞ্চাশের দশক থেকেই বলতে গেলে দেবব্রতকে নিয়ে একটা 'কাল্ট' শুরু হয় এ দেশে। দেশের মানুষকে বুঁদ করে রাখতেন দেবব্রত একটার পর একটা গানে। এত দরদ এবং এত শক্তি পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতের আর কোনো শিল্পীর মধ্যে পাওয়া যায়নি কোনোদিন। একজন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীকে নিয়েও যে-একটা ঝড় উঠতে পারে গানের জগতে সেটা প্রথম ওঁকে নিয়েই হল এবং কালক্রমে সেই ঝড় একটু অন্য ঢঙে বইল একটা অন্যতর অঙ্গনে। পণ্ডিতেরা তর্ক তুললেন, দেবব্রত স্বেচ্ছাচার করেন রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে। ওঁর গান বন্ধ হোক। সংবাদপত্রে তুমুল বিতর্ক চলেছিল ১৯৭৫ সালে। তার আগে ১৯৭১ থেকেই তাঁর রবীন্দ্রসংগীত রেকর্ড করা বন্ধ হয়েছিল। সংবাদপত্রের সেই বিতর্কেই আমরা টের পেলাম আপামর জনতা কার পক্ষে। কিন্তু তাতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কিছু এসে গেল না। দেবব্রতর গান বন্ধই রইল।

তাঁর এই বিপুল অভিমান নিয়েই ১৯৭৮ সালে দেবব্রত লিখলেন তাঁর আত্মজীবনী 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। রাগ করে ফাংশনে গান গাওয়াও বন্ধ করলেন শিল্পী এক সময়। রাগের বশেই গাইতে লাগলেন আধুনিক বাংলা গান। রেডিয়োতে নিবেদন করলেন এক লোকসংগীত 'আমার লগে জারি হইল নয়া ফরমান, আমি আর গাইবার পারলাম না'। তুলনাটা স্বভাবতই এসে যায় আরেক সমাজবাদী, জনগণের শিল্পী পল রোবসনের সঙ্গে। রোবসনের মতনই দেবব্রত ছিলেন জীবনের শেষ দিন অবধি আপসহীন, উন্নতশির, অপরাজিত।

দেবব্রতর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গানের সমাজে একটা পুরোনো প্রশ্ন নতুন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। যখন বিশ্বভারতীর কপিরাইট চলে যাবে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কীর্তির থেকে সেদিন কে খবরদারি করবে শিল্পীমহলের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে? এমনিতেই যে-নিকৃষ্ট রবীন্দ্রসংগীত আমরা শুনছি ইদানীং তার চেয়েও কি দেবব্রতর গান বেশি ক্ষতিকারক? আমার ব্যক্তিগত ধারণা একজন মহৎ শিল্পী তাঁর সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও কোনো সংগীতধারার যে-সেবা করেন সেই সেবা, সেই যত্ন একটা নিষ্ঠাবান অথচ নিকৃষ্ট গায়কের দ্বারা সম্ভব নয়। শুদ্ধ ঢঙে গাওয়া এবং সুন্দর প্রাণস্পর্শী করে গাওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। আইন মেনে গানের পরীক্ষায় পাশ করা যায়, একটা দেবব্রত কি শান্তিদেব ঘোষ হওয়া যায় না। এই দুজনেই যে দুই ধরনের জিনিয়াস সেটা প্রাণের এবং গানের অন্তঃস্তল থেকে উঠে আসে। শুদ্ধ ঢং এবং গানের প্রাণ পাই শান্তিদেব, দেবব্রতর মধ্যে। রবীন্দ্রসংগীতের বিপুল ব্যাপ্তির দুটি উজ্জ্বল উদাহরণ এঁরা।

জীবনে তিনশো রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন দেবব্রত। রবীন্দ্রনাথের পূজার এবং বর্ষার কিছু গানকে তিনি অমর করে গেছেন। তাঁর গাওয়া প্রেমের কিছু গানও আমাদের নিভৃত, নিজস্ব সময়ের সঙ্গী-সাথী হয়ে থাকবে। তিনি কাঁদিয়েও গেছেন আমাদের অজস্র গানে। তাঁর গানের উদাহরণ কেবল তাঁরই গাওয়া গান। এমনই আত্মস্থ, আত্মসাৎ করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী', 'আকাশ ভরা সূর্য তারা', 'আজি যত তারা তব আকাশে', 'পুরানো সেই দিনের কথা', ' মেঘ বলেছে যাব যাব', 'প্রভু আমার প্রিয় আমার', 'সীমার মাঝে অসীম তুমি', 'বাদল ধারা হল সারা', 'তোমার হল শুরু, আমার হল সারা', 'কে দিল আবার আঘাত', 'কবে তুমি আসবে বলে', 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে', 'হে সখা মম হৃদয়ে রহ', 'বাণিজ্যেতে যাবই আমি যাব', 'তুমি রবে নীরবে'—এইসব গান যতখানি রবীন্দ্রনাথের ঠিক ততখানিই দেবব্রতর। যেভাবে রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং মোৎজার্টের সুর কিংবা রবার্ট বার্নসের গানের স্কটিশ হাইল্যান্ড সুরকে আত্মস্থ করে ষোলো আনা নিজের করে নিয়েছিলেন। অন্ধ অনুকরণকারীরাই পরের সুর পরের মতন কিংবা পরের গান পরের মতন রচনা করেন কিংবা গেয়ে থাকেন। জাত শিল্পীরা সেই সুর সেই গান নিজের করে নেন। রবীন্দ্রনাথের গান যদি বিংশ শতাব্দীর পরেও আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে তাহলে সেইসব শিল্পীর দরুনই থাকবে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া স্বাধীনতাকে তাঁদের গানে কাজে লাগাবেন এবং নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দেবেন ওই গানের। বেসুরো গলায় স্বরলিপি এবং নিয়মচর্চার সঙ্গে পরের বাড়ির বাসন মাজার কোনো তফাত নেই। দেবব্রত আজ আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন করে গেলেন।

আজকের গানের জগৎটা যেন চ্যাপলিনের দৃশ্য

—আরতি মুখোপাধ্যায়

শঙ্করলাল : অনেকের মধ্যে এরকম একটা ধারণা আছে যে-আধুনিক গান গাওয়াটা কোনো বড়ো ব্যাপার না, ওটা বাথরুমে গাইতে পারলেই স্টেজে বসে গাওয়া যায়, রেকর্ডও করা যায়। ক্ল্যাসিকালে যেমন তালিম, চর্চার ব্যাপার আছে, আধুনিকে সে ধার না ধারলেও চলে। কেউ যদি একটা lilting tune করে দিতে পারে যার মোটামুটি একটা আকর্ষণ আছে তাহলেই হয়। কিন্তু ঘটনা তা তো নয়। আপনার কী মনে হয়?

আরতি : আপনি ঠিকই বলেছেন। অনেকদিন ধরে আমার মনেও এরকম একটা প্রশ্ন জেগেছে। আজকের আলোচনায় এটা তুলে ভালোই করেছেন। বাথরুমে গাইতে পারলেই যে স্টেজে বা রেকর্ডে গাওয়া যাবে এরকম ধারণার কোনো যুক্তি তো নেই-ই, অনেকের বোধহয় যথেষ্ট ধারণাও নেই যে-আধুনিক গানও শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার। যেমন কাব্য ও সুর এক সঙ্গে কী করে মেলাতে হবে, সেটা গুরুর কাছে তালিমের অত্যন্ত প্রয়োজন। কোন কথাতে স্ট্রেস দিলে সুরটা কীভাবে আসবে। তালিমের পর সাধনা, অর্থাৎ রেওয়াজ। এটা সম্পূর্ণ গুরুমুখী বিদ্যা।

শঙ্করলাল : কিন্তু আপনার তালিম তো ছিল ক্ল্যাসিকালের।

আরতি : হ্যাঁ, ক্ল্যাসিকালের। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাইট মিউজিকও শিখেছি। আমাকে ছেলেবেলার থেকে আধুনিক বাংলা গান, রাগপ্রধান শিখিয়েছেন সুশীল ব্যানার্জি, আর ঠুংরি শিখেছি সাগিরুদ্দিন খাঁর কাছে। ঠুংরি শিখেছি, খেয়ালও শিখেছি। আরেকটা কথা আপনাকে বলে দিচ্ছি—সাধারণ লোকের ধারণা যে, কেউ খেয়াল গাইতে পারলেই ঠুংরি গাইতে পারবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। যার জন্য আজকে, আমার ধারণা, ভালো ঠুংরি গায়ক নেই। যাঁরা গাইছেন তাঁরা গাইছেন ঠিকই, কারণ অভাব থাকলে যে-ই হাতের কাছে আসেন তাঁকেই আমরা শুনি বা দেখি, কিন্তু সত্যিকারের ভালো ঠুংরি গাইযে যেমন বেগম আখতার ছিলেন, সেই স্ট্যান্ডার্ডের কোনো গাইয়ে কি আশপাশে

কোথাও আছে? বড়ে গোলাম আলির খেয়াল আমরা শুনেছি, কিন্তু ওঁর ঠুংরি ততোধিক ভালো ছিল কারণ উনি সেটার চর্চা করতেন। ওঁর ভাই বরকত আলি খাঁ সাহেব গাইতেন, আজীবন শুধু ঠুংরিই গেয়ে গেছেন। আর ওনার ঠুংরি শুনলে কেউ আর চিন্তাই করবেন না যে আমি খেয়াল শুনব। কারণ ঠুংরিতে উনি এমনভাবে সুর এবং কথাকে মিলিয়েছেন, এমনভাবে লয়ের কাজ করে গেছেন যে কারও মনেই হবে না যে তিনি কোনো শক্ত গান শুনছেন। খুব শক্ত জিনিসকেও উনি সাধনার দ্বারা অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল ভাবে লোকের কাছে পরিবেশন করে গেছেন। এটা হচ্ছে রেওয়াজ এবং তালিমের জিনিস। এটা রেকর্ড শুনে—আজকাল যেটা হয়েছে, আমি কারও নাম করতে চাই না—হয় না। কলকাতা এবং বম্বেতে দু-জায়গাতেই এটা হয়েছে। সমস্ত রেকর্ড শুনে গান শিখে সেই গান দিয়ে তাঁরা রাতারাতি নাম করতে চাইছেন। করতে চাইছেন বললে ভুল হবে কারণ তাঁরা নাম করেওছেন। লোকে তাঁদের গ্রহণ করেও নিয়েছেন। কাউকে কাউকে জোর করে অ্যাকসেপ্ট করানোও হয়েছে। কীভাবে হয়েছে তা আমি জানি না বা বলবও না।

শঙ্করলাল : সাগিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে তালিমটা কীসের ছিল?

আরতি : খেয়াল, তারপর ঠুংরি। এমনকি আমি গজলও শিখেছি ওঁর কাছে। গজলের একটা তালিম আছে। গজলকে উর্দুতে বলে 'গজল পড়ি যাতি হ্যায়'। গজল কখনও গায় না। গজলে অযথা মুড়কি বা তান করলেই গজল বিকৃত হয়। ঠিক যেমন আধুনিক বাংলা গান। আজও আমরা হেমন্তদার গান কেন মনে রেখেছি? কাব্যকে এমন সুন্দর করে আমাদের কানে তিনি এনে দিয়েছেন, একটা নিটোল ছবির মতো তাঁর গানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই জন্যই নয় কি? 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'—আমার তো মনে হয় না এরকম করে আজ পর্যন্ত কেউ কবিতার ডেমোনস্ট্রেশন দিতে পেরেছেন বলে। কিংবা আপনি মেহেদি হাসানের কথা চিন্তা করুন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনার সঙ্গে ভীষণ পরিচিত। অদ্ভুত বন্ধুত্ব ওঁর সঙ্গে। আমি ওঁর সামনে বসে দিনের পর দিন গান শুনেছি। সত্যি বলছি, ওঁর গান শুনলে মনে হবে আপনি একটা ছবি দেখছেন। কখনও মনে হয় না উনি এই তানটা কেন করলেন? বা এই হরকতটা কেন দিলেন? বা এই লয়কারিটা কেন হল? মনে হয় এটারই এখানে প্রয়োজন ছিল। এত সহজভাবে গানের কাজগুলো আপনার সামনে পেশ করেছেন যে কোথাও কোনো ধাক্কা লাগেনি, ঝাঁকুনি বোধ করেননি। অথচ অনেক সময়ই অনেকের গান শুনেই মনে হবে যে এটা যেন জোর করে শক্ত করা হল?



শঙ্করলাল : গজলে আবার আসব পরে। তার আগে বাংলা আধুনিক নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি।

আরতি : বলুন।

শঙ্করলাল : আপনি যখন গান শিখছেন সেটা কোন সাল? আধুনিক গানের কোন সময়?

আরতি : আমি বলছি আপনাকে। আমি গান শিখেছি খুব ছোটোবেলার থেকে। আমি ঘরে এরকমই গাইতাম। আমাদের ঘরে গানবাজনা আছে। আমার কাকা খুব ভালো সেতার বাজাতেন। মা গান করতেন, বাবা গান করতেন। তবে ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছি, তাই মা-ই আমাকে সবরকমভাবে ইন্সপায়ার করে গেছেন বরাবর। আমি একটা স্কুলেও গান শিখতাম। বাসন্তী বিদ্যাবীথি বলে সেসময়ে দমদমে একটা নামকরা ইস্কুল ছিল। তো সেখানে প্রথম বছর ভর্তি হতেই টিচাররা আমাকে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন, তখন স্কুলের যে-কমপিটিশন হয় তাতে নাম দিলাম। তাতে খেয়াল থেকে আরম্ভ করে পল্লিগীতি অবধি সব বিষয়ে ফার্স্ট হয়েছি। তারপর সুশীল ব্যানার্জি—আজ উনি গত হয়েছেন—ওঁর সংস্পর্শে আসি। উনি কমপিটিশনে শুনতে এসেছিলেন। আমার গান শুনে বললেন, আমি তোমাকে শেখাব। তার আগেই পাড়াতে জানতে পেরেছিলাম যে উনি খুব ভালো শিক্ষক। তারপর একদিন উনি আমাদের বাড়িতে এলেন আর আমার শেখা শুরু হল। কিন্তু এইসব কিছুর মূলেই আমার মা। মা চিরকাল শুধু এটাই চেয়েছিলেন যে, আমার মেয়ে ভালো করে গান শিখুক। এটা যে পরের দিকে পেশা বা প্রফেশন হয়ে যাবে তা আমি নিজেও কখনও ভাবিনি। পুরোটা আমার নিজের অজান্তেই গেছে।

তারপর ১৯৫৮ সালে...দাঁড়ান, বলছি আপনাকে। ওই ৫৬-৫৭ সালেই আমি গান শিখতে আরম্ভ করেছি। এই সময়েই মারফি সিংগিং কনটেস্ট বলে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে চেষ্টা ছিল নতুন প্লে-ব্যাক শিল্পী আবিষ্কার করা। আমি সারা ভারতে প্রথম হয়েছিলাম। আমার বাড়ির থেকেই নাম দেওয়া হল আর মাস্টারমশাই খুব অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

শঙ্করলাল : আমি যেটা বলতে চাইছিলাম তা হল যে আপনি যখন গান শিখছেন সেটা হল হেমন্ত, ধনঞ্জয়, সন্ধ্যার যুগ...।

আরতি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

শঙ্করলাল : তারপর মানবেন্দ্র, শ্যামল, সতীনাথও পিক ফর্মে। মানববাবুর 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'র মতো গান সৃষ্টি হচ্ছে।

আরতি : হ্যাঁ। ওনারাও তখন ভালো গাইছেন। তখন আমাদের ছেলেবেলায় এসব গান আমরা অনুরোধের আসরে শুনতাম একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। পাশাপাশি আমরা শুনতাম, আপনাকে বলছি, আমরা শুনতাম ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো লোকের গান। বা আব্দুল করিম খাঁ-র মতো লোকের রেকর্ড বা বড়ে গোলাম আলি খাঁ-কে। বাড়িতে বসে শুনেছি, রেকর্ড বাজিয়ে, তা ছাড়া অধীর আগ্রহে রেডিয়ো খুলে বসে থাকতাম কখন ওঁর তিন মিনিটের একটা রেকর্ড বাজবে।

শঙ্করলাল : তখনও তো বাড়িতে রেকর্ড বাজানোর থেকে রেডিয়ো শোনার রেওয়াজটাই বেশি ছিল।

আরতি : ঠিক। তখনও রেডিয়োই প্রধান সম্বল ছিল। আরেকটা কথা, সেসময় রেডিয়ো সংগীত সম্মেলন হত আর বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি সেই ছেলেবেলা থেকেই কখনও যদি সেই সম্মেলনের ব্রডকাস্ট শুনতে ভুলে গেছি বা পড়তে বসে খেয়াল রাখিনি তো বাবা ঠিকই এসে আমার ডাকনাম ধরে ডেকে বলতেন, আলো, শিগগির এসো। আমীর খাঁ সাহেবের গান হচ্ছে। কী বলব আপনাকে, বাড়িতে গান তখন আমাদের শিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। গুরুর কাছে শিক্ষা করা এবং শোনা—এক সঙ্গে আমাদের চলত। এটা কিন্তু খুব দূরের কথা নয়, কিন্তু পরিস্থিতিটা কী তাড়াতাড়ি যেন একেবারে বদলে গেছে। এখন তো গান শোনাটা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। আমিও শুনতে যাই, দেখি সেজেগুজে লোকে কীরকম রবিশঙ্করের বাজনা শুনতে যায়। বা আমীর খাঁ সাহেবের গান, এখন তো উনি আর নেইও বা এরকমই কিছু লোকের গান... গুলাম আলির গজল শুনতে গেল কি মেহ্‌দি সাহেবের গান। খুব একটা ফ্যাশন এটা, তবে শুনব বলে, শুনে কিছু শিখব বলে খুব একটা লোকে যায় বলে তো মনে হয় না আমার। সন্দেহ এই কারণে হয়, কারণ যখন এই শ্রোতাদের নিজেদের গানগুলো শুনি তখন বুঝতে পারি যে কিছুই শোনেনি তাঁরা।

শঙ্করলাল : আপনার নামটাম হতে শুরু করল কবে থেকে? 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে গান করার পর থেকেই তো?

আরতি : হ্যাঁ। বস্তুত ওই ৫৮ সালের কমিপিটিশনের পর থেকেই একটু একটু নাম রটল। আর আমার তখন এত বাচ্চা বয়স যে ফিল্ম-টিল্মে গাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। বাড়ির থেকেও কেউ সেদিকে উৎসাহও দেয়নি। বাড়ির উৎসাহটা ছিল—গান শেখো। তারপর ওই 'সুবর্ণরেখা' ছবি হল বাষট্টি কী তেষট্টি সালে। আমি তখন বাহাদুর খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিতাম। উনি আমাদের বলতে পারেন পারিবারিক বন্ধু।

শঙ্করলাল : 'সুবর্ণরেখা' যখন হলে এসেছিল তখন বহু বোদ্ধা শ্রোতা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছবিটা দেখেছিল। আর ওই গানগুলো শুনেছিল। খুব আলোচনা শুনতাম সেসময়।

আরতি : হ্যাঁ। তাহলে বলি কী করে আমি এই জায়গায় এলাম। তখন তো বাহাদুরদা ন্যাচারালি পরিচিত ছিলেন না ওঁদের সঙ্গে। উনি বললেন, আমার যে-গান তা তো ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, আমি তো বুঝতে পারছি না ওঁকে আমি কীভাবে ব্যবহার করব, কারণ ওনার তো এ ধরনের গান শুনিনি। তবে আমার একটা ছাত্রী আছে, আপনি যদি ওর একটু গান শোনেন, আর শুনে বোঝেন যে ওকে দিয়ে গাওয়ানো যাবে তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারি। তো সেই সময় আমার একটা ফিল্মের গানের রেকর্ডিং ছিল, বাহাদুরদা নিজেই ঋত্বিকদাকে সঙ্গে করে স্টুডিয়োতে নিয়ে এলেন। নিয়ে এসে গান শোনালেন। ঋত্বিকদা শুনে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমার এই আওয়াজ হলেই চলবে। তারপরে সেদিনই সেখানে ঋত্বিকদার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার বেশ মনে পড়ছে দিনটা, তখন আমার বড়োজোর সতেরো বছর বয়স হবে। ছোট্ট মেয়ে আমি, আমাকে ঋত্বিকদা বললেন, তুমি আমার ছবিতে গান গাইবে। বললাম, আচ্ছা গাইব। তারপর তো দীর্ঘ দিন এক-দেড় মাস ধরে কী কী গান হবে তার রিহার্সালি চলল, আলোচনা চলল। একেবারে সব অথেনটিক গান। কলাবতী রাগে 'আজো কী আনন্দ'। পুরোনো সব বন্দিশ। লোকের তো ভীষণ ভালো লাগল গানগুলো, জানেনই। আর সেই গানের পর থেকেই ক্রমান্বয়ে ফিল্মে গান গাওয়া বাড়তে লাগল আমার।

শঙ্করলাল : কী একটা পুরস্কারও তো পেয়েছিলেন 'সুবর্ণরেখা'র গানগুলোর জন্য?

আরতি : হ্যাঁ পেয়েছি। বেঙ্গলি ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার। তারপর শ্যামল মিত্র 'দেয়া নেয়া' করলেন। তাতে আমাকে উনি নিলেন তনুজার প্লে-ব্যাক করার জন্য। সেই আমার প্রথম কমার্শিয়াল বাংলা ছবিতে গান। আর সেটা হয়ে গেল সুপারহিট ব্যাপার।

শঙ্করলাল : কোন গানটা বলুন তো?

আরতি : মাধবী মধুপে হল মিতালি।

শঙ্করলাল : হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

আরতি : সেই গান হল। আর তারপর থেকেই বাংলা গান বলুন, প্রাইভেট রেকর্ডের কথা বলছি, তা ছাড়া ওড়িয়া, অসমিয়া, নেপালি, মণিপুরি, পাঞ্জাবি গান যে-সব কলকাতায় রেকর্ডিং হত তাতে আর ফিল্মের গানে সমানে ডাক পেতে লাগলাম। আর তখন এত ব্যস্ত হয়ে গেলাম যে কী বলব।

'সুবর্ণরেখা'র গান যখন কেবলমাত্র রেকর্ড হয়েছে তখনই স্টুডিয়ো পাড়ায় সবাই জানতে পারলেন যে এই মেয়েটি খুব ভালো গেয়েছে, খুব ভালো গায়। আর 'দেয়া-নেয়া'র পর গানের বান ডেকে গেল যেন। 'সুবর্ণরেখা'র গানের এত চাহিদা হয়েছিল, লোকের মুখে মুখে আলোচনা শুনতাম অথচ ঘটনা হল গ্রামোফোন কোম্পানি আজ অবধি এর কোনো রেকর্ড বার করেনি।

শঙ্করলাল : আপনি বম্বে গেলেন কবে?

আরতি : আমি বম্বে গেলাম ১৯৭৪ সালে। 'গীত গাতা চল' ছবিতে গাইবার জন্য। তারাচাঁদ বারজাতিয়ার ছবি। উনিই 'সুবর্ণরেখা' ছবি ডিস্ট্রিবিউট করেছিলেন। আমি তখন 'হংসরাজ' ইত্যাদি জনপ্রিয় সব বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছিল আর সেসবে গাইছিলাম। কী বলব আপনাকে, আমার তখন হাতে এক ফোঁটাও সময় নেই। তখন ঠিক হল যে, আমি একটা-একটা করে 'গীত গাতা'র গান রেকর্ড করে কলকাতায় চলে আসব। আর সেভাবেই কনট্রাক্ট হল। ছবির গানও খুব চমৎকার হল। ছবির সুরকার যিনি, সেই রবীন্দ্র জৈনের সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। রবীন্দ্র জৈন তখন ছিলেন কলকাতায়। এবং ওঁকে প্রথম আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এনে বললেন, আরতি, এই ছেলেটি ভীষণ ট্যালেন্টেড। তুমি তো গান ভালোবাস, তুমি এর সঙ্গে পরিচয় করো। বাহাদুরদার বাড়িতে তো আমি এটা ওটা যা-ই মনে আসত শোনাতাম ঋত্বিকদাকে। ছেলেমানুষ বয়সে যা হয়, যে-ই শুনতে চাইত তাকেই প্রাণ ভরে গান শোনাতাম। তো ঋত্বিকদা খুব ইন্সপায়ার্ড হতেন শুনে সেসব। বলতেন, মা, এটা শোনাও ওটা শোনাও। তারপর ওইভাবে একদিন ঋত্বিকদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্র জৈন এলেন। ওঁর কাজ শুনে এত ভালো লাগল যে আমি রবিকে দমদমে আমাদের আরেকটা বাড়িতে নিয়ে আসি। বললাম, রবি, তুমি এখানে থাকো। সেসময় ও বড়োবাজারে একজনের বাড়িতে খুব কষ্টেসৃষ্টে থাকত। আমি বলার পর থেকে আমাদের বাড়িতে রোজ সকাল সাতটার মধ্যে ও চলে আসত আর সারাটা দিন ধরে গানবাজনা চলত। ও এখানেই বসে একের পর এক কম্পোজ করত, আমরা গান শিখতাম। আমি ওকে একেকটা বাংলা গানের রকম দেখিয়ে বলতাম, তুমি এটার ধাঁচে একটা হিন্দি গান কম্পোজ করো তো। এইভাবেই সেই সময় 'শ্যাম তেরে বনশি' গান ও কম্পোজ করেছিল।

শঙ্করলাল : বম্বেতে গিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা কী হল আপনার?

আরতি : আমি যখন গেলাম তখন অনেক বিশিষ্ট লোকই বলেছিলেন, তুমি এর মধ্যে যেও না। তুমি নম্র মেয়ে, তুমি হারিয়ে যাবে এই র‍্যাট-রেসে। এখানে তোমার এত নাম, তুমি এখানেই আরও বেশি কাজ করো। আমি

বলেছিলাম, আমি তো থাকতে যাচ্ছি না। আমি গান করেই চলে আসব। আমি যখন গান করতে গেলাম তখন বম্বের সব নামকরা মিউজিশিয়ান, প্রোডিউসার সকলের মুখে একই কথা শুনেছিলাম—আপকো তো ইঁহাপর হি রহনা পড়েগা। আপকো সমঝদারি হ্যায়, আপ কাবিল হ্যায়। তখন একটা করে 'গীত গাতা'র রেকর্ড করতাম, তারপর কলকাতা ফিরে একটা করে 'হংসরাজ'-এর রেকর্ড করতাম। তার বেশ কিছুদিন পর তারাচাঁদজি বললেন, আপকো ইঁহা রহনা জরুরি হ্যায়। ততদিন বম্বে গিয়ে হোটেলে হোটেলেই উঠতাম, এই সময়েই একটা ফ্ল্যাট কিনলাম। সেট্‌ল করলাম বলব না, তবে 'গীত গাতা চল' থেকে যে নতুন একটা দিক খুলে গেল আমার কেরিয়ারের তার টানেই বম্বেতে বেশি করে থাকতে লাগলাম। বহু বড়ো বড়ো লোককে সেখানে গান শুনিয়েছি, তাঁরা যা কাজ দিয়েছেন আমাকে তা আমার গানের কৃতিত্বে, মেরিটে। আর আজ সেটা কী বম্বে, কী কলকাতায় চলছে—ম্যানিপুলেশন-এ আমি কোনোদিনও পারিনি, পারব না। ও আমার লাইন নয়। যার জন্য আপনাদেরও হয়তো মনে হচ্ছে যে, যেভাবে আমার নাম হওয়া উচিত ছিল সেভাবে কেন তা হয়নি। গানের জগতে কাজ বাগাবার অনেক কায়দাকানুন আছে যা আপনাকে আমি বলতে পারব না। কিন্তু আছে। যেভাবে নাম-যশ-টাকা হয়। কিন্তু ফের বলছি ওইটা আমার লাইন নয়।

শঙ্করলাল : এটা কি ঘটনা যে, একটা সময় ছিল যখন লতা বা আশা সব প্রোডিউসারদের প্রায় তালুর নীচে কবজা করে রেখে দিতেন? নতুন কাউকে উঠতে দেবেন না এরকম সংকল্প।

আরতি : এরকম আমিও শুনেছি। কিন্তু সব ব্যাপারে যে আমি এ কথা বিশ্বাস করি তা নয়। লতাজি আমার গান শুনেছেন, তাঁর ভালো লেগেছে, সে কথা অনেককে বলেওছেন। উনি নিজে লক্ষ্মীকান্তকে বলেছেন আমাকে নেবার জন্য। মনমোহন দেশাইয়ের সেই ছবিতে শাবানা ছিল, অমিতাভ ছিল, গানটাও খুব পপুলার হয়েছিল আমার। আশাদি আর আমার ডুয়েট। তো এই আশাদিও পরে অন্যের কাছে আমার নাম প্রস্তাব করলেন। কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, কিসকি সাথ গানা? উনি বললেন, আরতিকো লে লো। আচ্ছি গাতি হ্যায়।

শঙ্করলাল : কোন ডুয়েটের কথা বলছেন?

আরতি : 'হাম তো মর যায়েঙ্গে লে লেকে তেরা নাম।' খুব হিট হয়েছিল।

শঙ্করলাল : বম্বেতে আপনার মতো গাইয়েদের স্টেটাসটা আসলে কী? এরকম ব্যাপার কি, যে লতা-আশার ডেট না-পেলে আপনাদের নেবে?

আরতি : না, এরকম অ্যাটিচুড ছিল না। আরতি মুখার্জি একজন ভালো সিংগার, ওকে দিয়ে এই গান করাব, এই ভাবটাই দেখেছি। বলতে গেলে আমাকে নিয়েও একটা ক্রেজ ছিল বম্বেতে যা আজও আছে। তবে সুরকারদের ব্যাপারটা সাধারণত কীরকম জানেন? এই এত বছর ধরে লতা-আশাকে দিয়ে গাইয়ে গাইয়ে ওঁদের ব্যাপারে একটা আত্মবিশ্বাস এসে গেছে। কাজেই সবাই ভাবেন যে, আমার এই ভালো কম্পোজিশনটা লতা বা আশা কেউ গাইলে ভালো চলবে। গানটা নষ্ট হবে না। এই কনফিডেন্স আমার ওপর আসতে গেলেও তো আটটা-দশটা বছর আমার চুটিয়ে গাওয়া দরকার। সেইভাবে আমাকে দিয়ে গান তোলানো দরকার। অথচ আমি বোম্বেতে সেই সুযোগই পাইনি। আমাকে অঙ্কুরেই যেন নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা দেখেছি অনেকের মধ্যে। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এতে লতাজি-আশাজির হাত ছিল। এতে অনেকেরই হাত ছিল। আজকে যারা নতুন গাইয়ে আছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা হল যে এই মেয়েটি যদি আসতে পারে তাহলে আমরাও আসতে পারি। এ ছাড়া আমার কলকাতায় আসার সুযোগও অনেকেই নিয়েছেন। বলতে গেলে অনেক ব্যাপারই ঘিরে আছে এইখানে। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডও তো আমি পেয়েছি আর ডি-র সুরে 'মাসুম' ছবিতে গান করে। তার পরও তো সুরকাররা আমাকে উপেক্ষা করে গেছেন। সবটাই তো তাঁদের নিজেদের দোষ নয়, তাঁদের করানো হয়েছে।

শঙ্করলাল : বম্বে থাকাকালীন সেসময় কলকাতাকে মিস করেননি?

আরতি : না, আমি তো আসতাম। নিয়মিত এসে গেয়ে গেছি তখনকার সবচেয়ে বড়ো বড়ো মিউজিক ডিরেক্টরদের সুরে। দারুণ দারুণ সুর সেসব। যেমন হেমন্ত মুখার্জি, রবীন চ্যাটার্জি, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত— এঁদের সুরে কত কত গেয়েছি।

শঙ্করলাল : এঁদের কার সুরের কোন জিনিসটা আপনাকে টানত, গাইতে ভালো লাগত?

আরতি : হেমন্তদার যেমন কাব্যকে সুরের মধ্যে আনা। সোজা, সহজভাবে লোকের কাছে আনা। ওনার গান হচ্ছে মীড় অঙ্গে, সোজা কথায় বলতে গেলে। কোথাও ঝাঁকুনি নেই, প্যাঁচ নেই। সোজাভাবে সুরে সুরে যেন কথা বলে যাওয়া। অত সহজ হওয়া খুব কঠিন কিন্তু। যত সহজ ভাবে আমি বললাম অত সহজভাবে গাওয়া কিন্তু সহজ নয়। আর এটাই ওঁর বিউটি। তারপর ধরুন নচিকেতাবাবু। ওনার ছিল ছন্দ সুর, কথাও। খুব চমকদারি একেকটা কথা। উনি বোঝাতেনও কীভাবে কোন অঙ্গে ওঁর সুরগুলোকে পেশ করা যাবে। আমি যখন ছোটো ছিলাম উনি বোঝাতেন কী চান তিনি

আমার কাছে। প্রয়োজনে গীতিকারকে চাপ দিয়েও শিল্পীর প্রয়োজন মতো কথা বার করে নিতেন। বেশ রোমান্টিক আবেদনও ছিল ওঁর সুরের কাজে। সুর আর ছন্দ ছিল ওঁর গানের আসল মজা। তারপর সুধীন দাশগুপ্ত। উনি একটু পাশ্চাত্য স্টাইলে সুর বাঁধতেন। অর্কেস্ট্রার ব্যবহার হত। কিন্তু সুর থেকে কখনও দূরে যেতেন না, বরং সুরে সুরে কথাকে ভরিয়েই দিতেন। বেসিক রেকর্ডে ওঁর সুরে আমার অনেক হিট গান আছে। অনিলদার সুরে, অভিজিৎদার সুরেও কত গান করেছি। খুব গুণী লোক এঁরা। আর ধরুন সলিলদার কথা। ওঁর কথা তো সব বলাবলির বাইরে। ওঁর সত্যিই কোনোই তুলনা নেই, সলিলদা সলিলদাই। অনেকদিন অবশ্য ওঁর সুরে গান করিনি, তবে আগে যা করেছি বা অন্যের গানে ওঁর যা কাজ শুনেছি তা নিয়ে বলে শেষ করা যায় না। আসলে কিছু বলাই যায় না। সবাই জানেন উনি কী? অন্য জগৎ একটা, একটা ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার যেন। কী Precise!

শঙ্করলাল : এখন অবশ্য বাংলা আর বম্বের ছবিতে প্রায় একই অবস্থা। তাই না?

আরতি : ঠিক তাই। বম্বেতে এখন যা দেখি, এমনকি কলকাতায়, তা দূরে বসে দেখি আর ভাবি আর হাসি। যেন চার্লি চ্যাপলিনের ছবির দৃশ্য। উনি যেরকম উদ্ভট উদ্ভট দৃশ্য দিয়ে সমাজের গলদগুলো দেখিয়ে দিতেন সেইসব দৃশ্যই আপনি এখন দেখতে পাবেন বম্বের মিউজিক ডিরেক্টরদের আর গাইয়েদের সমাজে। আজকালকার গায়ক-গায়িকাদের চালচলনও ওই ছবির মতো। মুরোদ নেই, শিল্প নেই, শুধু আকাশছোঁয়া অ্যাম্বিশন। সকালে উঠে তানপুরা না-ধরে টেলিফোন ধরে মিউজিক ডিরেক্টরকে গায়িকা বলছেন, আপ কৈসে হ্যায়? আপনার জন্য একটু খাবার পাঠাব? তানপুরা নিয়ে বসার অবকাশ কোথায়? টেলিফোন নিয়ে বসে পড়ল তার বদলে। চলিয়ে আজ লাঞ্চ হো যায়ে। শামকো কেয়া কর রহে হ্যায়? এইসব! এর ফাঁকেই কনট্রাক্ট, গান এইসব। তো কী গান হবে বলুন?

শ্যামল মিত্র : এক প্রেমিকের প্রস্থান

ইংরেজিতে যাকে বলে 'লাভার বয় সং' তা বাংলায় যদি কেউ কখনও গেয়ে থাকে তবে সেই শিল্পীটি শ্যামল মিত্র। 'লাভ সং' বা প্রেমের গানের সঙ্গে 'লাভার বয় সং'-এর চমৎকার দূরত্ব আছে এবং দুটিকে কোনো মতেই গুলিয়ে ফেলা যায় না। ন্যাট কিং কোল, ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রা বা জিম রিভজ যা গাইতেন তাকে লাভ সং বলা হয়, কিন্তু ক্লিফ রিচার্ড, প্যাট বুন, এঙ্গেলবার্ট হাম্পারডিঙ্ক বা কেরিয়ারের একেবারে প্রথম দিকে, 'লাভিং ইউ' পর্যায়ের এলভিস প্রেসলি? উচ্ছল প্রথম যৌবন, খেয়ালখুশিতে ভরা, উষ্ণ প্রেমের মিঠে-নোনতা ওই গান কখনও প্রিয়ার কণ্ঠ জড়িয়ে গাওয়া হয়, কখনও প্রিয়াকে বিব্রত, রক্তিমাভা করার জন্য দুনিয়াকে শুনিয়ে। হিন্দিতে এরকম কিছু গান গেয়েছিলেন কিশোরকুমার, আর 'ও! ও! বার্নাডিন' জাতীয় গানের নকলে হেমন্তকুমার। কিন্তু বাংলা গানে এই চলনের একমাত্র ধারক ও বাহক ছিলেন শ্যামল মিত্র। শ্যামলের আরও বড়ো কৃতিত্ব যে কিশোর বা হেমন্তর মতো বিদেশি ছাঁদে এই গান তাঁকে গাইতে হয়নি, বাংলা ভাষার জন্য 'লাভার বয় সং' তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন। বাংলা ছায়াছবিতে প্রেমের গানের ক্ষেত্রে যে-চাহিদা ও মর্যাদা ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঠিক সেই চাহিদা ও মর্যাদা ওই বিশেষ ধরনের প্রেমের গানে তৈরি করে নিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র গুরুত্ব ছিল না।

১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬৪-৬৫ অবধি নন-ফিল্মিক বাংলা গানে শ্যামল মিত্রর জনপ্রিয়তা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সমতুল্য ছিল। সেই সময়ে অত্যন্ত ভালো গাওয়া ছাড়া হেমন্তবাবুর একটা বাড়তি গ্ল্যামার ছিল বোম্বাই ফিল্মের সঙ্গে সংযোগ, যা শ্যামল মিত্রর ছিল না। অথচ 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা', 'সারা বেলা আজি কে ডাকে', 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি', 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে', 'কার মঞ্জির বাজে রিনি ঝিনি ঝিনি', 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর', 'দোলে দোদুল দোলে দোলনায়', 'ডেকো না মোরে, ডেকো না গো আর' ইত্যাদি অসংখ্য ফিল্ম

ও বেসিক রেকর্ডের গান যে কী ভীষণ জনপ্রিয় ছিল এক সময় তা বলে বোঝানো অসম্ভব। পঞ্চাশের দশকে যখন শ্যামল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে তখন জলসা আলো করার মতো এক অসাধারণ রম্য, রোমান্টিক চেহারাও ছিল ওঁর। টিকলো নাক, কোঁকড়া চুল, আয়ত ভাসা-ভাসা চোখ ও আকর্ষণীয় মাজা গায়ের রঙের সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত সম্মোহন কাজ করত একটা গম্ভীর আনুনাসিক কণ্ঠধ্বনিতে। যে-ধ্বনি তাঁর গানেরও মহৎ সম্পদ ছিল। শুনলেই মনে হত ভদ্রলোক বোধহয় নস্যি নেন। তা তিনি নিতেন কি নিতেন না জানা না থাকলেও এইটুকু সারাক্ষণ টের পেতাম যে ওঁর ওই নেজাল টোনে জাদু আছে। আমাদের পুরোনো ক্রিক রো পাড়ায় ভানু বোসের বিখ্যাত জলসায় শ্যামল ছিলেন স্টার অ্যাট্রাকশন নাম্বার ওয়ান। অত্যন্ত রক্ষণশীল বাড়ির সুন্দরী মেয়েরাও সারারাত শাল মুড়ি দিয়ে জলসা শুনত শ্যামলকে শুনবে ও দেখবে বলে। তাঁর কালো হিন্দুস্থান ফোর্টিনটা পারতপক্ষে ঘেরাও হয়ে যেত ফ্যানদের দ্বারা। আমি নিজেও একবার, মনে আছে, হ্যারিসন রোডের এক রেকর্ডের দোকানের উইনডোতে তরুণবয়সী শ্যামল মিত্রর ছবির সামনে হাফ প্যান্ট পরা বয়সে নির্নিমেষ দাঁড়িয়েছিলাম বহুক্ষণ। কিছুমাত্র অত্যুক্তি না করে আজ বলতে পারি (এবং বিন্দুমাত্র ন্যাকামির প্রশ্রয় না দিয়েই) যে, শ্যামল মিত্রর মধ্যে কোথায় যেন একটা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ ব্যাপার ছিল যা ঠিক সেইভাবে স্বয়ং উত্তমকুমারের মধ্যেও ছিল কি না সন্দেহ। ষাটের দশকের এক সময় একটা মোটর গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টের পর ওঁর শরীর বেশ ভেঙে যায়। এরপর পূর্বের সেই সুন্দর চেহারা পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নিজেও যে বিশেষ চেষ্টা করেননি তার জন্য ওঁর অগণিত নারী ও পুরুষ ভক্তের মতো আমারও কিছু অনুযোগ থেকে গেছে।

আসলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শ্যামল মিত্রর বিপুল সাফল্যের সেতু ওঁর সহজ ও সরল অ্যাপ্রোচ। সুর নিয়ে অনাবশ্যক প্যাঁচ পয়জারে বিশ্বাস ছিল না শ্যামলের, তিনি ওঁর রোমান্টিক কণ্ঠের রোমান্টিকতা যতখানি সম্ভব বাঁচিয়ে রেখে আলতো করে সুর দিয়ে বাণীকে স্পর্শ করতেন। কিন্তু ওঁর গলা ছিল খোলা, যেটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছেন, এবং ক্লিফ রিচার্ড, টোনি ব্রেন্ট জাতীয় লাভার বয় সং-স্টারদের মতো তিনি ক্রুনিং বা শিল্পিত চাপা ধ্বনির চর্চা করতেন না। সুরের ধ্বনির রেশ অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারতেন যদিও তা অনুপ জালোটার মতো কালোয়াতি ঢঙে করতেন না। গানের প্রথম স্বর থেকে শেষ স্বর অবধি শ্যামল থাকতেন আপসহীনভাবে রোমান্টিক। ওঁর গলার খাদের আওয়াজটা ছিল চমৎকার, ওপরের সপ্তকে প্রবেশ ঘটত আনুনাসিক ধ্বনির এবং দুইয়ে মিলে 'প্যাথস' বা বিষাদ সৃষ্টির



সুন্দর ব্যবস্থা হত। প্রেমিকের গানকে এত সরল ভাবে তিনি বরাবর গেয়ে গেছেন যে আজ তাঁর চলে যাওয়াকে এক প্রেমিকের প্রস্থান বলে মনে হচ্ছে।

জীবন ও গান উভয় ক্ষেত্রেই শ্যামল ছিলেন প্রেমিক। রবীন্দ্রসংগীতও এত দরদ দিয়ে গাইতেন যে ঠিক সেই মুহূর্তে ভাবা যেত না যে তিনি প্রধানত একজন আধুনিক গাইয়ে। আর আধুনিক গাইয়ে বলে যে তাঁর গানের তালিম কিছু কম ছিল তাও মোটেই নয়। ছিল যে না, তার প্রমাণ ওঁর তৈরি বহু গানের সুর এবং গাওয়া বেশ কিছু গান। 'অমানুষ' ছবিতে কিশোরকুমারের গলায় যে একটি গান তিনি দুর্মূল্য সাফল্যে বসিয়েছিলেন— 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর'—তা সর্বকালের একটি শ্রেষ্ঠ বাংলা আধুনিক গান হিসেবে স্বীকৃত হবে। শ্যামলের সুরারোপের মধ্যে অজস্র wit এবং melodic intuition-এর ছাপ থাকত। সরল, রসালো, মন ভরানো সুর সেসব। তবে আপাতদৃষ্টে যত সরল তত সরল আদৌ নয়। সেসব সুর তালিমের ফসলও নয়, এক চমৎকার ব্যক্তিত্বের আন্তরিকতার ফসল। বহু সার্থক শিল্পী আছেন যাঁরা শিল্পী না হলেও সুরকার, গীতিকার, সমালোচক, রসজ্ঞ, এমনকি ডাক্তার-বৈদ্য, ইঞ্জিনিয়র হতে পারতেন। কিন্তু শ্যামল মিত্রর পথ মনে হয় ছিল দুটো—রোমান্টিক গায়ক কিংবা রোমান্টিক নায়ক। তিনি একই সঙ্গে দুটোই হতে চেয়েছিলেন। প্লে-বয় ইমেজের ছবিতে উত্তমকুমার শ্যামল মিত্রকে কণ্ঠ হিসেবে নিয়ে দারুণ ফল পেয়েছিলেন। হালকা মিষ্টি ছবির ক্ষেত্রে 'দেয়া-নেয়া' একটি ক্লাসিক। কিন্তু উত্তমকুমারই শ্যামলের একমাত্র ঠোঁট নন। পঞ্চাশের দশকের শেষাংশ ও ষাটের দশকের একটা বড়ো অংশ জুড়ে গোটা বাঙালি যুব সম্প্রদায়ই ছিল শ্যামলের 'লিপ'। শ্যামলের গান গেয়ে মেয়েদের মন জয় করা খুব সহজ ও করণীয় কাজ ছিল তখন। পরে বাংলা আধুনিকের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের মতো শ্যামলের যুগও শেষ হয়ে যায়। ফের এতদিন পর যখন সেই পুরানো গানের নতুন জোয়ার এল, ঠিক তখনই প্রেমিকের অভিমান নিয়ে এক ও অদ্বিতীয় শ্যামল মিত্র চলে গেলেন। মৃত্যুর দিন কুড়ি আগে গলফ গ্রিনে এক জলসায় যখন বসলেন তাঁর ভাঙা শরীর দেখে আমার চোখে জল আসছিল। যখন পূর্বের সেসব গান গাইছেন আমি মনে মনে তখন একটা দশ বছরের বালক হয়ে গেছি আর শুনছি এমন এক লোকের গান যাঁর বুকপকেট থেকে ফাউন্টেন পেন পড়ে গেলে অন্তত তিরিশটি বালিকা, যুবতী, মহিলা গিয়ে তা তুলে দেবে তাঁর হাতে।

সুচিত্রা, কণিকা এবং রবীন্দ্রসংগীত

শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডি, রদ্যাঁ-র বানানো মর্মরমূর্তি, পল ক্লে-র ছবির মতনই রবীন্দ্রনাথের গান। অজস্র প্রবেশপথ, অসংখ্য প্রস্থান-দ্বার। ভেতরে অগুন্তি আয়না ছড়িয়ে, যাতে একই দৃশ্যের অশেষ প্রতিবিম্ব। ফলত ওই ট্র্যাজেডি, ওই মূর্তি, ওই ছবি, ওই গান হয়ে দাঁড়ায় গোলকধাঁধা। শুধু শিল্পের সূত্র দিয়েই তাদের সত্যে পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব। পণ্ডিতরা, সমালোচকরা অনবরত তাই লিখে যাচ্ছেন, লিখেই যাচ্ছেন। উৎসাহিত বোধ করে কিছু অনধিকার চর্চাও করে ফেলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু উল্লেখিত শিল্পবস্তুগুলো এতই রহস্যময় (জটিল বা দুর্বোধ্য বলছি না) যে শেষমেশ কে যে অধিকারী, আর কে অনধিকারী সে প্রশ্নও সঠিকভাবে তোলা যাচ্ছে না।

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে এটুকুই বলতে পারি যে ব্যাকরণগত, শৈলীগত তালিম ও তত্ত্বগত সব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হলে ওই গানের যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই রবীন্দ্রসংগীত। অর্থাৎ সাধারণ শ্রোতার কাছে, শিল্পীর কাছে রবীন্দ্রসংগীতের উত্তরণ যেখানে আদতে সেখানেই হয়তো তার শুরু। অত্যন্ত শিষ্টাচারের সঙ্গে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে থাকেন তাঁদের গান শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে, মনোগত ভাবে অন্তত সেই গানের ধরনধারণ রপ্ত করার পর রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে যেটুকু অতিরিক্ত তৃপ্তি, বোধ, শান্তি আমরা চাই সেটাই রবীন্দ্রসংগীত। সোজা ভাবে বলতে গেলে রবীন্দ্রসংগীতের একই গানের মধ্যেই অনেকগুলো স্তর আছে, সে-সব স্তরে নির্ভর করে ওই গানের অর্থ এবং রহস্য ক্রমশ প্রসারিত হয়, ঘনীভূত হয়। পাড়ার ছেলের অভিনয়ের 'হ্যামলেট' এবং লরেনস ওলিভিয়ে কি ইনোকেন্তি স্মোকতুনভস্কির 'হ্যামলেট' যেভাবে একই কথার ভিত্তিতে হয়েও আসমান জমিন ফারাকে দাঁড়িয়ে যায়। একেবারে শুদ্ধ ভঙ্গির রবীন্দ্রসংগীত শোনার পরেও মনের কোণে যে আকাঙ্ক্ষা বা অভাববোধ থাকে সেটা মিটিয়ে নিতে আমরা যাঁদের গানের দ্বারস্থ হই তাঁদের এক জনের নাম সুচিত্রা মিত্র, অন্য জনের নাম কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুচিত্রা রবীন্দ্রসংগীতে একটা যুক্তিসিদ্ধ মন প্রয়োগ করেছেন; কথাকে এমন বিচার ও বিশ্লেষণ করে গাওয়া শুধু রবীন্দ্রসংগীত কেন, যে-কোনো সংগীতেই বিরল। কণিকার গায়নশৈলীতে কোথায় যেন একটা অহৈতুকী কৃপার ব্যাপার আছে। খুবই সূক্ষ্ম, সুরেলা কণ্ঠ তাঁর, কিন্তু তিনি এমন-এমন পর্যায়ে কথার ভাব ও ব্যঞ্জনাকে নিয়ে যেতে পারেন যা গানের কথাগুলো পড়ে বা অন্য অন্য কণ্ঠে শুনে আঁচ করাও অসম্ভব। যে-কোনো গানের মানেই যে সুচিত্রা বা কণিকা তাঁদের বিচক্ষণ শ্রোতার চেয়ে বেশি বোঝেন তা তো নয়, তবে গাইবার সময় গানের সুর ও কথার দুর্জ্ঞেয় রসায়ন ও প্রভাবে তাঁরা গানের এমনও অর্থ ও অনুভূতিতে পৌঁছে যান যা বাস্তবিকই ব্যাখ্যার অতীত। ওঁদের গানের সময়েই যে এটা বেশি করে ঘটে তার আংশিক কারণ ওঁদের কণ্ঠসম্পদ, ওঁদের ঢং ও শিক্ষা। অবশিষ্ট কারণ— এবং কার্যত হয়তো বা মুখ্য কারণ—ওঁদের মন, তার প্রকৃতি ও ধর্ম। রবীন্দ্রসংগীত ওঁদের মনের কাছে একটা জীবন্ত বাস্তব, আত্মপ্রকাশের অবিকল্প যন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের লেখা কথা ও কল্পিত সুরকে আশ্রয় করে ওঁরা যেন নিজেদের জীবনেরই সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-অপ্রেম, মিলন-বিচ্ছেদ, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের কথা মানুষকে শোনান। অর্থাৎ অন্যের সৃষ্ট একটা শিল্পকে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম করে, তার ভাব ও প্রকরণকে আত্মসাৎ করে, সেই শিল্পকে (এক্ষেত্রে গানকে) নিজের প্রার্থনা, পূজা বা নিবেদনের কাজে ওঁরা ব্যবহার করেন। বাইবেলে মথি কথিত, লুক কথিত, যোহন কথিত সুসমাচার আছে। সুসমাচার সেই একটিই, যা হল খ্রিস্টের আগমন ও জীবনবার্তা। রবীন্দ্রসংগীতেরও যদি কোনো বক্তব্য বা দর্শন থেকে থাকে তবে তা একদিন না-একদিন 'সুচিত্রা মিত্র কথিত' বা 'কণিকা নিবেদিত'এই মর্যাদা লাভ করবেই। কারণ সুচিত্রার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বা কণিকার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত বলতে এমনই অভিজাত, মর্মস্পর্শী, অননুকরণীয় কিছু গান বোঝায় যা অন্য কেউ গাইলেও, এবং অনিন্দ্যসুন্দর ভাবে গেয়ে দেখালেও নিজেদের বিশিষ্টতা ও সম্মোহনে অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।

সুচিত্রা, কণিকা রবীন্দ্রসংগীতকে নিজেদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম করেছেন—এ-কথা যেমন বলেছি, তেমনই বলব যে রবীন্দ্রসংগীতও ওঁদের মন দুটি ও কণ্ঠ দুটিকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে, প্রকাশমাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীত নামক ওই বিমূর্ত, প্রায় অলৌকিক ব্যাপারটি ওই দুই শিল্পীর কণ্ঠকে আশ্রয় করে নিজেরই এক উত্তরণ সৃষ্টি করেছে। দৃপ্ত মন ও সূক্ষ্ম কণ্ঠ থাকা সত্ত্বেও সুচিত্রা ও কণিকা কিছু কিছু গানের কিছু কিছু জায়গায় কীরকম ভাবেই যেন নিজেদের সত্তাটাই হারিয়ে

বসেন। তখন ওঁদের সত্তা বলতে ওঁদের কণ্ঠ দুটিকেই বোঝায়। যে-কণ্ঠকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের ওই সব গান যেন আপনা-আপনিই নিজেদের মেলে ধরতে থাকে। এলিয়ট কবিতা রচনার পক্ষে 'escape from emotion' বা অনুভূতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সপক্ষে যা বলেছেন তা কিয়দংশে সত্য রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রেও। ভালো কবিতার মতন রবীন্দ্রসংগীতেরও একটা ইনটেলেকচ্যুয়াল, স্বাধীন, প্রায় নৈর্ব্যক্তিক দিক আছে। শিল্পীরা অযথা ভাবাবিষ্ট হয়ে সেসব গান না গাইলেই ভালো। কিন্তু যে-শিল্পীর মধ্যে কোনো ভাবই নেই তার পক্ষে ভাবের জগৎ থেকে পালানোর প্রশ্নও ওঠে না। 'Escape from emotion' কোনো নঞর্থক, নেতি বা অভাববাচক ব্যাপার নয়, এটা মূলত মনোগত পরিশীলন ও শৃঙ্খলার ব্যাপার। সুচিত্রা, কণিকা তাঁদের গানে ভাবসমৃদ্ধ বলেই তাঁরা প্রয়োজনে ভাবমুক্ত হয়েও গাইতে পারেন এবং এই ভাব ও মননের যুগল প্রচেষ্টাতেই ওঁদের গান অত অসাধারণ হয়ে ওঠে। ভাবের সূক্ষ্মতাকে রপ্ত করে, কিন্তু ভাবের মেদ বর্জন করে গান গাওয়াটা যে কত বড়ো সার্থকতা তা হয়তো আমরা পুরোপুরি বুঝব আর কিছুকাল পর। তবে সুচিত্রা ও কণিকা যে গায়িকা হিসাবে ভীষণই জনপ্রিয় তাতেই কিছুটা বোঝা যায় যে রবীন্দ্রসংগীত কতখানি প্রবেশ করেছে বাঙালি জনমানসে।

প্র্যাকটিকাল রবীন্দ্রদর্শন বলতে আমি রবীন্দ্রসংগীত বুঝি। এ গান গাইতে গাইতে শুনতে শুনতে আমরা শিক্ষিত হই, সতর্ক হই, বদলে যাই। আমাদের দুঃখকে গ্লানিহীন, আনন্দকে বল্গাহীন, প্রেমকে প্রয়োজনীয় ও মৃত্যুকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে রবীন্দ্রসংগীত। বিদেশি ধর্মসংগীত সুফিগান বা এদেশীয় ভজন, গীত, বাউলের মতন রবীন্দ্রসংগীতেরও একটা প্রবল নৈতিক, দার্শনিক প্রভাব আছে। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্লান্তিহীন চেষ্টা এই গানে। কিন্তু ভাষাগতভাবে রবীন্দ্রসংগীত অভিজাত সম্প্রদায়ের গান। প্রভাবশালী হলেও বিশেষ রকম জনপ্রিয় হওয়ায় এর অসুবিধা ছিল। তাকে গভীর মর্মস্পর্শী রেখেই জনগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টাতে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যে-চেষ্টা চলছে তাতে যে-ক'জন শিল্পীর ভূমিকা প্রধান তাঁদের মধ্যে অনায়াসে এবং সর্বাগ্রে মনে আসে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্রকে। এঁদের যুগ বলা যেতে পারে শুরু হয়েছে ষাটের দশকের গোড়ায় গোড়ায়। যদিও তার দশ-পনেরো বছর আগে থেকেই বাঙালি শ্রোতা এদের ভক্ত। কিন্তু গত বিশ-বাইশ বছর ধরে এঁরা যে-হারে, যে-স্তরের গান গেয়ে যাচ্ছেন তার যোগ্য সমাদর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই হয়তো করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ ১২২ বছর বেঁচে থাকলে কয়েকটা ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী ছিল। তিনি একাধারে পুলকিত ও সন্ত্রস্ত হতেন তাঁর বইয়ের লক্ষ লক্ষ বিক্রি দেখে, বিশ্বভারতীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে লজ্জায় জর্জরিত হতেন, তাঁর সাহিত্য ও অন্যান্য কীর্তিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা বল্গাহীন, অন্তহীন আলোচনা ও রচনায় বিরক্ত হতেন, তাঁর কিছু ভক্তদের চরিত্র দেখে ব্যথিত হতেন, কিন্তু যথার্থ শান্তি ও আনন্দবোধ করতেন ওর কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র দেখে এবং জনাকয়েক শিল্পীর কণ্ঠে ওঁর রচিত কিছু গান শুনে। এই কয়েকজনের দুজন, বলা বাহুল্য, সুচিত্রা ও কণিকা।

বিমানদা

বিমান ঘোষের বেশভূষা ছিল সাহেবরা যাকে বলবে natty, সুপরিপাটি। নানা ধরনের স্যুট আর বাহারি টাই ছিল ওঁর শখের পোশাক। কখনো-সখনো গরদের পাঞ্জাবি আর চওড়া-পাড় ধুতি পরেও উৎসবে-অনুষ্ঠানে আসতেন তিনি। কলকাতায় প্রথম যখন 'জোভান মাস্‌ক' আফটার শেভটা ফ্যাশনেবল হল নিয়মিত ওই ঘ্রাণ আসত ওঁর শরীর থেকে। ওঁর দামি জুতোজোড়া সর্বক্ষণ চকচক করত এবং মুখ ফসকেও কখনও তাঁকে বলতে শোনা যায়নি 'ভালো আছি'। ওঁর বলার ধরনটা ছিল, 'এই তো চলে যাচ্ছে! তুমি কেমন?' এই 'ভালো আছি' না-বলাটার মধ্যে একটা মৃদু চাপ থাকত, অভিমানের চাপ। ভালোবাসার চাপ। চিরকুমার বিমান ঘোষ, যিনি কিছুদিন আগে চিরবিদায় নিলেন সবার থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সে, শেষ বয়স অবধি নিজের বয়স লুকিয়েছেন। তালগোল পাকানো হিসেবে আট-ন' বছর মেরে রাখতেন। বুড়িয়ে যাওয়া, বয়স হয়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে কোনোদিন মানেননি; চিন্তাভাবনা, পোশাক-আশাক, কথাবার্তা এবং স্বভাবে এমন এক যৌবন অভ্যাস করতেন যে, যে-কোনো বয়সের নারী ও পুরুষের কাছে তিনি ছিলেন সমবয়সীর মতো। কিন্তু এই সমবয়সি থাকার চেয়েও অনেক বড়ো একটা পরিচয় ছিল বিমান ঘোষের—তিনি ছিলেন সমস্ত পরিচিত-অপরিচিত-স্বল্পপরিচিত-হঠাৎ পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবের সমব্যথী। যাঁর নিজের মনেই এত জমা ব্যথা-বেদনা ছিল তিনি যে কীভাবে এত-এত মানুষের ব্যথা-বেদনার ভাগ নিতেন তা ভেবেও বিস্মিত হতে হয়। বিমান ঘোষকে খুব বেশিদিন 'বিমানবাবু'র স্তরে ঠেলে রাখা যেত না, হঠাৎ কখন নিজের অজান্তে হয়ে পড়তেন 'বিমানদা'।

বিমানদা যে খুব নবীন মানুষ কিছু নন সেটা ধরা পড়ত যখন তিনি ঘরের সিলিং অথবা আকাশের দিকে চোখ তুলে উদাস ভাবে স্মরণ করতেন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো

কাউকে। বিমানদা ছিলেন গিরিজাবাবুর ছাত্র, কিন্তু তাঁর সংগীতজ্ঞান, সংগীতপ্রীতি সংগৃহীত হয়েছিল ভারতের সমস্ত বড়ো বড়ো সংগীতজ্ঞের সঙ্গে মেলামেশা করে। যাঁরা গাইতেন, বাজাতেন বিমানদা বিনা নোটিশে তাঁদের প্রেমে পড়তেন। কী নারী, কী পুরুষ। ফলে তাঁদের বিখ্যাত রাইভ্যালরির তুঙ্গ মুহূর্তেও পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও উস্তাদ বিলায়েত খাঁ ছিলেন বিমানদার প্রিয় বন্ধু; দুই শিল্পীর কারও কাছেই যাতায়াত কমেনি তাঁদের অনুরক্ত বিমানের। কারও জন্য কাউকে ছাড়ায় কোনোদিন সায় ছিল না বিমানদার। কিন্তু পক্ষ না-নেওয়ার চেয়েও একটা কঠিনতর কাজ তিনি অনায়াসে করে ফেলতেন অবিরত। প্রচণ্ড চাপের মধ্যেও তিনি কারও নিন্দে করা থেকে বিরত থাকতেন। সারাক্ষণ প্রশংসা করতেন বলে শেষ দিকে অনেকেই তাঁর কথার বিশেষ গুরুত্ব দিত না। কিন্তু তাতে বিমানদার কিছু এসে যায়নি। সমালোচক হিসেবে স্বীকৃতির জন্য তেমন ব্যগ্র তিনি কোনোদিনই ছিলেন না, তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে ভালোবাসা দিতে, তাদের ভালোবাসা পেতে। যা তিনি অফুরন্ত পেয়েছেন ও দিয়েছেন।

বিমানদা ছিলেন আকাশবাণী কলকাতার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ভি জি যোগ বা কেরামতুল্লা খাঁয়ের মতো সর্বজনপ্রিয় মানুষ ছিলেন তিনি। কোনো উচ্চাঙ্গ, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান কী আধুনিক শিল্পীর বেতার-রেকর্ডিং করে ফিরে আসার উপায় ছিল না একবারটি বিমানদার ঘরে না-বসে। আর বসা মানেই বসে থাকা, সুখ-দুঃখের শতেক গপ্পে মজে যাওয়া, আরও আরও শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া, কয়েক কাপ চা-কফি গলাধঃকরণ করা এবং এই অনুভূতি নিয়ে বিদায় নেওয়া যে তিনি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই বিমানদার। বেগম আখতারের ঠুংরি ও গজলের একটা বিশেষত্ব ছিল বিমানদার কথাবার্তায়। প্রতিটি শ্রোতার যে-ধারণা জন্মাত বেগম আখতারের জলসায়—যে, শিল্পী যেন তাকে উদ্দেশ করেই বলে যাচ্ছেন তাঁর ঠুংরি বা গজলের কথা—বিমানদার মর্মস্পর্শী কথায় তেমন একটা ইল্যুসন ঘটত তাঁর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। বিমানদার বেঁচে থাকা যেন তারই জন্য। তবে সেটা পুরোপুরি ইল্যুসন হয়তো থাকত না; সব বন্ধুর জন্যই বিমানদার হৃদয়ে একটা আলাদা আসন থাকত। হাজার টানাপোড়েনেও সেই আসন তিনি ধ্বংস হতে দিতেন না।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে কোয়ালিটি রেস্টুরেন্টের উলটো ফুটপাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ছোট্ট, মনোরম ফ্ল্যাটে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিলেন বিমানদা। সেখানে তাঁর ম্যান্টেলপিসের ওপর সুন্দর সাজানো থাকত দুই মহান সংগীতশিল্পীর ছবি। অন্নপূর্ণা শঙ্কর এবং সুচিত্রা মিত্র।

ভালোবাসতেন বললে ভুল হয়, এই দুজন মহিলাকে বিমানদা বলতে গেলে পুজোই করতেন। 'রাগ-অনুরাগ' বইয়ের কাজে একবার বোম্বাই গিয়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে দেখা করে এসেছি জেনে কী ভীষণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন ভদ্রলোক! ঠিক যেমনটি পুলকিত বিস্ময়ে অন্নপূর্ণার খোঁজ নিচ্ছিলেন রবিশঙ্কর। বিমানদার জ্ঞাতব্য অন্নপূর্ণা কেমন আছেন, কী বললেন, কেমন শেখাচ্ছেন, এমনকি, সাক্ষাতের দিনে কী পরেছিলেন। সব শুনে ওপরে চোখ তুলে উদাস নেত্রে বললেন, ওর তুলনা নেই! শি ইজ অ্যান এঞ্জেল!

সুচিত্রা সম্পর্কেও খুব কথা হত বিমানদার সঙ্গে। বস্তুত সুচিত্রার সুইনহো লেনের বাড়িতে শিল্পীর সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাই বিমানদার সঙ্গে। এরপর একটা লেখাকে কেন্দ্র করে সুচিত্রার সঙ্গে যখন আর সুসম্পর্ক রইল না বিমানদা ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন। প্রায়ই বলতেন, ও খুব টেম্পেরামেন্টাল, নিঃসঙ্গ। কিন্তু ভালো মানুষ। দূর থেকে দেখে ওকে বিচার কোরো না।

এরকমই একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল বিমানদার কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। শান্তিনিকেতনে একবার দেখলাম কণিকার কী অভিমান বিমানদার ওপর। বিমানদা নাকি পার্টিজান, পক্ষপাতদুষ্ট। বাড়ির বাগানে বসে অভিযোগের পর অভিযোগ এনে যাচ্ছেন কণিকা; বিমানদা ঘাড় হেলিয়ে, অসহায় চাহনিতে সব শুনে যাচ্ছেন। কোনো প্রতিবাদ নেই। শুধু বহুক্ষণ শোনার পর মৃদুভাবে হয়তো বলছেন, তুমি ঠিক বললে না, মোহর। যা শোনামাত্র কণিকা চটে গিয়ে নতুন করে শুরু করছেন তাঁর রাগ-অনুরাগ। বলতে নেই, ওঁদের এই সম্পর্ক দেখে খুব অবাক বোধ আর আনন্দ হচ্ছিল। কিছুটা হিংসেও যে হয়নি তাও হলফ করে বলতে পারব না।

শুধু আকাশবাণীতে কাজ করেই বিমান ঘোষ বিমান ঘোষ হননি। শিক্ষিত বাড়ির শিক্ষিত ছেলে বিমানদা পুরোদস্তুর গানের তালিম নিয়েছিলেন। কিছু গান লিখেছেন, কিছু গানে সুর করেছেন। কাজি নজরুল ইসলামকে সামনে বসে গান বাঁধতে দেখেছেন। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে সুরের চলন, গীতির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একবার সতীশ মুখার্জি রোডে গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুমে দেখি হঠাৎ করে এসে পড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ওঁকে জিজ্ঞেস করছেন, বিমান, তুমি আমার 'রাগ-অনুরাগ' ছবির গানগুলো শুনলে? কী মনে হয়, লাগবে? এখানে বলে দিই, এই 'রাগ অনুরাগ' একটি আধুনিক বাংলা ছবি, যার সুরকার হেমন্তবাবু। এভাবে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করার পর হেমন্ত উঠে যেতে বিমানদা শুরু করলেন হেমন্তর কথা। ঠিক সেই বলার ভঙ্গি, সেই টোন—যেভাবে এক সময় তিনি আমাকে শোনাতেন রবিশঙ্কর, আলি আকবর, বিলায়েতের কথা। সম্প্রতি আলি আকবর যখন

শেখাতে গেলেন শান্তিনিকেতনে টুরিস্ট লজ-এ তাঁর কটেজের পাশের ঘরটা ছিল বিমানদার। গান শেখানোর পর সন্ধ্যাবেলায় গল্পের আসর বসত। হাজির থাকতেন বিমানদা। থেকে থেকেই বলে উঠতেন, তোমার মনে আছে, আলি? সেই যে সেই... মৃদু হাসি হেসে মাথা নাড়তেন আলি আকবর।

আসলে ব্যাচেলর বিমানদা অতীত ও স্মৃতিতেই বাস করতে ভালোবাসতেন। রেডিয়োতে থাকাকালীন যেসব অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন, গ্রামোফোন কোম্পানিতে থাকাকালীন যেসব রেকর্ড করিয়েছিলেন সেসব নিয়ে বলতেন, তবে কৃতিত্ব দাবি করতে নয়। বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, গৌরী ঘোষ প্রমুখকে নিয়ে লং প্লে ডিস্কে 'শেষের কবিতা' শ্রুতিনাটক প্রযোজনা করে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। 'রামকৃষ্ণায়ন' শীর্ষক একটা এলপি করেও সবাইকে বলতেন রেকর্ডের গানের মাহাত্ম্যর কথা। কিংবা রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে 'পথ ও পথিক'। কী রেডিয়োতে কী এইচএমভিতে বিমানদা যে কী চমৎকার কাজের নমুনা রেখে গেছেন তা ভাবলে রীতিমতো রোমাঞ্চ হয়। একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে, আসা উচিত অন্তত, যেদিন 'বিমান ঘোষ প্রযোজিত অনুষ্ঠান' হিসেবে রেডিয়ো ও রেকর্ড কোম্পানি একটা অনুষ্ঠান করবেন। সেটা খুব যোগ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে এই বিরল ব্যক্তিত্বের প্রতি। তাঁর জীবনকালে তাঁর প্রতি অন্যায় তো কিছু কম হয়নি! না হলে অবসর গ্রহণের বয়স হওয়ার আগেই রেডিয়োর চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে সরে যেতে হল কেন তাঁকে? রেকর্ড কোম্পানিতে যাঁরা গান বোঝেন না, তাঁরা কেন নিত্যদিন ছড়ি ঘুরিয়ে গেলেন সংগীতপ্রেমী মানুষটির ওপর?

আমি ভদ্রলোকের প্রেমিক স্বভাবের কথা বলেই শেষ করতে চাই না। এরও গভীরে ছিল ওঁর আধ্যাত্মিক সত্তা। রামকৃষ্ণদেব-বিবেকানন্দের ভক্ত ছিলেন। কিছুদিনের মতো ভক্ত হয়েছিলেন পুতাপুর্তির সাঁইবাবার। তখন সাঁইবাবার আশ্রমে গিয়ে মস্ত একটা আংটি ধারণ করে এসেছিলেন। তা নিয়ে অনেকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। কিন্তু উনি নির্বিকার থাকতেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম সে আংটি নেই। কেন, কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করিনি। তবে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রেম ছিল তাঁর জীবনের শিকড়ের মতো। ভক্ত ছিলেন শ্রী অরবিন্দেরও। সেটা দিলীপকুমার রায়ের দান। বিমানদার জীবনের শেষ অনুষ্ঠান-উপস্থিতি ছিল অরবিন্দ আশ্রমের এক প্রোগ্রামে। যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্পর্শ রাখা হল শহরের সেইসব বাড়িতে যেখানে শ্রী অরবিন্দ কখনো-না-কখনো বাস করেছেন।

নাকি সেই অনুষ্ঠানে বিমানদার যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত? সেদিনই কি তিনি অসুস্থ হলেন? এসব খুঁটিনাটি জানার আর আগ্রহ নেই। যে-মানুষটি ছাড়া শহরের কোনো সংগীতানুষ্ঠানেরই ষোলোকলা পূর্ণ হত না তিনি কবে কোথায় অ্যাবসেন্ট হলেন তা নিয়ে কেন আর মাথা ঘামাব? গোটা শহরের জীবনেই যে তিনি অনুপস্থিত হয়ে পড়লেন, আর এতক্ষণে পাঠক হয়তো উশখুশ করতেও পারেন—সন-তারিখ পারিবারিক বৃত্তান্ত কই লোকটার? তাহলে বলি, নেই— জীবনের এই সব তথ্য বিমানদা চেপে রাখতেন। ওটা ছিল রহস্যের দিক। আর জীবনের অন্য সব অংশ ছিল রসের।

বিমানদা সম্পর্কে খুব নৈর্ব্যক্তিক একটা লেখা শেষ পর্যন্ত যে লেখা গেল না, তার সবটাই আমার অক্ষমতায় নয়। চেনাজানা সকলের সঙ্গে এমন একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কে ঢুকে পড়তেন তিনি যে সন-তারিখ, কীর্তিকাহিনি দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে লেখা প্রায় অসম্ভব। নিজের কীর্তি স্থাপন নয়, অন্যের কীর্তি-কীর্তন করার জন্যই তিনি জন্মেছিলেন। আর আমার অভিজ্ঞতা এক অর্থে অন্য আরও অনেকেরই অভিজ্ঞতার ভিন্ন সংস্করণ। বিমানদাকে নিয়ে লিখতে সকলেরই তাই একই নিয়তি—একটু-আধটু নিজের স্মৃতি বলে ফেলা। সেক্ষেত্রে একটা যুক্তি আমাদের সকলের পক্ষেই আছে, সেটা তাঁর সার্ত্র-স্মৃতি 'আদিউ'-এর সূচনাপর্বে লিখে গেছেন সিমোন দ্য বোভোয়া। সার্ত্র বিষয়ে বলতে গেলে নিজের কথাও আসবে কারণ সাক্ষী নিজেও তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যের অঙ্গ। একটা স্তরে সাক্ষী ও সাক্ষ্য অবিভাজ্য।

বিমানদার সুজনতার প্রমাণে কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন অবশ্যই নেই। কিন্তু এরকম বিরল প্রকৃতির রসিক ও মানুষ যে সত্যিই ছিলেন তার সাক্ষী তিনি করে গেছেন অজস্র লোককে। যা হতে পারাটা আমাদের সকলেরই খুব সৌভাগ্যের।

কী ধ্বনি বাজে

মাইকের গান দিয়ে আজকাল আর পুজো চেনা যায় না। যেমন যেত আড়াই কিংবা দুই দশক আগে। পুজোর রিলিজ সব তরতাজা বাংলা আধুনিক দিয়ে মাইক চালু থাকত সে সময়ের দুর্গাপুজোয়। কালীপুজোয় বাজত ধনঞ্জয় ও পান্নালাল ভট্টাচার্যের শ্যামাসংগীত। সরস্বতীপুজোয় মাইকের চল তেমন হয়নি তখন, তবে যারা ত্রিশ-টাকায়-দিন ভাড়ায় মাইক জোগাড় করতে পারত তারা মনের সুখে বাজিয়ে নিত হেমন্ত, সন্ধ্যা, মান্না, শ্যামল, আলপনা, তরুণ কিংবা মানবেন্দ্র। 'শোলে'-র গব্বর সিং-এর সংলাপ, 'ববি'-র 'হম দো কমরেমে বন্ধ হো/ওর চাবি খো যায়ে' কিংবা 'যিসকি বিবি মোটি' ধ্বনিতে দুর্গাপুজোর যুগের সঙ্গে সেদিনের একটা মৌল প্রভেদ ছিল।। আজ সকালে মাইকে যেগান দিয়ে প্যান্ডেলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে তা দিয়ে কিছুতেই আমি জানব না এ পুজো কোন পুজো, এ পাড়া কোন পাড়া, এ আমি কোন আমি!

পুজোর প্যান্ডেলে হিন্দি গানের অনুপ্রবেশ অবিশ্যি খুব হালের ঘটনা নয়। আমার মনে আছে সেই সুদূর ১৯৫৫ সালের দুর্গাপুজোয় একদিন আমার দিদির প্রাইভেট টিউটর খুব হন্তদন্ত ভাবে বাড়ি ঢুকে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, ছিঃ! লোকের কী রুচি হচ্ছে দিন-দিন! পুজোর প্যান্ডেলে দিনের প্রথম গান হল কিনা 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি!' মাস্টারমশাইয়ের সেই বিবরণ শুনে বাড়ির অনেকেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁরা গানসর্বস্ব হয়ে পড়বে। যেমন হয়ে গেছে এখন।

১৯৫৫-য় যা ছিল ব্যাতিক্রম তা নিয়ম হতে সময় নিল বড়োজোর পনেরোটা বছর। কিংবা আরও দু-চারটে বছর বেশি। ইতিমধ্যে বাংলা আধুনিকের দুরারোগ্য ব্যাধি হল, কয়েক বছরের ভোগান্তি, তারপর এখনকার এই মুমূর্ষু অবস্থা। যে কটা বাংলা আধুনিক গান আজ প্রকাশিত হয় তা কেবল বাণীতেই বাংলা, সুরধ্বনিতে হিন্দি। সেসব মাইকে বাজলে (বিশেষ করে মাইক যদি হেঁড়ে, ঘ্যাসঘ্যাসে কিংবা কিঞ্চিৎ অমাইকোচিত হয়) কেউ ঠাওরে উঠতে পারবে না নিবেদনটি কোন দেশীয়, কোন কূলগত। হিন্দির পোঁ ধবে

বাংলা গানের এই যে হেনস্থা তার নবতম প্রদর্শনী হবে, আশঙ্কা হয়, বর্তমান পুজোর ধ্বনির চলনও। কিন্তু কী করা যায়?

আমার এখনও স্পষ্ট স্মরণ আছে কী দেদার উৎসাহে মধ্যবিত্ত বাঙালি এক সময় পুজোর বাংলা রেকর্ড কিনত। কেনা শুরু হত শনি ও রবিবারের অনুরোধের আসরের নতুন নিবেদন শুনে শুনে। সেসময় রেডিয়োর বিজ্ঞাপনী কার্যক্রম শুরু হয়নি, স্পট ও জিঙ্গল দিয়ে বস্তু বিকোনোর রেওয়াজ ছিল না। প্রথমে দেখেছি আড়াই টাকার ৭৮ আরপিএমের দুই গান রেকর্ড। বহুকাল পরে এল এক্সটেন্ডেড প্লে ডিস্ক যাতে চাইলে চারটি গানও লভ্য হত। মধ্যবিত্ত এতদূর অবধি এসেছিল, বারো-তেরো টাকায় ইপি ডিস্ক বহুত কিনেছে। কিন্তু রেকর্ডের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরে গেছে দেবব্রত, হেমন্ত, সুচিত্রা, কণিকার রবীন্দ্রসংগীতে, এবং আরও পরে ষাটের দশকের শেষ পাদে আর সত্তরের দশকের গোড়ায় গোড়ায় ধীরেন মিত্র, মানবেন্দ্র, অঞ্জলির নজরুলগীতিতে। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত কি নজরুলগীতি সে ভাবে কোনোদিনও পুজোর মাইকের গান হয়নি যেভাবে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে হতে পেরেছিল হেমন্তর গাওয়া, সলিলের সুরারোপিত, 'গাঁয়ের বধূ' কি 'পাল্কীর গান' কি 'রানার'। সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকেই হিন্দি গান এ রাজ্যে বাজার তো নিলই, পজোর প্যান্ডেলেরও ইজারা নিল। তাও ভালো হিন্দি গানের রমরমা হলে কিছুটা নিষ্কৃতি হয়তো ছিল, মায়ের আরাধনার আসরে গানের ভাষা হল 'আরে ঝুমকা গিরা রে', 'নাচ মেরি জান ফটাফট', 'কাউয়া বোলে', 'রম্ভা হো সম্ভা হো', 'ঝুম বরাবর' কিংবা 'ম্যায় হুঁ ডিস্কো ড্যান্সার'। প্যান্ডেলের পুজোর উদ্দেশ্য এবং তার ধ্বনির পরিবেশে যে মেরুর বৈপরীত্য সৃষ্টি হল তার নিট ফল হল মণ্ডপে গিয়ে পুজো দেখায় সাধারণ বাঙালির এক চরম অনীহা। এককালে যে-গান মানুষকে প্রলুব্ধ করে টেনে আনত প্যান্ডেলে, আজ সেই গানই কারণ হয়েছে তাদের দূরে-দূরে সরে-সরে থাকার। কোনো পুজোর প্যান্ডেলে মাইক বাজছে না দেখলে কী যে স্বস্তি হয় মানুষের তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একটা নীরব প্যান্ডেলকে লোকে ধ্বনির জঙ্গলে শান্ত সরোবর জ্ঞান করে। ভেতরে ঢুকে নিঃশব্দে প্রতিমা দেখে সম্ভব হলে দু-দণ্ড অপেক্ষা করে যায়।

আমি গানভক্ত মানুষ, হিন্দি বাংলা সবেই রুচি যদি কিনা গানটা হয় মনের মতন। পুজোর প্যান্ডেলে তো গোলাম আলি খাঁ 'হরি ওঁ' বা 'আয়ে ন বালম', আমীর খাঁ-র 'পিয়া কি আবনকে শুনত খবরিয়া' ('ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে গাওয়া খাম্বাজ ঠুংরি), বেগম আখতারের 'কোয়েলিয়া মৎ কর পুকার', লতার 'আ যা রে পরদেশি', রফির 'মেরে মেহবুব তুঝে', মুকেশের গাওয়া

তুলসীদাসী চৌপাই কখনও বাজতে শুনি না। শুনলে শুনি গজলিয়া গুলাম আলির 'চুপকে চুপকে' অথবা 'হাঙ্গামা'। বেশি শুনি সেইসব ফিল্মি গান যাতে সুরের কনটেন্ট শূন্য, বাণীর মাহাত্ম্য মাইনাস ফর্টি। এত ক্ষণজীবী গান হিন্দিতেও দশ বছর আগে কম হত। হিন্দি গানও যে এই চরম জৌলুসের মুহূর্তে ভেতরে ভেতরে ফাঁপা, ঠনঠন তা যে-কোনো পুজোর প্যান্ডেলে দু-দণ্ড দাঁড়ালেই মালুম হয়। নৌশাদ, রোশন, শচীনকর্তার যুগ ফুরিয়ে সেখানেও আজ চরম নৈরাজ্য, ছড়ি ঘোরাচ্ছেন আর ডি, বাপি লাহিড়ি আর লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল। বীণা বাঁশির মিহি সুরের দিন শেষ হয়ে সেখানেও শুরু হয়েছে ঢাক ঢোল কঙ্গো বঙ্গোর দম দমাদমদম।

বছর তিনেক-চারেক আগে বাংলা গানে জোয়ার এল পল্লিগীতির। কিন্তু সে তো শচীনদেব, নির্মলেন্দুর পল্লিগান নয়, সে এক আজব হ য ব র ল পল্লিগীতি। কথায় সুড়সুড়ি আছে, সুরে নিঃসীম মনোটোনি। সে গানের রেকর্ড বিক্রি হল রেকর্ডসংখ্যক, গান বাজল শহরের আনাচে কানাচে, গাঁয়েগঞ্জে, অরণ্যের প্রান্তে। কিন্তু সে গানও বলা দরকার, গান নয়। গানের ক্যারিকেচার। মাঝেমধ্যে পথ বেয়ে আসতে যেতে পুজোর প্যান্ডেলে যখন সেই গান শুনেছি, মনে হয়েছে, যাক, এতদিনে কলকাতা নামক এই বিশাল গ্রামটি তার মুখের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। যে-শহর দিনকে দিন সর্ব অর্থেই গেঁয়ো হয়ে উঠছে তার উপযুক্ত গান এই চরিত্রহীন পল্লিগীতি।

এত সত্ত্বেও কলকাতা কখনো-কখনো আমাকে বিস্মিত, বিচলিত করে। যখন কোনো মণ্ডপে শুনি পুরোনো দিনের বাংলা আধুনিক বাজছে, গাইছেন হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা বা গীতা দত্ত। আমি পথচলা ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনি 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা', 'ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না', 'সেই তো আবার কাছে এলে', 'কে তুমি আমারে ডাকো', 'এ শুধু গানের দিন' কিংবা এমনি কোনো গান। বছর দুয়েক আগে শুধু একটি গানের হাতছানিতে ঢুকে পড়েছিলাম একটি মণ্ডপে। কারণ সেখানে বাজছিল মানবেন্দ্রর 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। সেদিন সকালে আমার কী আনন্দ যখন এক পুজোর প্যান্ডেলে বাজতে শুনলাম অনুপ ঘোষালের গলায় সত্যজিতের গান 'আহা, কী আনন্দ আকাশে বাতাসে'। এখনও আমাকে অবাক করে কলকাতার কোনো কোনো পাড়ার গানের ধ্বনি। আমার স্মৃতি ফিরে আসে তখন, আমি পুজো দেখার কৈশোর ফিরে পাই, আমার ফের নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে কলকাতাকে।

পুজোর প্যান্ডেলের গানকে আমি এত গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ ওই গান মধ্যবিত্ত সমাজের রুচির প্রতিফলন। আমি নিজে অনেক চিরস্মরণীয় গান

শুনেছি পুজোর প্যান্ডেলে বসে। পুজোর প্যান্ডেল কয়েক দিনের জন্য পাড়ার লোকের বৈঠকখানা হয়। মেলামেশা, প্রীতি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রুচির পরিচর্যাও হয়। কোনো না-কোনো বয়সে যাঁরা প্যান্ডেলে সকাল দুপুর সন্ধ্যা কাটায়নি তাদের আমি করুণা করি। তারা জানে না তারা কী হারিয়েছে। প্যান্ডেলে বসে মাইকের গান শুনতে শুনতে কান তৈরি হয়ে গেছে বহু প্রজন্মের, তাদের কেউ কেউ গায়কও হয়েছে কালক্রমে। মাইকের গান শুনে ভক্ত হয়েছিলাম হেমন্ত, ধনঞ্জয়, পান্নালালের। পরে এঁদের রেকর্ড কিনে নিভৃতে শোনার আয়োজন করেছি। কেউ আমাকে বলে দেয়নি, কে ভালো, কে বোগাস। নিজে নিজেই জেনে গেছি। মাইক তো একই সঙ্গে প্রচার করে ভালোমন্দ সব। আগে অন্তত তাই তো দেখেছি। কিন্তু সেই ট্র্যাডিশন আজ আর বেঁচে নেই। মাইক আর আমাদের শিক্ষিত করে না, বিনি পয়সার ভোজের কাজ করে না। একনাগাড়ে দুনিয়ার রাবিশ বাজছে আজ মাইকে কিন্তু শোনার কেউ নেই। যারা শুনছে তারা হয় কানে কালা, নাহলে মগজে গোলা।

বাবার মতো বাউল মেজাজের সুরকার

রাহুলদেব বর্মনের ডাকনামটা ওঁর বাড়ির দেওয়া নয়, বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দাদামণি অশোককুমারের অবদান। বাবা শচীনদেব গানের সময় 'সা' ধরলে রাহুল ধরতেন 'পা' বা পঞ্চম। তা থেকে নামটা মাথায় এসেছিল অশোককুমারের। এই সা আর পা-র কোনো শ্রুতি-বিকল্প নেই শাস্ত্রে ও গানে, শচীনদেব ও পঞ্চমেরও কোনো বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

রাহুলদেব নিজেই বহুবার কবুল করেছেন যে, ওঁর একটা বড়োসড়ো ইগো ছিল। এই ইগো বা অহং শুধু কথায় নয়, ওঁর সুরারোপিত গানেও ফুটে বেরুত। হিন্দি ফিল্মের গানে যে বিটের ঝাঁঝ, সেটা রাহুলের কীর্তি, হিন্দি গানে যে বিলিতি মেজাজ তাও ওঁরই অবদান। তবে একেবারে বাল্য থেকে তবলা শিক্ষা ও তালচর্চা করার দরুন ওঁর কোনো রিদমের কাজকেই বেবাক নকল বলে ফেলে দেওয়া যায়নি। কতখানি অহং এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে তবেই না বাবার 'আরাধনা' ছবির পরে-পরেই সেই একই পরিচালক শক্তি সামন্তর 'কটি পতঙ্গ'-এ ওই বাবার ধারাতেই, সুরেলা, চোখে জল আনা গান নির্মাণে হাত দেওয়া যায়। রাহুলদেব জ্ঞানপাপী, পরে নিজেই এ কথা বলেছেন। 'কটি পতঙ্গ'-এর গান শুনলে মনে হয় যেন 'আরাধনা'র গানের সিকুয়েল। শক্তি সামন্তর এই দুটি ছবি এবং 'অমর প্রেম' নিয়ে একটা গানের বৃত্তই তৈরি হয়েছিল। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তো বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠানে বলেইছিলেন যে, 'অমর প্রেম'-এর কিশোরকুমার গীত 'চিঙ্গারি কোন ভড়কে' তাঁর প্রিয়তম হিন্দি সুরারোপ।

রাহুলদেবের অহং-এর পত্তন কৈশোরেই, যখন ফাংশনে বাবার সঙ্গে হার্মোনিকা বাজিয়ে ফিরতে ফিরতে বলেছিলেন, আমি তোমার চেয়েও বড়ো মিউজিক ডিরেক্টর হতে চাই। বাবা হেসে বলেছিলেন, তাহলে তবলা আর হার্মোনিকা বাজিয়েই হবে না, তোমাকে তলিয়ে শিখতে হবে গানবাজনা। এরপরই সরোদ-উস্তাদ আলি আকবর খাঁ-র কাছে রাহুলের গাণ্ডা বাঁধিয়ে দেন



শচীনকর্তা। উস্তাদ তাঁর ব্যস্ততার মধ্যে যা শেখাতেন শেখাতেন, বাকিটা রাহুল শিখতেন ওঁর পরিবারের পরিবেশে ডুবে থেকে।

পাশ্চাত্যের গানবাজনায় রাহুলদেবের প্রিয় ছিলেন বিটল্‌জ, এলভিস এবং ড্রামার-পিয়ানিস্ট-গায়ক ফিল কলিন্স। পশ্চিমী পপের ছন্দ, আন্দোলন, আমাদের রাগধারার সুরের মূর্ছনা আর বাউল-ভাটিয়ালির ক্লান্তি, বিষণ্ণতা তিনি অনায়াসে একই গানে মেশাতে পারতেন। গর্ব করে জানাতেন যে, বাবা ছাড়াও শঙ্কর-জয়কিষেণ, সলিল চৌধুরী ও মদন মোহনের সঙ্গে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন, এঁরা সবাই তাঁর প্রিয় সুরকার। কিন্তু 'ছোটে নবাব', 'ভূত বাংলা' দিয়ে পরিচালনার কাজ শুরু করে শেষ অবধি এমনই এক জায়গায় তিনি পৌঁছোলেন, যেখানে তিনি একেবারেই এক ও একক।

তাঁর নিজের করা গানের মধ্যে ছিল 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবির 'দম মারো দম'। আর 'মেহবুবা' ছবির 'মেরে নয়না সাওন ভাদো'। দুটি ভিন্ন মেরুর গান, কিন্তু ওদের সৌন্দর্য নিয়ে দুটি ভিন্ন মত হবার নয়। চিন্তা ও কল্পনার রেঞ্জটাই ষাট দশকের মাঝামাঝি থেকে নব্বই দশকের গোড়া অবধি তাঁকে এত অমলিন রেখে গেল। খুব একটা যে বদলাতে হল ধ্যানধারণার দিক দিয়ে তাও নয়, সিচুয়েশন থেকে, ছবির নাটক থেকে গানের চেহারা ও নাটক তৈরি করে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা ছিল রাহুলদেবের। এ ছাড়া বাবার স্টাইলে কোন রাজ্যের লোকসংগীতকে কী কায়দায় কোন আধুনিক চেহারায় পেশ করবেন তা ছিল রুবিক্‌স কিউব মেলানোর মতো। 'তিসরি মঞ্জিল' ছবিতে একটা নেপালি পল্লি সুর লাগাবেন শুনে নাক সিঁটকেছিলেন ছবির নায়ক, চমৎকার গান-বোদ্ধা শাম্মী কাপুর। পরে সুরটা যখন চেহারা নিল 'দিওয়ানা মুঝসে নহি ইস অম্বরকে নীচে' গানে, তখন নায়ক তো স্তম্ভিত। আসলে মাথায় ঝাঁক ঝাঁক সুর ঘুরত রাহুলদেবের, অপেক্ষা শুধু একটা যথার্থ নাটকীয় পরিস্থিতি আর বাণীর। আশা ভোঁসলে চমৎকৃত হয়েছিলেন নিছক একটা সংলাপকে ওঁর গানে রূপান্তরিত করার দক্ষতায়। আর কিশোরকুমার এবং রাহুল ছিলেন, বলতে গেলে, মেড ফর ইচ আদার জুটি। রাহুলের নিজের গলাটাও ছিল একটু নাকি কিশোরকুমারীয়, ফলে কিশোর হয়ে উঠেছিলেন ওঁর দ্বিতীয় সত্তার মতো। কিশোরের গলা দিয়ে তিনি নিজেই যেন গাইতেন, ওঁর খোলা গলাকে আরওই খুলে দিতেন তালের ঝোঁক-ফাঁক আর সুরের পুকার বা তানের চলনে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাবার মতো রাহুলদেবও থেকে গেছেন বাউল মেজাজের সুরকার।

না, রাহুলদেব তাঁর বাবার চেয়ে বড়ো সংগীত পরিচালক হননি। আবার এও সত্য যে, এস ডি বর্মন, নৌশাদ, সি রামচন্দ্র, ও পি নাইয়ার, রোশন ও মদন মোহনের পর এরকম কোনো স্বতন্ত্র ধ্বনিও কেউ ভারতীয় ফিল্মে আনেননি। 'কটি পতঙ্গ'-এ যখন ইকোলাইট আনলেন আর ডি, তখন শক্তি সামন্ত তো ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। গুলজারের কবিতা নিয়ে এক বেসিক অ্যালবাম 'দিল পড়োসি হ্যায়'-তে সিন্থেসাইজার দেখেও ঘাবড়েছিলেন কেউ কেউ। শচীনদেব তো ধরেই নিয়েছিলেন যে, ক্ল্যাসিকাল শিখে ছেলের এই সুফল হল যে, সে একটা নকল দাঁড়িয়ে গেল রোশন ও মদন মোহনের। বেশ বড়ো রকম দুঃখই। তবে খুব বেশিদিনের জন্য নয়; সত্তরের দশকের গোড়াতেই ভোরে পথ হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেতেন—ওই যাচ্ছেন আর ডি বর্মনের বাবা।

রাহুলের মতো পুত্র রেখে খুব নিশ্চিন্তে প্রয়াণ করেছিলেন শচীনদেব বর্মন। অকাল প্রয়াণে রাহুলদেব রেখে গেলেন একটা গোটা প্রজন্ম। আজ সব সফল সংগীত পরিচালকেরই লক্ষ্য বাঁধা তারার পঞ্চমে।

গানে গানে

ক-দিন আগে যে-আগমনি গানটি শুনে এবারের পুজোর মুডটা তৈরি হয়ে গেল তা এক বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে শোনা। ৭৮ লং-প্লে (১২ ইঞ্চি ব্যাসের) ডিস্কে গাঁথা গানটি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় আগেকার। তার গীতিকার একজন মুসলমান, কাজী নজরুল ইসলাম, যাঁর স্তরের শ্যামাসংগীত ও আগমনি গান তাঁর পরে আর কেউ লিখতে পেরেছে বলে মনে করা যায় না। গানটি গেয়েছেন চিরস্মরণীয় কণ্ঠ ও প্রতিভাধর শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়। যাঁর প্রসিদ্ধ ওজস্বী কণ্ঠ, খোলা আওয়াজ ও রাগান্বিত গানে দরদ প্রোথিত করার কুলীন কৌশল বাঙালির গানের গর্ব। যে বাগেশ্রী রাগকে স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন হেরোইক, বীরত্বের সুর সেই সুরে বাঁধা, রাগপ্রধান অঙ্গে ধরা মা দুর্গার আবাহন, 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়' গানটি জ্ঞান গোঁসাই গেয়েছেন ঠিক সেইভাবে, যে-ভাবে বাঙালি আগে গাইতে পারত, এখন একদম পারে না। গানটা শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল, অনুরোধ করে করে বার আষ্টেক শুনলাম সেটা এবং শোনার দরুন বুক ভেসে যাওয়া আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ জ্বালা করা কষ্ট অনুভব করলাম। এক ভিনদেশি বাঙালি, বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার মাহবুব আলম সাহেব, তাঁর স্বল্পমেয়াদি কলকাতা নিবাসে দুর্মূল্য বিদেশি অর্থ খরচ করে করে ইন্দুবালার কণ্ঠে 'যব নূর ও খুদা'র মতো কাওয়ালির পাশাপাশি আমাদের সেরা, প্রায়-বিস্মৃত বাংলা গান সব সংগ্রহ করে হাতে ঘোরানো কলের গানে বাজাচ্ছেন, অভ্যাগতদের শোনাচ্ছেন, আর আমরা সারাটা বছর, এমনকি পুজোয় সুন্দর সময়টাও কানে পোকা-ছড়ানো, জগঝম্প হিন্দি আর হিন্দির বিকট অনুকরণের বাংলা গান শুনে পরমায়ু খোয়াচ্ছি। পুজো-পুজো করে আমরা বাঙালিরা হেদিয়ে যাই বটে কিন্তু কেনাকাটা, ব্যবসাদারি ও রুচির বহর দেখলে এই পুজো ব্যাপারটাকে একটা টু-পাইস-কামানো, বেহিসেবি খাইখরচ ও উলটোপালটা সাহিত্য-সংগীতের মোচ্ছব ছাড়া কিছুই মনে হয় না। আগেব দিন খান পঁচিশেক বাংলা গান আর দুটি তিনটি উপন্যাস ও দু-দশটা গল্পের



জন্যই পুজোটা স্মরণীয় হয়ে থাকত, আরও ৩৬৫টি দিন তাই নিয়ে আলোচনা চলত। তবে বলতে দ্বিধা নেই, পুজোকে প্রকৃত অর্থে স্মরণীয় করত সাহিত্য নয়, গান। আর সেই গানের জন্যই এখন আমরা শহর ছেড়ে পালাবার জন্য দু-মাস ধরে প্রস্তুতি নিই।

আলোচ্য রেকর্ডের উলটো পিঠের গানটিও কাজী সাহেবের লেখা আর জ্ঞান গোঁসাইয়ের গাওয়া। খুব বিখ্যাত গান, দেবী বন্দনার গানও এবং আজকের সমাজ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভীষণ সময়োপযোগীও— 'ভারত শ্মশান হল আজ'। ভারী বেদনা ও অনুভূতির গান, সমাজ পর্যবেক্ষণের গভীর ছাপ আছে কথায়। ফলে ডিস্কটা এমনই এক নিবেদন যা একই সঙ্গে গায়ক, গীতিকার ও রেকর্ড সংস্থার ওপর সমীহ তৈরি করে দেয় শ্রোতা ও ক্রেতার মনে। দীর্ঘদিন ধরে হিজ মাস্টার্স ভয়েস সম্বন্ধে বাঙালির যে একটা অধিকারবোধ সক্রিয় ছিল তার কারণ এই নয় যে, ভারতে ওই কোম্পানির হেড অফিস আর ফ্যাক্টরি কলকাতার উপকণ্ঠে দমদমে। বাঙালির কথা, সুর, ব্যথা ও মেধাকে সংযুক্ত করে বাঙালির কৃষ্টির বিকাশ ও প্রগতিতে এক মস্ত অবদান রেখেছিল এই বিলিতি কোম্পানি। উপরন্তু দীর্ঘসময় ধরে বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে এ কোম্পানি নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিল। 'রেখেছিল' বললাম কেন? এখন আর কি রাখে না? গ্রামোফোন কোম্পানির 'শারদ অর্ঘ্য' নিবেদনের হীরক জয়ন্তী বর্ষে পুজোর গান আর পুজোকে কিন্তু আর এক করে দেখা যায় না।

বাংলা আধুনিকের তথাকথিত স্বর্ণযুগে, পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয় ভাগে, পুজোর সময়ে গানের সংখ্যা যেখানে পঞ্চাশ পেরোত না, সেখানে এ বছর গানের সংখ্যা তিনশোরও ঢের ওপরে। কিন্তু এই গানগুলোকে পুজোর সঙ্গে মেলানো বড়ো কঠিন, বাঙালির পুজোর যদি কোনো 'ইথস' থেকে থাকে, কোনো ভাবধারা বলে কিছু থাকে, তার সঙ্গে এসব গানের সম্বন্ধ রচনা অসম্ভব। এসব গানের পক্ষে পুজো একটা রিলিজ ডেট মাত্র, যখন মানুষের হাতে দুটো বাড়তি পয়সা থাকে এবং পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বাজাবার জন্য একটা ধ্বনির প্রয়োজন হয়। পুজোর গান, দুর্ভাগ্যের বিষয়, এক-দেড় দশক ধরেই অবাঙালি সুরে বসা; ক-বছর হল তার কথাও অবাঙালি। 'ম্যায়নে প্যার কিয়া', 'ত্রিদেব', 'হম' ইত্যাদি হিন্দি ছবির হিট গানই এখন আধুনিক বাঙালির রেকর্ড কেনার ফর্দের শীর্ষে, এই গানই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পরিবেশ রচনা করে এবং এদের পাশাপাশি যে-বাংলা আধুনিক পুজোয় ছাপা হচ্ছে তা সুরে তো বটেই, কথাতেও এর থেকে খুব দূরে সরে থাকতে চাইছে না। যা শুনতে শুনতে ক্রমশই 'পুজোর গান' কথাটা এখন অর্থহীন, কথার কথা বলে মনে হয়।

'পুজোর গান' আসলে একটা কনসেপ্ট, একটা ধারণা। সেরা সুর, সেরা কথা, সেরা শিল্পীকে এক করে সেরা গানটা আদায় করে ছাপার কাজটা সারা হত পুজোর আগেভাগে। পুজোর মাসখানেক, মাস দেড়েক আগে থেকে রেডিয়োর 'অনুরোধের আসর'-এ আর মহালয়ার সপ্তাহ দেড়-দুই আগে থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের বাড়ির কলের গানে বেজে বেজে গানগুলো পুজোর পরিবেশ তৈরি করে দিত। রোমান্টিক, আধুনিক গানই, কিন্তু পুজোকে এতটাই মনে করে বানানো যে এরা আক্ষরিক অর্থেই পুজোর গান হয়ে উঠত। এ ছাড়া পান্নালাল ভট্টাচার্যের দেহান্ত হওয়ার আগে অবধি ফি পুজোয় কিছু ভক্তিমূলক গান নিবেদনের চেষ্টায় থাকত গ্রামোফোন কোম্পানি। অনুরোধের আসর, গৃহস্থের বসার ঘর আর প্যান্ডেলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হত যা দিয়ে। জ্ঞান গোঁসাই, ভবানীচরণ দাস, মৃণালকান্তি ঘোষ থেকে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য পর্যন্ত সে-ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। পান্নালালের তুলনাহীন গায়নে ভক্তিভাব ও আধুনিক মেজাজ এত অসম্ভব সুন্দর ভাবে মিশে যেত যে পঞ্চাশের দশকের বহু কিশোর-কিশোরীই 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল' বা 'সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি' জাতীয় গানকে আধুনিক ভেবেই শুনে গেছে, ভালোবেসে ফেলেছে, পরে কিছুদিন যেতে এরা যে শ্যামাসংগীত সেই জ্ঞান হয়েছে।

এরকমটাই ঘটেছে সলিল চৌধুরীর সুরারোপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নিবেদনে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'পাল্কির গান' ও 'রানার'-এর ক্ষেত্রে। কিংবা 'গাঁয়ের বধূ'-র মতো কোনো গানে। এগুলি কাব্যসংগীত, এবং রোমান্টিক প্রেমের গান নয়। কিন্তু এমন একটা আধুনিকতা, সোফিস্টিকেশন আছে এদের কাঠামো ও পরিবেশনে যে আধুনিক বাংলা গানের বৃহত্তর জগতে এরা অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে নিজেদের। উপরন্তু পুজোয় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বেজে বেজে এরা পুজোর গানও হয়ে গিয়েছিল অনতিকালে।

তবে পুজোর গান বলতে অবশেষে যে বিশেষ ধরনটি শেষ অবধি মাথা তুলে দাঁড়াল এবং যে-গানের মূর্ছনা থেকে আজও বাঙালি মানুষ মুক্ত হতে পারল না, তা হল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গড়ে-ওঠা নিটোল প্রেমের গান। এর এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা চলে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। গানটাকে একটা প্রেমপত্রই বলা চলে, শুধু সুরে বলা। শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের রোমান্টিক গানগুলিও আসলে এই পর্যায়ের। কিন্তু কাকে ছেড়ে কার কথা বলি? পঞ্চাশের দশকে বাংলা আধুনিকের যে-ঘরানা সেটাই রাজত্ব করেছে ষাটের দশকের দ্বিতীয় ভাগ অবধি। এই যদি ছিল বাঙালির ধ্বনির জগৎ, তো এর

সম্পূরক ছিল উত্তম, সুচিত্রা, সাবিত্রী, সৌমিত্র, মাধবী সম্পৃক্ত তার চিত্রজগৎ। দুইয়ের নাড়ির বন্ধনও ছিল অচ্ছেদ্য; হেমন্তকে বাদ দিয়ে উত্তম, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে সুচিত্রা সেন ছিল কঠিনস্য কঠিন কল্পনা।

পুজোর গানের পসারে এক কাঁড়ি ফাউ হিসেবে আমরা পেয়ে যেতাম পুজোর রিলিজ বাংলা ছবিতে হেমন্ত, সন্ধ্যা, শ্যামল, সতীনাথ, আরতি, মান্নার গান। একবার পুজোর সময় আমরা দেখেছিলাম 'সাধক বামাখ্যাপা' ছবি, যেখানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর গাওয়া খান ছয়েক শ্যামাসংগীত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শ্যামাসংগীতগুলির মধ্যে পড়ে। 'মুক্ত কর মা মুক্তকেশী' গানটি তো আধুনিক গানের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যেমন জনপ্রিয় হয়েছিল পঞ্চান্ন সনের (সম্ভবত)পুজো রিলিজ 'রানি রাসমণি' ছবির গান 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কে বা চায়'। গায়ক সেই ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। পুজো রিলিজ ছিল উত্তম-তনুজার অভিনীত ছবি 'এন্টনি ফিরিঙ্গী', যাতে মান্না দে ও সন্ধ্যার গান কৌশলী, রাগপ্রধান আঙ্গিকের হওয়া সত্ত্বেও সর্বকালের সেরা জনপ্রিয় বাংলা গানের মধ্যে উঠে গিয়েছিল। অনিল বাগচী এ ছবির কাজে বলতে গেলে তাঁর শেষ প্রমাণ রেখে গেলেন যে আধুনিক ও জনপ্রিয় এবং স্থায়ী গান হওয়ার জন্য বাংলা গানকে চরিত্রভ্রষ্ট, বোম্বাই মার্কা হতে হবে না। এর কয়েক বছর পর আরেক পুজো রিলিজ 'স্ত্রী' ছবির গানের মাধ্যমে অনিলবাবুর ধারার যাথার্থ্যই যেন প্রমাণ করলেন নচিকেতা ঘোষ আরেক গুচ্ছ নিবিষ্ঠ বাঙালি আধুনিক গান উপহার দিয়ে। যাদের জনপ্রিয়তাও অতুলনীয়। কিন্তু সেসব পুজোর দিন, গানের দিন শেষ। বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার সাহেব বৈঠকখানা বাজারে সন্তোষবাবুর পুরোনো রেকর্ডের দোকান থেকে জ্ঞান গোঁসাই, আশ্চর্যময়ী, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, ভীষ্মদেবের হারানো গান সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছেন আর গ্রামোফোন কোম্পানি জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেবের গাওয়া ও অমর করা গানগুলোকেই এখনকার আধুনিক শিল্পীদের দিয়ে পরিবেশন করাচ্ছে। জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেবের গাওয়া গান নতুন করে রেকর্ড করা ডন ব্র্যাডম্যানের বিকল্প হিসেবে ব্যাট করতে নামার শামিল।। পুরোনো ও নতুন নিবেদনসমূহকে তুলনা করে নতুন শিল্পীদের প্রতি অবিচার করা ঠিক হবে না। তবে এটা ঠিক যে এই পন্থায় রেকর্ড কোম্পানি দু-ধরনের অপরাধ করে যাচ্ছেন। পুরোনো রেকর্ডগুলোকে অমিলই রেখে দিচ্ছেন নতুন প্রজন্ম, নতুন শ্রোতা, নতুন ক্রেতার কাছে এবং নতুন শিল্পীদের দিয়ে নতুন, মৌলিক কিছু করার থেকে বিরত থাকছেন। যার ফলে বাঙালির গানের ভাণ্ডারে সংযোজনের বহর দাঁড়াচ্ছে একটা মহৎ শূন্য। বাংলা পুজোর গানে শেষ পরিকল্পনার ছাপ দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর আগে অজয় চক্রবর্তীর রাগপ্রধান

উপহারে। প্রথম তিন বছরের চমৎকার কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে-উদ্যোগ পরে কিছুটা ম্লানই হয়ে এসেছে। আমরা শুধু আশা করব এ এক অস্থায়ী পরিণতি, শিল্পী ও রেকর্ড সংস্থা এত সহজে হাল ছেড়ে দেবেন না।

গ্রামোফোন কোম্পানি ছাড়াও এক গুচ্ছের সংস্থা এখন পুজোর গান বের করছে। অন্যদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা বিশেষ নেই, কারণ তাদের হাতে প্রকৃত শিল্পী আর ক-জন? কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানির কাছেও যে কিছু প্রত্যাশা করব তারও সুযোগ বিশেষ নেই, কারণ পুজোর নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব কিছুই অবশিষ্ট নেই তাদের ধ্যানধারণায়, পরিকল্পনায়। তাদের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই একটা কথা খুব ঘুরেফিরে আসে—ওল্ড ইজ গোল্ড। কথাটা আমরাও মানি। শুধু কোম্পানির বাবুরা ওই সোনাগুলোকে মাটিতে পুঁতে রেখে ইটের ঢেলা নিয়ে খেলতে ভালোবাসেন। খেলা তো নয়, শ্রোতার কান লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা। পুজোর সময় এত বিশাল সংখ্যক বাঙালি যে বিভুঁইয়ে পাড়ি দিচ্ছে তার অনেকখানি কৃতিত্ব রেকর্ড কোম্পানির।

এবার পুজোর মরশুমে অন্তত দুটো সন্ধ্যা কাটাতে চাই মাহবুব আলম সাহেবের বৈঠকখানায়।

সেদিনও বাজবে পুরোনো গান

একবিংশ শতকীয়দের দুর্ভাগ্য— তারা গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে রবিশংকর, আলি আকবর, বিলায়েত, বিসমিল্লা, ভীমসেন যোশী, গাঙ্গুবাই হাঙ্গল কিংবা এম এস শুভলক্ষ্মী শুনতে পাবে না। এঁদের টেপ ও ডিস্ক তখনও থাকবে, জীবিত থাকলে এঁরা বার্ধক্য, প্রবার্ধক্যের সম্মান পাবেন সভায় সভায়, কিন্তু একই সঙ্গে এঁদেরকে দেখা ও শোনার যে স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা আমরা প্রায় নিয়মিতই পেলাম জীবনের অনেকখানি সময় তার থেকে মর্মান্তিক রকম বঞ্চিত থাকবে একবিংশ শতাব্দী। নিঃসংকোচে তাই বলছি, আমি একবিংশকে হিংসা করি না। একেবারেই না।

একবিংশতে যখন পৌঁছোব (যদি পৌঁছোই) তখন আমার জন্য জলসায় জলসায় রক্তমাংসে থাকবেন না হেমন্ত, লতা, সন্ধ্যা কিংবা সুচিত্রা, কণিকা, সুবিনয়। থাকবেন না তাঁর ভাঙা মন জোড়া দেওয়ার মতো সুর নিয়ে দেশের সীমানার ঈষৎ ওপারে গজলের মেহেদি হাসান। অথচ আর সব কিছুই থাকবে, সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশ বেশি-বেশি করেই থাকবে। সংগীত শোনার যন্ত্রপাতিতে দেশ ছয়লাপ হয়ে থাকবে, বোতাম টিপলেই হিংটিং-ছট, সা রে গা মা পা ধা নি, কাউয়া কাউয়া, আ গলে লগ যা, অ্যান্ড অল দ্যাট জ্যাজ। যেহেতু একসময় রবীন্দ্রসংগীতের কপিরাইট উচ্ছেদ হয়ে যাবে তাই যে-কোনো স্বরলিপি, ক্ষেত্রবিশেষে স্বরচিত স্বরলিপির ভিত্তিতে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হয়ে ওঠাতেও বাধা থাকবে না। না শিখে গান গাওয়ার এমন চলও হয়তো উঠবে যে দেশে গায়কের সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে শ্রোতার সংখ্যাকে। কিংবা এই পরিণতিকে যদি এড়ানো সম্ভবও হয় তাহলেও যা ঠেকানো যাবে না তা হল ক্রমবর্ধমান গানের মাস্টার, গানের ইস্কুল এবং গানের সমালোচকদের সংখ্যা। কাক হয়েও কাকের মাংস না গিলে উপায় নেই, কারণ যত দিন যায় ততই বুঝি সত্যিকারের মাস্টার ইস্কুল সমালোচক সত্যিকারের শিল্পীর মতোই দুষ্প্রাপ্য, যা জোটে সচরাচর তা' ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডিউস।

বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে সংগীতের এটাই সমস্যা যে তা' ক্রমশ এক ধরনের শিল্পের থেকে আরেক ধরনের শিল্পের গোত্রগত হয়ে পড়ছে। আর্ট বলতে যে-শিল্প তার চেয়ে ঢের প্রাধান্য সংগীতের ওপর ইন্ডাস্ট্রি বলতে যে-শিল্প তার। একবিংশ এখনও চোদ্দো বছর দূরে, কিন্তু ইতিমধ্যেই গানবাজনা হয়ে পড়েছে হালকা মগজের লোকদের যৌথ স্বার্থের ক্রিয়াকলাপের বিপজ্জনক ফসল। জর্জ টমসন তাঁর 'দ্য হিউম্যান এসেন্স' বইতে বেঠোফেন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায় এই একই সমস্যার কথা তুলেছেন। বলেছেন যে, সামন্ত প্রথায় বন্দি সমাজে থেকেও বেঠোফেন যে তাঁর সংগীতকে নিছক পণ্যে পর্যবসিত হতে দিলেন না এইখানেই তিনি মহৎ। আমাদের সংগীতের মহাজন যাঁরা—তানসেন থেকে ত্যাগরাজ হয়ে আখতারি বাই—তাঁরাও মহৎ এক অনুরূপ কারণে; যে-গান দিয়ে তাঁরা বিনোদিত করেছেন তাঁদের সময় ও সমাজকে সেই গান দিয়েই তাঁরা কিছুটা কিছুটা সংস্কৃতও করেছেন তাদের। প্রাচীন একটা কথা আছে, যে-গান মন ভোলায় সে-গান মন বদলায়ও। কনফুসিয়াস লিখেছেন যে, গান বোঝা উন্নত স্বভাবের পরিচয়। কিন্তু কোন গান?

আজ এক দশক ধরে যে জনপ্রিয় গান নিয়ে আমরা আছি তাই নিয়ে একটা নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ করা বেশ লজ্জাজনক ব্যাপার। যে-গানের কোনো ভবিষ্যৎই নেই তা নিয়ে ভবিষ্যতে যাই কী করে? পাশ্চাত্যে অন্তত একটা জিনিস সুষ্ঠু প্রমাণিত হয়েছে যে, কম্পিউটার নামের সবজান্তা যন্ত্রটি আর যাই পারুক সংগীত সৃষ্টি করতে একেবারেই অপারগ। পাঁচশো বছরের লাগাতার পরিশীলন ও প্রোগ্রামিঙের ফলে কম্পিউটার মহোদয় যদি নতুন করে আবিষ্কার করে ফেলেনও কেন আপেল মাটিতেই পড়ে তিনি কিন্তু তথাপি টের পাবেন না মালকোষ কেন পঞ্চমবর্জিত। বিশ্বাসের মতো গানের ক্ষেত্রেও—দ্য হার্ট হ্যাজ ইটস রিজনস দ্যাট রিজন ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। অথচ এই যন্ত্রবুদ্ধির কাছেই সংগীতকে সমর্পণ করার এক মস্ত হাওয়া এদেশে বিদেশে। যে পাশ্চাত্য মার্গ সংগীতের বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছিল ক্রোদ দেবুসির অবিস্মরণীয় 'ইম্প্রেশনিস্ট' মিউজিক দিয়ে, যার ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রসার হয়েছিল মোরিস রাভেল, আর্নল্ড শ্যোনবার্গ, বেলা বার্টক বা ইগর স্ট্রাভিনস্কির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেই সংগীতই এখন একবিংশ শতকে উৎরোতে চাইছে ইলেকট্রনিক ও অ্যালিয়াটোরিক মিউজিক নিয়ে। ইলেকট্রনিক তো গেল যন্ত্রের দাপাদাপি, আর অ্যালিয়াটোরিক? এ হল পাশার ঘুঁটির দান ও অনিশ্চয়তা দিয়ে স্থির করা পরবর্তী সুরের মূর্ছনা, সিকোয়েন্স কী হবে। ইদানীং রেকর্ড কোম্পানিরা যেসব গান নিয়ে ডিস্ক করেন এবং যেভাবে কপাল ঠুকে

একেকটি রেকর্ডের পিছনে লাখ লাখ টাকার প্রচার ঢালেন তাতে সন্দেহ হয় যে অ্যালিয়াটোরিজমের এক প্রকারান্ত প্রভাব এখানেও লেগেছে।

সাহিত্যের মতো গানও রাতারাতি বিশ দফা কর্মসূচি ফেঁদে নতুন করে তৈরি করা যায় না। চাক বা না-চাক, একবিংশকেও শুনতে হবে বিংশ শতকের গান। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন, কোন গান? হাফিজ আলির সরোদ না তালাত আজিজের গজল? মেহেদি হাসান না নাজিয়া হাসান? পুরোনো কলকাতার বৈঠকি গান না ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার? পালুসকর না অনুপ জালোটা? লতা মঙ্গেশকর না উষা উত্থুপ? দেখেশুনে মনে হচ্ছে সাহিত্যের মতোই আমাদের অতীত গানই আমাদের ভবিষ্যতের সংগীত, পুরাতন ধ্বনি যেসব দিনে দিনে হয়েছে সোনা তাই হবে আগামী দিনের প্ল্যাটিনাম। আমি চোখ বুজলেই যেমনটি শুনতে পাই হেমন্ত গাইছেন 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে', লতা গাইছেন 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে', সন্ধ্যা গাইছেন 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু', কী মানবেন্দ্র জানাচ্ছেন 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি', তেমনই একবিংশ শতকের কোনো যুবা মেদুব দুপরে কলকবজার খটখটানির ভিড়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনবে এইসব গান আর ধন্যবাদ দেবে বিজ্ঞানকে যা বহুযুগের ওপার থেকে তার কানে তুলে এনে দিয়েছে এই ধ্বনি। যেমন ব্যবস্থা ছিল না বলে আমরা সম্পূর্ণত ধরে রাখতে পারিনি মৈজুদ্দিন খাঁ-র ঠুম্‌রি, ভাইয়াসাহেব গণপত রাওয়ের ঠুম্‌রি, গহরজানের লুপ্ত গান, উজীর খাঁ-র অশ্রুত বীণা।

পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট সরকার বহাল থাকলে গণসংগীত আরও ছড়াবে। যদি ছড়ায় তাহলে গাঁয়ের বধূও একদিন গাইতে পারবে সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত গান। আরও সুদূরপ্রসারী হবেন সেই সুবাদে সুকান্ত, হেমন্ত। বাকি অনেক গণসংগীতজ্ঞই যে গীতিকার, সুরকার বা গায়ক নন তাও ধরা পড়বে। বিস্তার নেবে (বামপন্থীরা থাক বা না-থাক) সূক্ষ্ম অলংকারে সাজানো শচীনদেব বর্মনের পল্লিগীতি, নির্মলেন্দুর কিছু কিছু ভাটিয়ালি। যদি জনরুচির উত্তরণ হয় তবে জনসাধারণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে 'এন্টনি ফিরিঙ্গী'র পরবর্তী বাংলা ছবির গান। তাদের শুধুই মনে পড়বে 'অগ্নিপরীক্ষা', 'শাপমোচন', 'রানি রাসমণি', 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'পলাতক', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির গান। মনে পড়বে, 'আনারকলি', 'মুঘল-এ-আজম', 'পাকিজা', 'মেরে মেহবুব', 'মেরা সায়া', 'আর্জু' ইত্যাদি ছবিকে। ভিডিয়ো ক্যাসেটে তারা তাই দেখবে আর শুনবে। ঋত্বিক ঘটক এখনকার মতো তখনও থাকবেন 'কাল্ট ফিগার', কিন্তু তাঁর ছবির প্রতিটি ফ্রেম মুখস্থ হয়ে যাওয়ার পবও লোকে তাঁর 'মেঘে ঢাকা তারা' ও 'সুবর্ণরেখা' দেখবে গানেব টানে। আমার ধারণা একবিংশ শতাব্দী আমাদের চেয়েও অধিক নির্ভরশীল হবে আমাদের সময়কার গানের

টানে। আমার ধারণা একবিংশ শতাব্দী আমাদের চেয়েও অধিক নির্ভরশীল হবে আমাদের সময়কার গানের ওপর, কারণ ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে যে-সুরহীন গানের চর্চা আমরা চালু করেছি সেই জুলুমের আসল ভুক্তভোগী ওরা। আমরা পঞ্চাশ বছরের সাংগীতিক নৈরাজ্যের বীজ বপন করে বসে আছি ইতিমধ্যেই।

আমার আশঙ্কা আশঙ্কামাত্র হলেই বাঁচি। আমি মারুতি বা স্ট্যান্ডার্ড ২০০০-এর লোভে একদিনও বেশি বাঁচতে রাজি নই। কিন্তু আমি আমার পুরোনো গানের রেকর্ডসমূহ নিয়ে নতুন যুগে পৌঁছোতে চাই। আমি ২০০১ সালেও দারুণ ফর্মে পেতে চাই ঋতু গুহ, বুধাদিত্য, জাকির হুসেন ও অজয় চক্রবর্তীকে। উৎকর্ষের চরম শিখরে দেখতে চাই কন্ডাক্টর জুবিন মেটাকে। নতুন করে পেতে চাই 'আব্বা' সম্প্রদায়, হুলিও ইগলেসিয়াস, বারবারা স্ট্রাইসান্ড, জোন কলিন্সকে। আর একবিংশ শতাব্দী যদি আমার সব আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণ করে তবে আমি সহর্ষচিত্তে সেই নতুনদের দলে ভিড়ে গোপনে লালন করব আমার গচ্ছিত স্মৃতিধন। কবি ব্রাউনিংয়ের সেই 'আহ্! ডিড ইউ সি শেলি প্লেন?'-এর মতো গভীর রোমাঞ্চ থাকবে যে আমি আমীর খাঁ, রবিশংকর, আলি আকবর, বিলায়েত খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়দের চিনতাম। বস্তুত এঁরা আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন, হেসেছিলেন, আমায় একটু বসতেও দিয়েছিলেন তাঁদের পাশে। এই অতীত নিয়েই আমি একবিংশ শতকীয় হয়ে উঠব।

এত সুর আর এত গান

বাংলা আধুনিকে আমার দুটো ধাঁধা আছে আজও। গীতা দত্ত আর তালাত মাহমুদ।

পঞ্চাশের দশকে যখন অনুরোধের আসরের দাসানুদাস হয়ে আছি, তখন এ-দুজনের নাম ঘোষণা হলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হত। তালাত মাহমুদের নামে রোমাঞ্চ হওয়ার কারণটা এই যে, মধ্য কলকাতার ক্রিক রো পাড়ায় আমাদের বাড়ির ছাতে দাঁড়ালে পিছনে ক্রিক লেনে একটা চারতলা বাড়ি চোখে পড়ত। বড়োদের কাছে শুনতাম বোম্বাই গিয়ে নাম করার আগে তালাত মাহমুদ ওই বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু এই খবর কেউ দেয়নি যে তালাত মূলত লখনউয়ের লোক, কলকাতায় সাময়িক বাসিন্দা ছিলেন। ওই এক টুকরো খবরের ফল এই ছিল যে, ছাতে কোনো কাজে বা অকাজে গেলেই আপনা থেকে চোখ চলে যেত হয় ঘুড়ির দিকে নয়তো তালাত মাহমুদের এককালের বাড়ির দিকে। 'তুমি সুন্দর যদি নাহি হও' গানের গূঢ় রোমান্টিকতা বোঝার বয়স তখনও হয়নি, কিন্তু 'তালাত মাহমুদ আমাদের পিছনের রাস্তায় থাকতেন' বলে রেলা নেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

গীতা দত্তের প্রতি টানটা একটু অন্য ভাবে দানা বেঁধেছিল। ওঁর অদ্ভুত সেনসুয়াস (এই ব্যাপারটা যে কী, তা না-জেনেও ছেলেমানুষরা কিন্তু এর নির্ভুল আঁচ পায় একটা বয়সে) হিন্দি গানগুলো শুনে বেশ অবাক-অবাক ঠেকত আর পবিত্র, রোমান্টিক মেজাজের বাংলা গান শুনে ভাবতাম এই দু-ধরনের গান বেরোয় কী করে একই গলা থেকে। 'পবিত্র, রোমান্টিক' কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহার করলাম কারণ 'হারানো সুর' ছবির 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার' আর বেসিক রেকর্ডের 'ঐ সুরভরা দূর নীলিমায়' শুনে এরকম একটা ভাব হয়েছিল আমার মধ্যে। পত্রপত্রিকায় গীতার ছবি দেখেও প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম মহিলার; বাচ্চারা যেমন প্রেমে পড়ে। কিন্তু শেষ সর্বনাশটা হল ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায়। 'ঘরোয়া' পত্রিকায় বিমল মিত্র ধারাবাহিক স্মৃতিকথা 'বিনিদ্র' লিখছিলেন। বম্বেতে পরিচালক গুরু

দত্তের 'সাহেব বিবি অউর গুলাম' ছবির জন্য চিত্রনাট্য লেখার দিনগুলির স্মৃতি। তাতে এক অনুপম চরিত্রচিত্রণ আছে গীতা দত্তর। গুরু তখন তাঁর নায়িকা ওয়াহিদা রহমানের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, অথচ স্ত্রী গীতার প্রতি গভীর ভালোবাসা। রোজ রাতে বিমলবাবু দেখেন গীতা বারান্দায় পায়চারি করছেন নিঃসঙ্গ; মধ্যরাতের কোনো এক সময় নেশায় বেঁহুশ গুরুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন শোয়ার ঘরে। জায়গাগুলো যখন পড়ছি, বুক ঢিপ ঢিপ করছে আমার, আর চোখের সামনে অনবরত ভেসে উঠছে 'হারানো সুর' ছবিতে অসুস্থ উত্তমকুমারের গলায় প্রেমের মালা পরিয়ে সুচিত্রা সেন গাইছেন 'তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার।'

বাংলা আধুনিক গানের এই এক আশ্চর্য মাহাত্ম্য যে রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদী ইত্যাদির পাশাপাশি এরও কিছু কিছু বাণী ও সুর আমাদের সুখ দুঃখ, স্মৃতি ও রোমাঞ্চের অঙ্গ হয়ে গেছে। এমনটা যে হয়েছে তার একটা কারণ যেমন সুর ও কথা, আরেকটা কারণ হল কিছু মানুষ যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যেমন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র কিংবা সলিল চৌধুরী। এঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতন করেই আকর্ষণীয়, কিন্তু এঁদের প্রত্যেকেরই চরিত্রের একটা সাধারণ সুর ছিল। নিপাট মধ্যবিত্ত বাঙালিয়ানা। তালাত মাহমুদ আর গীতা দত্ত এই মধ্যবিত্ত বাঙালিত্বের থেকে আলোকবর্ষ দূরত্বে; বস্তুত বাঙালিত্ব ব্যাপারটাই ওঁদের মধ্যে অনুপস্থিত (তালাত তো বাঙালিও নন)। কিন্তু বাংলা গানে ওঁরা এমন এক কণ্ঠের স্বাক্ষর রাখলেন যা এক কথায় অবিস্মরণীয়। আবার বলছি, যা আগেই বলেছি, গীতা আর তালাত বাংলা আধুনিকে দুটি ধাঁধার মতো আমার কাছে।

গীতা দত্তর গানের চলনের মধ্যেই একটা ধাঁধা আছে। ওঁর গলায় একটা নাট্যময়তা চিরকাল লক্ষ করেছি যা আধুনিক বাংলা বা হিন্দিতে আর কারও মধ্যে খুঁজে পাইনি ওই পরিমাণে। এ ব্যাপারে ওঁর নিকটতম কণ্ঠ—যদিও ব্যবধান অনেক—কিশোরকুমার। প্রকৃত তুলনা কিন্তু ওঁর লাইট ক্ল্যাসিকালের বেগম আখতারের মধ্যে। গানের কথাকে সংলাপের মতন করে, তাতে একটা সেনসুয়াস, সময়-সময় সেনসুয়াল বা যৌন আবেদন সঞ্চার করে, বাণীকে যতখানি সম্ভব অন্তরঙ্গ করে উচ্চারণ করার এই চলন ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নিবে গেল গান থেকে। হিন্দি ছবিতে ভ্যাম্পদের নশেলি গানে ওঁর ধারায় গাইবার চেষ্টা করেছেন আশা ভোঁসলে। আশা নিঃসন্দেহে অতি অসাধারণ গায়িকা, কিন্তু গীতার স্টাইলের অনুকরণে ওঁর ওই গানগুলোকে আমার গীতার ক্যারিকেচার বলেই মনে হয়। বলতে নেই, বাংলা আধুনিকেও যে নিষ্পাপ রোমান্টিসিজম এনেছিলেন গীতা, তা ওঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে শেষ হয়ে গেল।

গীতা বাঙালি, কিন্তু বাংলা গানে ওঁর একটা অবাঙালি বাঙালিত্ব আছে। ওঁর কণ্ঠের যে husk, চাপা ওজন, আবার তার পাশাপাশি ফুলেল, উড়ন্ত সুরেলা ভাব তা আর কারও গলায় পাইনি। রাগধর্মী সুর আর সৃষ্টিশীল, আধুনিক ঠমক-ঠামকের সুর, এই দুই বিপরীতেও প্রায় অক্লেশে সারাক্ষণ যাতায়াত করত ওঁর গলা। রেডিয়ো সিলোনে ওঁর হিন্দি গান শোনার পর অনুরোধের আসর বা 'ছায়াছবির গান'-এর অনুষ্ঠানে ওঁর বাংলা গান শুনে আমরা ভাবতাম কোনটা আসল গীতা দত্ত।

এই প্রশ্নের উত্তরই কিছুটা দিয়েছিল বিমল মিত্রের 'বিনিদ্র' ধারাবাহিক। উত্তরটা এরকম : গীতার সব গানেই একটা বেদনার স্পর্শ আছে। খুব আনন্দের গান, যেমন 'ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে'— গাওয়া হয়েছে শুধু স্ফূর্তিতে নয়, একটু নওছল্লার সুরেও, যা ভ্যাম্পের কণ্ঠেই শোভা পায়। আবার ভ্যাম্পের কণ্ঠ হল কিছুটা ট্র্যাজেডির, বিষণ্ণতার কণ্ঠও। যা একটা জায়গায় এসে ঘোরতর রকম মিলে যায় রোমান্টিসিজমের বিরহমধুর মূর্ছনার সঙ্গে। ইয়ার্কি এবং বেদনার যে সুন্দর মিলন গজলে (স্মরণ করুন বেগম আখতারের গান) সেই ভাবের ও রসের এক সুন্দর সহবাস গীতার কণ্ঠে। এতটাই যে গীতার কণ্ঠ প্রকৃতপক্ষে গান-নিরপেক্ষ। গীতার গাওয়া গান দিয়েই ওঁর কণ্ঠস্বরূপ বোঝানোর দরকার হয় না, ওঁর কণ্ঠ সেভাবেই আলোচ্য যেমনভাবে আলোচ্য আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, আমির খাঁ কি বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র কণ্ঠ। কোনো রাগ, খেয়াল-বন্দিশ বা ঠুমরির প্রসঙ্গ তুলতে হয় না সারাক্ষণ এঁদের কণ্ঠ আলোচনার জন্য। আধুনিক স্তরে এরকম দুটি কণ্ঠের কথাই আমি ভেবে বার করতে পারি—গীতা দত্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

ওঁর গানের এই ট্র্যাজিক মূর্ছনা ওঁকে জীবনেও তাড়া করে ফিরেছে। গুরু দত্তের মৃত্যুর পর গীতা কলকাতায় বহু জলসায় এসে বাংলা আর হিন্দি গান গেয়েছেন। কিন্তু গুরুর মৃত্যুতে ওঁর জীবনের খেই হারিয়ে গিয়েছিল, তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন পানীয়ে। আর আমরা যারা ছিলাম পঞ্চাশের দশকের জলসা-পোকা তারা ষাটের শেষ পাদের এই অনুষ্ঠানগুলোয় যাওয়ার সাহসই পেতাম না। কারণ স্বপ্নের গায়িকা তখন নিজেই নিজের গানের ক্যারিকেচার গেয়ে যাচ্ছেন। আমার এক বন্ধু তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যালে নিয়ে গিয়েছিলেন গীতাকে, কিন্তু অসুস্থ শিল্পীকে স্টেজ অবধি তুলতে পারেননি। ভালোবাসা—যা ছিল তাঁর গানের উৎস ও প্রাণ তা-ই ততদিনে জীবন ও গানের বিষ হয়ে উঠেছে। অতি অকালে গীতা দত্তের মৃত্যু হল যখন তার মধ্যেই তিনি একটি পরিপূর্ণ লেজেন্ড। শুধু গান নয়, ভালোবাসারও প্রতীক।

লখনউয়ের ভাতখণ্ডে সংগীত মহাবিদ্যালয়ের চত্বরে ঘুরছিলাম। ওখানকার এক অধ্যাপক বেশ গর্বের সঙ্গে বললেন, 'এখানকারই তো ছেলে তালাত মাহমুদ। যাঁর মতো গজল খুব বেশি লোক গাইতে পারেনি।' খুবই সত্যি কথা, তবে অবাঙালি ভদ্রলোককে বোঝাবার উপায় ছিল না যে, ওঁর মতো ভালো রোমান্টিক বাংলা গানও খুব বেশি লোক গায়নি। গীতা দত্তর মতো তালাত মাহমুদেরও সুন্দর চেহারার ছাপ ছিল ওঁর গানে। ওঁর গলার আওয়াজটাই ছিল নিপাট রোমান্টিক ভালো মানুষের। বাংলা উচ্চারণ এতটাই নির্দোষ যে রেকর্ড কোম্পানি ওঁর একটা বাংলা নামকরণও করেছিল—তপন কুমার। যেটা আমাদের—ওঁর ভক্তদের একেবারেই পছন্দ ছিল না। যে লোক হিন্দিতে 'জ্বলতে হ্যায় যিসকে লিয়ে' ('সুজাতা' ছবির গান) গাইতে পারে তাঁর আবার নামবদলের প্রয়োজন কী? আমরা যারা তালাত মাহমুদকে পাড়ার লোক জ্ঞান করতাম তাদের কাছে ওঁর শান্ত, সুরেলা, নম্রমধুর হিন্দি গানকেও বাংলা গানের প্রকারভেদ বলে মনে হত। সত্যি বলতে কি, 'জ্বলতে হ্যায়' আর 'তুমি সুন্দর যদি'-র মধ্যে বিশেষ তফাত খুঁজে পেতাম না।

আসলে কী বম্বেতে, কী কলকাতায় তালাত মাহমুদের গানের মধ্যে একটা লোকই কথা বলে যেত—একজন দরদি প্রেমিক। তালাতের দুঃখের গানগুলোর মধ্যেও ততটা দুঃখ পাইনি কখনও, যতটা স্মৃতির আবেশ। ইংরেজিতে যাকে বলে crooning, তালাতের গানে সেটা ছিল। নম্র কণ্ঠে প্রেয়সীকে আত্মনিবেদন। গানে দৌড়োদৌড়ি নেই, অলংকারের আস্ফালন নেই, অযথা নাটকও নেই। এক দুরু-দুরু বক্ষ ভদ্রমানুষের হৃদয়ের আর্তিই ছড়িয়ে পড়ে ওঁর গানে। এরকম নিবেদনের এক সুন্দর উদাহরণ 'যেথা রামধনু ওঠে হেসে আর ফুল ফোঁটে ভালোবেসে' গানটি।

আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না এই তালাত মাহমুদকে বাংলা ছায়াছবিতে গাওয়ানোর চেষ্টা হল না কেন। কারণ হেমন্তর মতন তালাতের মধ্যেও একটা অভিমানী মধ্যবিত্ততার স্বর ও ব্যক্তিত্ব ছিল। ওঁর গাওয়া উর্দু গজল শুনতে শুনতেও বারবার এ কথা মনে হয়েছে আমার। কবিতার সমস্ত ছবিটাই ফুটে ওঠে ওঁর নিবেদনে। 'তুমি সুন্দর যদি' গানের এই পঙ্‌ক্তি 'প্রিয়ার সে রূপ সে-ই জানে যে কখনো ভালোবাসে' বাংলা আধুনিকের অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলির একটি হয়ে থাকবে কণ্ঠ ও বাণীর অলৌকিক, যৌগিক মিলনের কারণে। অথচ হঠাৎ করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কেন যে তালাতের বাংলা গান বন্ধ হল তা আজও রহস্য।

শচীনদেব বর্মনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ও অনুরোধের আসরের মাধ্যমে নয়, আরও সাবেক কালের বাংলা রাগপ্রধানের ৭৮ আরপিএম রেকর্ডের মাধ্যমে। বস্তুত; বাবা-কাকার আমলের সেরা শিল্পীদের মধ্যে যে-ক'জন

আমাদের সময়কার অনুরোধের আসরেও জাঁকিয়ে বসেছিলেন তাঁদের একজন শচীনকর্তা। রেডিয়োতে ওঁর গান হলে বয়োজ্যেষ্ঠদের খড়ম-পায়ে থমকে দাঁড়াতে দেখতাম। অনুরোধের আসরের ঘোর সমালোচক এঁরা ওইটুকু সময়ের জন্য আমাদের সঙ্গী হতেন। অনুরোধের আসরের গানগুলি অবিশ্যি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের রাগপ্রধান ছিল না, ছিল পল্লিসুরভাঙা অপূর্ব সব রসিক-প্রেমিক গান। 'নিশীথে যাইও ফুলবনে, রে ভ্রমরা,' 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা মন নিলা রে', 'টাকডুম, টাকডুম বাজে', 'আমি ছিনু একা,' 'ও ডুব ডুব ডুব মনযমুনায়' ইত্যাদি গানই তখন অনুরোধের গানের শ্রোতাদের উৎকর্ণ করে রাখত, রোমান্টিক গানের মধ্যে হঠাৎ এক ঝলক সুনীল আকাশ, সবুজ মাঠের গ্রামের হাওয়া বয়ে আনত।

অথচ অনুরোধের আসরের এই শচীনদেবও কিন্তু গীতা ও তালাতের মতো তখন বম্বে ফেনোমেনন। পর্দায় আমরা তাঁর সুর-করা হিন্দি ছবি দেখছি, 'পিয়াসা', 'সোলভা সাল', 'সি আই ডি', কি আরও আগেকার 'জাল' ছবির গান আমাদের মাথায় ঘোরে আর আমরা চমকের সঙ্গে আবিষ্কার করি যে, ওই সব হিন্দি ছবির গানেও একটা পূর্ববঙ্গের বাউল-ভাটিয়ালির আবেশ ছড়িয়ে রাখেন তিনি দর্শক ও শ্রোতার অগোচরে। এই বাউলের বিস্তার দিন-দিন প্রকট হচ্ছিল এবং, অবশেষে, 'গাইড' ছবিতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করল। ফলে যে-শচীনদেবকে অনুরোধের আসরে আমরা নিয়মিত শুনতাম তাঁকে সুন্দর ভাবে মিলিয়ে নিতে পারলাম যখন তিনি বাংলার পল্লিসুরকে হিন্দি ছায়াছবির গানের প্রায় মূলসুর বানিয়ে ফেলেছেন।

বয়সে প্রবীণ হলেও অনুরোধের আসরে শচীনদেবের ভাবমূর্তিটি কিন্তু খুব জোরালো ভাবেই তরুণ ছিল। প্রথমত কথা; আমাদের বালককর্ণে 'নিশীথে যাইও ফুলবনে'-র রসপ্যাঁচ রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ছিল। দ্বিতীয়ত ভাব; রসের কথাকে পল্লিগানের নাটকীয়তা ও প্রক্ষেপণের মোচড়ে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রহস্যে তুলে ধরতেন শিল্পী। নানান ছন্দের কৌশলে ও উচ্চারণের মেজাজে শুধু পল্লিভাব নয়, একটা দুর্বোধ্য আধুনিকতারও স্বাক্ষর রাখতেন তিনি গানে। পল্লিগান যে চিরকালের আধুনিক গান ওই জ্ঞানটা আমাদের মধ্যে প্রথম ছড়ালেন শচীনদেব বর্মন।

এবং ওঁরই গানের সূত্র ধরেই বলতে গেলে আমরা আবিষ্কার করলাম আরও একজন আশ্চর্য শিল্পীকে, যাঁকে সর্বকালেরই এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি গাইয়ে বলে মনে হয় আমার এখন। অখিলবন্ধু ঘোষ। যাঁর মধ্যে পল্লিসুর, রাগসুর এবং আধুনিক সুর মিলেমিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। আমার মতো সমান অবাক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে, এত বড়ো একজন শিল্পী তাঁর প্রকৃত মূল্য কেন পেলেন না জীবৎকালে।

অথচ এই না-পাওয়াটার কোনো ব্যাখ্যা নেই। অনুরোধের বিচারে 'পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে'-র গায়ক খুব একটা কম যাননি কারও চেয়ে। উপরন্তু সে-যুগের শ্রোতা যেটা তখন ধরে উঠতে পারেননি তেমন কিছু রহস্যময় গায়নকৃতি তিনি আকছার ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর গানের এখানে-ওখানে। গাইছেন আধুনিক, কিন্তু তার মধ্যেই চোরাগোপ্তা ভাবে বিস্তার করেছেন উচ্চাঙ্গীয় অলংকার ও কণ্ঠমেজাজ। কত সরল ভাবে গাওয়া 'কবে আছি, কবে নেই ধরণীর খেলাঘরে', কি 'ওই যে আকাশের গায় দূরের বলাকা উড়ে যায়' কিংবা 'ও দয়াল বিচার করো', কিন্তু ওই সারল্যের ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম মীড়, মুড়কি কিংবা 'ও দয়াল' গানে পল্লিগানের রসময় ছন্দ সেগুলিকে আর পাঁচটা গান থেকে কত আলাদা করে দেয়। অখিলবাবুর জোর ছিল সুর ও লয়ের ও তালের মিলমিশ, আর সবটাই তিনি ধরে রাখতেন কারুকার্যময় কণ্ঠে, যদিও সেইসব কারুকার্যকে সরলতার লাবণ্যে ঢেকে রাখাই ছিল কণ্ঠের কাজ। বয়ঃভারে যখন নুইয়ে পড়েছে অখিলবাবুর শরীর, তখনও এই কণ্ঠ ছিল সমান রসময় ও সাবলীল। ঝোঁকফাঁকের নিপুণ বাঁধুনিতে ধরা গানকে যে অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি শেষ দিন অবধি গেয়ে গেলেন তা এক কথায় বিস্ময়কর। দুঃখের বিষয় কিন্তু বোদ্ধা শ্রোতা ছাড়া অখিলবাবুর গানের গভীরতা ঢাকা পড়ে রইল সবার কাছে। ফলে এক কালের জনপ্রিয় শিল্পী পরে দীর্ঘদিন ধরে রয়ে গেলেন বুদ্ধিজীবীদের গায়ক। সেই পরিস্থিতির মনে হয় পরিবর্তন হচ্ছে এতদিনে। অখিলবাবুর মরণোত্তর খ্যাতিবৃদ্ধির আর কী কারণ থাকতে পারে না হলে?

বম্বে হাতছানি দিয়েছিল সুবীর সেনকেও। সাময়িক মধুচন্দ্রিমা, কিন্তু ওই ফাঁকেই 'কাঠপুতলি' ছবির প্লেব্যাক আর্টিস্ট ওঁর বাঙালি ভক্তদের কাছে 'বম্বে-আর্টিস্ট' হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিক রো-র ভানু বোসের বিখ্যাত ফাংশানে যখন সুবীর গাইলেন 'দিল মেরা এক আস কা পঞ্ছি' তখন কিন্তু ওঁর ভক্তদের মনে গুঞ্জরিত হচ্ছে ওঁর অসাধারণ রোমান্টিক সব নিবেদন যা ওঁকে বছর কয়েকের মধ্যে একজন মেজর আর্টিস্টের সম্মান দিয়েছিল। ওঁর বিলিতি মেজাজের নম্র-গভীর কণ্ঠ (যার একটা আত্মিক সাদৃশ্য আছে হেমন্তর কণ্ঠের সঙ্গে) এবং এক অসামান্য rendering ওঁকে অচিরে এক প্রিয়তম গায়ক করে তুলেছিল বাঙালির। ভদ্র, পুরুষালি নিবেদনের আরেক মজা ছিল সুর ও কথার স্মরণীয়তা। কোনো গান জনপ্রিয় হওয়ার এক প্রধান শর্ত হল memorability, অর্থাৎ সেটি যেন সহজেই স্মরণে আসে। কিন্তু সুবীরের গানের স্মরণীয়তা বৃদ্ধি করেছিল সেগুলির অন্তরঙ্গতা এবং trendiness! জিম রিভস, বিং ক্রসবি, ফ্যাঙ্ক সিনাট্রা, পল অ্যাংকা কি প্যাট বুন শুনছিলেন

যে তরুণ, mod সমাজ তাঁদেরও কান ভরিয়ে তুলতে লাগল সুবীরের গান। অথচ ওঁর গান বিলিতি গানের সুর চুরি করে নয়, কোনো উগ্র-আধুনিক কথার জাল বিস্তার করে নয়, পাশ্চাত্যের pop-এর সঙ্গে কোনোরকম আপস করে নয়। সম্পূর্ণ বাঙালি এবং স্বাধীন এই গানগুলি কিন্তু অদ্ভুত বিলিতি এক মেজাজ বহন করে আনত আমাদের মনে। এবং আজও আনে।

'এত সুর আর এত গান', 'মোনালিসা তুমি কে' কিংবা 'তোমার হাসি লুকিয়ে হাসে' ইত্যাদি গান নিটোল প্রেমের গান নয়, কিন্তু এরা সেরা রোমান্টিক গান কারণ একটা বিরহমধুর প্রকৃতিভাবনা এবং রহস্যময়তা আছে এই গানগুলোয়। যে-কোনো আসরে গাইবার ও শোনার উপযুক্ত এই গানগুলোর সেরা আকর্ষণ এদের dignity (ইংরেজি এই শব্দটার ঠিক যুৎসই প্রতিশব্দ পাওয়া গেল না বলেই ইংরেজি শব্দটাই রেখে দিতে হল।) রোমান্টিক পুরুষের যে dignity সেই মর্যাদা সুবীরের কণ্ঠে ও গানে খেলা করে। সুবীর যেন এক শহুরে বাউল, যে উদাসভাবে প্রকৃতি ও প্রেমের কথা শোনায় বিষয়ী, বধির মানুষকে। আর তার অস্ত্র? ধীর, গম্ভীর কণ্ঠ, স্বরের আঁশ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সহজ ভঙ্গি এবং যৎসামান্য গলার ভাঁজে ও কাজের মাধ্যমে একটা pathos বা বেদনা সঞ্চারের ক্ষমতা। সুপুরুষ চেহারা, মার্জিত ভঙ্গি এবং নিবেদনের মাধুর্যে জলসাতেও যাকে বলে 'হিট' ছিলেন সুবীর। কিন্তু অনুরোধের আসরের বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবীরও যেন সরে গেলেন মূল মঞ্চ থেকে? কেন, জানি না। সহৃদয় এই বন্ধু-মানুষটিকে জিজ্ঞেস করব-করব করেও কখনও করে উঠতে পারিনি। 'এত সুর আর এত গান'-এর মতো অমর গানের গায়ককে এমনতর রূঢ়, বাস্তব এবং অবান্তর প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না। চার ডজন গানের জন্যই যদি কেউ অমর হয়ে উঠতে পারেন সে তো তাঁর কৃতিত্বই। সেই অমরত্ব নিয়েই আমাদের খুশি থাকা কর্তব্য।

এখন প্রশ্ন, এই বিশেষ পাঁচ জনকে নিয়েই কেন লিখলাম। উদ্দেশ্য একটাই: এক অখিলবাবুকে বাদ দিলে বাকিরা সব বম্বের একটা তক্‌মা বহন করেছেন। এঁদের কাউকেই (অখিলবাবু সমেত) কলকাতার ফাংশনে আমরা তেমন করে পাইনি (সুবীরকে পেয়েছি, কিন্তু পরে) এবং অনুরোধের আসরের আলোচনায় এঁরা বরাবরই একটু উপেক্ষিতই থেকেছেন। অথচ এঁদের ছাড়া অনুরোধের আসর ভাবাও যায় না। এবং এটাও উল্লেখ্য, যত দিন যাচ্ছে এঁদের গানের গুরুত্ব তত বেশি করে নজরে আসছে শ্রোতার। অনুরোধের আসরের যে নস্টালজিয়া তা এত বেশি করে ছড়িয়ে এঁদের গানে ও জীবনে যে এই লগ্নে এঁদের কথা স্মরণ করেও বড়ো তৃপ্তি হচ্ছে।

বাঙালি জীবনে হেমন্ত

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বই করতে গিয়ে এমন কিছু কিছু ব্যাপার দেখলাম যাতে ওঁর গানের চেহারাটা আরও স্পষ্ট হল। কী ভীষণ চাপা মানুষটা! দুঃখে ভিজে আছে ভেতরটা, কিন্তু বাইরেটা ফুরফুরে প্রসন্ন। নিত্যদিন নতুন নতুন সম্মান আর নতুন নতুন ব্যথা পাচ্ছেন। সম্মানের জন্য কৃতজ্ঞ হচ্ছেন, যাকে যতটুকু ধন্যবাদ দেবার দিচ্ছেন, কিন্তু দুঃখ বাঁটছেন না। দুঃখ জমিয়ে তোলার ব্যাপারে কী কৃপণ! কী কৃপণ! প্রথম-প্রথম ভাবতাম এও বুঝি ওঁর এক অহমিকা। বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করাই তো স্বাভাবিক, তাতে মন হালকা হয়। 'যাকগে! যাকগে!' করে কি এসব জিনিস কাটানো যায়? না কাটে? কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করে কোনো সাড়া পেতাম না। এমনও ভেবেছি, এ হল এক অভদ্র ভদ্রতাবোধ। কিন্তু যতদিন গেল নিজের ভুলটাই বুঝলাম। ইমেজ রাখতে নয়, হেমন্তদা দুঃখ জমান গানে ঢালতে। এত এত চিরস্মরণীয় গান উনি গাইতে পারলেন কারণ গানকে—যার কথা অন্যের, প্রায়শ সুরও অন্যের—হেমন্তদা ওঁর রুচি, পরিমার্জনা, দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, বিরহ, প্রেম, আত্মপ্রকৃতি ও জীবনের প্রকাশ মাধ্যম করেছিলেন। গানে গানে উনি ওঁর আত্মজীবনী লিখে গেছেন। তাই ওঁর আত্মজীবনীর নামকরণ প্রায় জোর করেই (কারণ নিজের সম্পর্কে কোনো বড়ো কথা উনি কোনো দিনই মুখ ফুটে বলতে পারতেন না) করেছিলাম ওঁরই গাওয়া এক গানের লাইনের অংশ দিয়ে—'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'। বইটাই প্রমাণ, হেমন্তদা নিজের জীবন ও গানের সম্পর্কে কোনো বড়ো কথা বলে ফেলতে পারলেন না। একবার শুধু একটা জাবদা খাতা হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এতে মা ওঁর স্মৃতিকথা লিখে রেখেছেন। দ্যাখো যদি কিছু উদ্ধার করতে পারো। তো সেই খাতার একখানে দেখলাম মা নীরব আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে দৃপ্ত বিশ্বাসে লিখেছেন, জানি একদিন হেমন্তর ছবিও বসবে কে এল সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মনের ছবির পাশে। যখন লিখছেন এ কথা তখন হেমন্তদার হয়তো খানকয়েক রেকর্ড প্রকাশ পেয়েছে, আর নিয়মিত গাইছেন

রেডিয়োতে। পুত্রের বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা এরকম আর কিছু গুণগ্রাহীর মুখে হয়তো শুনছেন হেমন্তর ভগবদ্‌দত্ত কণ্ঠের প্রশংসা। বাকিটা মায়ের অন্ধ বিশ্বাস ও স্নেহ। সৌভাগ্যবতী তিনি, দীর্ঘায়ু হয়ে ছেলের বিপুল সাফল্য ও সম্মান তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই কথাটা বলাতেও কত কুণ্ঠা ছিল হেমন্তদার! তাই মুখে না-বলে খাতাটাই তুলে দিয়েছিলেন হাতে।

হেমন্তদার গান ও ব্যক্তিত্বের মজাটাও এইখানে। উদাত্ত, খোলা গলার গাইয়ে তিনি। গাইতেন চাপা ব্যথা-বেদনার স্বতোৎসার থেকে। যখন গানের মহলে শাস্ত্রীয় তালিমের তক্‌মা ও কারিকুরি না থাকলে আধুনিক গানেও জাতে ওঠা যাচ্ছে না, হেমন্তদা তখনও সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলছিলেন তাঁর ভঙ্গি ও মূর্ছনার সরলতা। তিনি গানকে গাইতে চাইছিলেন সংলাপের মতন, প্রেমের সংলাপ। যার প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। সেখানে কাব্যের প্রতিই সুরের ধ্যান, রাগের শুদ্ধতা নয়, বিশুদ্ধ অনুভূতিই আবৃত করে রেখেছে সংগীতচিন্তা। হেমন্তদা বলেওছিলেন যে প্রথম থেকেই তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সার্থক বাংলা আধুনিক বেরিয়ে আসতে পারে রবীন্দ্রসংগীতের ধারা থেকে। বাংলা বাণীই হবে বাংলা গানের প্রাণ।

এটা তো আর বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে না যে, হেমন্ত বরাবর চমৎকার-চমৎকার লিরিকের দাক্ষিণ্য পেয়েছেন। পেয়েছেন নিশ্চয়ই, অনেকই পেয়েছেন, কিন্তু অজস্র দুর্বল বাণীকেও তিনি উত্তীর্ণ করে গেছেন সফল গানে শুধু তাঁর গায়ন, তাঁর রীতি, তাঁর কণ্ঠ দিয়ে। তালিম থেকে তিনি শুধু তাঁর রীতিকেই বাঁচাননি, বাঁচিয়েছেন তাঁর কণ্ঠকেও। যে-স্বর্ণকণ্ঠের এক চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন হেমন্তর অনেক চিরস্মরণীয় গানের সুরকার সলিল চৌধুরী। বলেছেন, হেমন্তদার কণ্ঠ ব্যারিটোন গোত্রের, ভারী নাদী গম্ভীর মন্দ্র। আর তাতে মিশেছিল টেনর গায়কের তারার সূক্ষ্ম সুরেলা মিষ্টত্ব। কণ্ঠে যেরকম মিশ্রণ সারা পৃথিবীতে বেশি দেখা যায়নি কখনও।

উস্তাদ আমির খাঁ সাহেবের সঙ্গে একবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি হেমন্ত মুখার্জির গান খুব শোনেন শুনেছি? আর মনে আছে কীরকম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন উস্তাদ, আলবাত! ওইরকম একটা গলা, তা সে যাই গাক আমি শুনব। অত সহজ ভাবে যে সুর লাগাতে পারে সে কী ঢঙ, কথা বা গান গাইছে সেটা আমার কাছে খুব বড়ো ব্যাপার না। আর মনে পড়ে বিখ্যাত গজলিয়া মেহ্‌দি হাসানের কথা। ১৯৭৮-এ পার্ক হোটেলে এক সাক্ষাৎকারে পরিষ্কার বললেন, শিল্পী যদি বলেন তো নাম করব লতার। ওই কণ্ঠে চুম্বন দিতে ইচ্ছে করে। আর ভয়েস কোয়ালিটি, কণ্ঠের কথা যদি বলেন তো বলব হেমন্তকুমার। সারা উপমহাদেশে ওরকম একটা গলা



নেই। তো এই সরল সত্যটা কি হেমন্তদা জানতেন না? জানতেন আবার না? গানের জীবনের একেবারে প্রথম লগ্ন থেকে একটা কথা তিনি স্পষ্ট জেনেছিলেন, একেক জন শিল্পী তাঁর কণ্ঠচরিত্র বুঝে কিছু কিছু ধরনের অলংকার অভ্যেস করেন। ফলে কারও গলার মীড়, মুড়কি, কারও গলায় গমক, তান, কারও জমজমা, বাঁট, কারও তর্কিব, খটকা, কারও হরকত, সাপাট, গিটকিরি, কারও কণ্ঠে এসবের একাধিক সমন্বয় যা তিনি গানের আকার ও প্রকার বুঝে জমিয়ে তোলেন, প্রয়োগ করেন, করে গানকে ভরিয়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর নিজের অলংকার বলতে একটাই—তাঁর কণ্ঠ। যা চর্চা করে আসেনি, এসেছে দৈবসূত্রে। যৌবনে বামপন্থী, প্রথাগত অর্থে ঈশ্বরবিশ্বাসী নন যে-হেমন্ত এই একটা জায়গায় এসে পরমশক্তির প্রসঙ্গ তুলতেন। বলতেন, এ গলাটা তো আমি পেয়েইছি। আমার চেষ্টা ছিল সেটা যেন ধরে রাখতে পারি। তাই কঠিন, ঘোরানো গান দিলে সংগীত পরিচালকদের তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিতেন, ও জিনিস আমার দ্বারা হবে না। ও আমি পারব না। তবে এখানেও সত্যি বলতে কি, কিছুটা বিনয় তো আছেই! তাঁর ছ-সাত হাজার গানের সবই তো আর সরলরেখার ওপর দাঁড়িয়ে নয়। কত মস্ত মস্ত শিল্পীর সঙ্গে জোড়ে কঠিন কঠিন সুরে গেয়ে চলে গেছেন। কিন্তু গেয়েছেন এমন অবলীলায় যে শুনে সেই সুরকে আর তেমন কঠিন মনে হয়নি। আর এটাই হেমন্তর গানের বিরাট সিদ্ধি। যখন যেটা গাইছেন তাই-ই নিজের মতো সরল, স্বাভাবিক করে নিচ্ছেন। 'এই গাইছি! এই গাইলুম!' এই দাপুটে ভাবটাই তাঁর নিবেদনে নেই। যাই গান তাকেই করে নেন রবীন্দ্রসংগীতের মতো স্বভাব পরিচ্ছন্ন। কত কাজ ভেতরে, কত সূক্ষ্ম গভীরতা, অর্ধস্পষ্ট স্বর, আন্দোলন, সুস্থির সম-এ দাঁড়ানো, প্রবাহী মীড় কিংবা 'ও নদীরে!'র মতো খোলা ডাক তাঁর গানে, কিন্তু সবই বিন্যস্ত হয়ে আছে এক সহজ লাবণ্যে। যার নাম আধুনিকতা।

উদাহরণ হিসেবে মনে করতে পারি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে ডুয়েটে গাওয়া ওঁর কেদার-আশ্রিত ভজন 'দর্শন দো ঘনশ্যামনাথ মোহে, আঁখিয়ান পিয়াসি রে'। হেমন্ত গেয়েছেন গুরুর কণ্ঠে, শিক্ষার্থিনীর কণ্ঠে লতা। হেমন্ত গেয়েছেন বলতে গেলে শুধু মুখটুকু, নানান অলংকারে গাঁথা বিস্তারে গেয়েছেন লতা। কিন্তু হায়, কী গাওয়া হেমন্তর! গাওয়া তো নয়, শুধু গলা লাগানো। আর তাতেই মাত। বারবার আমরা শ্রোতারা শুধু প্রার্থনা করি ফিরে আসুক ওই মুখ, ওই স্বর্ণোচ্চারণ।

লতাও ভীষণ ভালো গেয়েছেন, যেমন ভীষণ ভালো তিনি চিরকালই গেয়ে থাকেন। লতার যে-গায়নের সঙ্গে আমরা চিরকাল পরিচিত সেই দক্ষ,

নিখুঁত নিবেদনই তিনি রেখেছেন। তা সত্ত্বেও হেমন্তর কণ্ঠ ওভাবে বেরিয়ে আসে কেন? একবার ভাবি, ওঁর ধ্বনি। তারপর ভাবি, শুধুই কি ধ্বনি? তখন যোগ করি, উচ্চারণ। তারপর ভাবি, শুধুই কি ধ্বনি আর উচ্চারণ? তখন আরেকটু যোগ করি, দরদ। আর তখন মনে পড়ে তাঁর 'রাগ-অনুরাগ' গ্রন্থে বলা রবিশঙ্করের কথাটা। বলেছিলেন উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ-র সানাইয়ের ফুঁ নিয়ে। কীরকম বিস্ফারিত নেত্রে আহ্লাদের সঙ্গে বলেছিলেন, আহা! কী জাদু, কী দরদ ওই একটু ফুঁ-তে। ওই ফুঁ-তেই যেন সব দরদ, সব ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। যেমন হাঁ করে একটা আকারধ্বনিতে সব মানুষকে বশে নিয়ে আসতেন বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব। একটা 'আরে হাঁ' বলে পুকার তুলে শ্রোতার মন ভিজিয়ে দিতেন সিদ্ধেশ্বরী দেবী। তার সপ্তকে হঠাৎ করে গলাটাকে একটু ভেঙে শ্রোতার মন কাঁদিয়ে দিতেন বেগম আখতার। কিংবা চোখ বুজে মন্ত্রের মতো সামান্য সুর লাগিয়ে আমাদের বুক ভাসিয়ে দেন এম এস শুভলক্ষ্মী। অর্থাৎ ফুঁ বলো আর পুকার বলো, ওইটুকুর মধ্যেই শিল্পী ঢেলে দিচ্ছেন তাঁর যাবতীয় ভালোবাসা। প্রণয় দুঃখ আনন্দের নির্যাস। আর এরকম এক ধ্বনিব্যঞ্জনার অধিকারী হেমন্ত কিন্তু নিজের গানকে বর্ণনা করে গিয়েছেন 'কাজ' বলে। যা সচেতন ভাবে, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সংযোগে যত পরিপাটি করে করা যায় ততই মঙ্গল। অর্থাৎ একজন কুমোর তার কলস তৈরির কাজে, একজন দারুমিস্ত্রি তার চারপাই বানানোর কাজে কিংবা একজন রাঁধুনি তার পাকপ্রণালীতে যে খেয়াল রেখে পদে পদে কাজ করে একজন গানের শিল্পীকেও সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় তাঁর সুর, তাঁর কথা, তাঁর ভাব-বাণী-সুর-মেলবন্ধন নিয়ে।। আত্মহারা হয়ে বেসুরো গাইলে কে শুনবে কাকে? হেমন্তদার কাছে গান ছিল এমনই এক কাজ যা যখন-তখন খেয়াল বশে গাইবার নয়। শুনে অবাক হয়েছিলাম যে এমন গভীর, দরদি এক শিল্পী আকাশে মেঘ জমা দেখে গেয়ে ওঠেন না রবীন্দ্রনাথের কোনো বর্ষার গান। প্রশ্ন করতে বলেছিলেন, 'আজ এখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষার সময়। তুমি জানতে চাইলে এখন আমার মনে কি রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান আসছে। এমনি বৃষ্টি পড়লেই আমার মনে বর্ষার গান আসে না। বরং, আমি বৃষ্টির দিকে চেয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে একেকটা গান মনে এলেও আসতে পারে। তবে তেমন কিছু না। আকাশে হয়তো খুব মেঘ জমেছে, বৃষ্টি আসবে আসবে ভাব—তখন কি কোনো গান দিয়ে রিঅ্যাক্ট করতে ইচ্ছে হয় আমার? রবীন্দ্রনাথের কোনো গানের লাইন কি মনে আসে? ঠিক সেরকম কিছু মনে আসে না। বৃষ্টিবাদলের দিন আপন মনে গান গেয়ে উঠিনি। আমি গাই বড়ো কম। যেটুকু লোকের সামনে গাইতে হয় বা রেকর্ড করার সময়। তা ছাড়া

বাড়িতে আমি গাই না। তবে বর্ষার গান যখন গাই তখন মনের মধ্যে বৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা সচেতন ভাব থাকে, সেটা এসে যায়।'

হেমন্তদার এই 'সচেতন ভাব'টা হল তাঁর পেশাদারিত্ব। যেটা কাজ সেটা কাজের মতো দায়িত্ব নিয়েই করতে হবে। যেটা পেশা, যার থেকে সংসার চলে, নামযশ হয়, স্বাচ্ছন্দ্য আসে সেখানে নিজের শখের আর সেই মাহাত্ম্য থাকে না। কাজের বিচ্যুতির জন্য নিন্দে-সমালোচনা শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শখের প্রশ্রয় তিনি চাননি। বলেছিলেন, 'এই যে বর্ষা দেখলে গেয়ে উঠি না এর কারণও কিন্তু ওইটাই—গান আমার কাজ। প্রথম দিকে তো গান গাইতে ভালো লাগত বলেই গাইতাম। যে-গান শুনতাম সেটাই তুলে নিতাম। কিন্তু পেশায় এসে যত দিন গেল ততই দায়িত্বটাও বেড়ে গেল। তখন কাজের গান ছাড়া নিজের গান নিয়ে যে কোনো অলস মুহূর্তে শুনব এ সময় আর রইল না।'

হেমন্তর বাল্যকালের বন্ধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুযোগ করেছিলেন যে, হেমন্ত ওঁর গান নিয়ে বড়ো কাজ-কাজ করে। অত কিছু দরদের অভাব ওঁর নেই যে শুধু কাজ ভেবে গেয়ে যাবেন। কিন্তু ঘটনা এই যে, সুভাষদাও ওঁর কবিতাকে কাজ জ্ঞানে তৈরি করেন। অ্যারিস্টটল তো তাঁর মহাগ্রন্থ 'পোয়েটিক্স'-এ কবিকে 'মেকার' বা নির্মাণকারীই বলেছেন। কবিতা বা গানও তো নির্মাণ, তবে রসের নির্মাণ। সেখানেও বিগলিত, আত্মহারা ভাবের কোনো প্রশ্রয় নেই। প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি মুহূর্ত সার্থক হতে হবে। আধুনিক মনস্ক হেমন্ত বা সুভাষ তাঁদের গান বা কবিতাকে একটা 'ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ইমোশনজ', ভাবের বন্যা হিসেবে দেখেননি। ভাবকে তাঁরা সংযত করে শিল্প করেছেন। হেমন্তর আধুনিক গানের আধুনিকতা যেখানে। বলেওছেন হেমন্ত যে, গাইবার সময় সারাক্ষণ খেয়াল রাখি কোনখানটায় কী জটিলতা আছে, কীভাবে সুর লাগাব সেখানে, কিংবা কোথায় কী পর্দা ছুঁয়ে কীভাবে ফেরত আসব মূল জায়গায়। আমি নিখুঁত করে গাইলে তবেই না শ্রোতার বুকের ভেতরে বৃষ্টি নামবে।

আমার মনে পড়ছে বছর দুয়েক আগে 'সত্তরের দশকের হেমন্ত' ক্যাসেটের বর্ষার গানগুলো। 'সঘন গহন রাত্রি', 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' কিংবা 'এমন দিনে তারে বলা যায়'। ১৯৭৯-র এক সন্ধ্যায়, বর্ষার সন্ধ্যা কি না জানি না, এইসব গান রেকর্ড হয়েছিল কলামন্দিরের এক অনুষ্ঠান থেকে। কিন্তু এখন এই লেখার মুহূর্তে, কটকটে রোদের দুপুরেও গানগুলো শুনে ধারণা পাচ্ছি ধারাপাতের। রবীন্দ্রনাথের গানের এই হচ্ছে জাদু, ঋতু বা দিনরাতচক্রকে কীভাবে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

শুধু প্রয়োজন একটা কণ্ঠ যা নিখুঁত সুরে ও ভাবে তা বলে দেবে। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে এরকম একটা যে কতখানি জরুরি সেটা মনে আসে হেমন্তর নিবেদনে 'কৃষ্ণকলি' গানটা শুনে। যা অসাধারণ, সম্পূর্ণ অসাধারণভাবে গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র কী শান্তিদেব ঘোষ। আমি এই দুজনেরও অন্ধ ভক্ত। কিন্তু হেমন্তর 'কৃষ্ণকলি' শুনে মনে হচ্ছে শুধু এই নিবেদনের অপেক্ষায় গানটি ছিল এতকাল, এত দীর্ঘকাল। কবি তাঁর কথার এই সুরারোপ জানতেন, সেভাবে শুনেও গেছেন। কিন্তু বাস্তবিকই এ গানের মূর্তি কী, তার পূর্ণ ধারণা হয়তো তিনিও পাননি। কারণ এভাবে তো কেউ কখনও এ গান গায়নি।

কিন্তু হেমন্তদা হেমন্তদাই। যখন ফোনে তাঁকে এ কথা বলেছিলাম তিনি পুলকিত বিস্ময়ে প্রথমে বললেন, তোমার এত ভালো লেগেছে? তারপর বললেন, ওটা সুচিত্রার প্রিয় গান। তাই গাই না। ও গান ওরই থাক। তোমরা আমার ক্যাসেটটা শুনো। হেমন্তদার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর সংকোচের একটা দ্বন্দ্ব চিরকাল ছিল। উনি জানতেন উনি কী, বিচলিত হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। কিন্তু প্রশংসা তাঁকে সংকোচে ফেলত। কত অযথা নিন্দেমন্দ হয়েছে তাঁর এই শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি রা কাড়েননি। কিন্তু যেদিন ওঁর বই বেরুল সেদিন সেটা মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, ভারতরত্নের চেয়েও এ আমার বড়ো সম্মান। ওই একদিনই বোধহয় ওঁকে দেখেছিলাম সামান্য একটু বিহ্বল হতে। আর তার কারণ তাঁর নিবিড় আকাঙ্ক্ষা যে মানুষ তাঁকে ভালোবাসুক। মনে রাখুক। উচ্চাকাঙ্ক্ষা-টাঙ্ক্ষার ধার ধারতেন না, কিন্তু এই ভালোবাসাটা তিনি চেয়েছিলেন। আর এই চাওয়ার ব্যাপক, ধারাবাহিক প্রকাশ ছিল তাঁর গান। যতই কাজ-কাজ করুন, এই কাজ ছিল তাঁর প্রেমের জাল। কাজটাই কাজের প্রাপ্তি। বাকি সবটাই যেন ফাউ। আর সেটা বরাবর স্বীকারও করে গেছেন তিনি। বলেছিলেন, এক জীবনে যত-যা পাওয়ার তার কত ঢের বেশি পেয়েছি। যা দিতে পেরেছি মানুষকে তার কত-কত বেশি ফিরিয়ে দিয়েছে তারা অকাতরে। না, আমার কোনো অভিযোগ, অনুযোগ নেই। এখন একটাই প্রার্থনা আমার, যে ক-টা দিন বেঁচে আছি যেন গান শোনাতে পারি। বেঁচে থাকার এ আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আকাঙ্ক্ষা রদ করে কেন গানে এসেছিলেন হেমন্ত? আকাঙ্ক্ষা একটা নিশ্চয়ই ছিল। খুব আটপৌরে, ছা-পোষা, মধ্যবিত্ত আকাঙ্ক্ষা। নিজের মতন করে গান গেয়ে যেতে পারা। যা নেই গলায় তা নিয়ে হা-হুতাশ না-করে যা আছে তাকে শেষ ডিটেল অবধি প্রকাশ করে যেতে পারা এবং এই করতে করতে হেমন্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের নিজস্ব গানের একটা মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেহারা নির্মাণ করে বসেছিলেন।

ভেতরের কথাকে সুরে সুরে বলার এক রহস্যময় সরল পদ্ধতি। হেমন্তর নিজের চেহারাটাই ছিল যার অভিমানী, মধ্যবিত্ত, সরল সম্ভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি। গুটোনো-হাতা সাদা পপলিনের শার্ট আর ধুতিতে জড়ানো যে-কায়াটি কালে কালে বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবশ্রেণির আদর্শ হয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে উত্তমকুমার অভিনীত বেশ কিছু নায়ক চরিত্রও বাঙালি যুবার যে-আদলটিকে আরও কায়েম করে মানুষের মানসিকতায়। উত্তম অভিনীত সেইসব চরিত্রের ঠোঁটে হেমন্তর আধুনিক গান ফুঁটে বাংলা সিনেমা ও গানে এক নতুন জোয়ার এনেছিল। বাঙালি রোমান্টিসিজমের মহত্তম মুহূর্ত বুঝি ওই। বাংলা ছবি ও আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ। যার পর সবটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে খোঁয়ারি ভাঙার মতো।

হেমন্তর গানকে মধ্যবিত্তই বা বললাম কেন? বাণী-সুরের এত সমৃদ্ধি যাতে তাকে মধ্যবিত্ত ভাবা কেন? মধ্যবিত্ত, কেন-না হেমন্ত এক নিটোল মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে, মধ্যবিত্তের মর্মবাণী আপামর মধ্যবিত্তকে শোনানোর জন্য প্রয়াস করে গেছেন। তাঁর আধুনিক বাংলা ও গণনাট্য সংগীতেই প্রথম ব্যাপকভাবে মধ্যবিত্তের ঠোঁটের গান হয়। পূর্বে কালোয়াতি গানের আসর বসত ধনীগৃহে, পরে লাইট ক্ল্যাসিকাল, রাগপ্রধান ইত্যাদির প্রসার হল আরও বিস্তৃত সমাজে। কিন্তু রেকর্ড-রেডিয়ো-ফিল্মের মাধ্যমে জনজাগরণ ও জনসংযোগের একটা বড়োসড়ো কাজ করেছিল হেমন্তর গান। শুধু রেকর্ড বিক্রির নিক্তিতেই ধরা পড়ে আধুনিক বাংলা গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসংগীতকেও কত বিপুল জনপ্রিয়তা দিয়েছিল হেমন্তর গান। সেই পঞ্চাশ দশকের গোড়াতেই, বম্বে পাড়ি দেবার পূর্বেই, হেমন্তর একটা স্টার স্টেটাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক গেয়ে এহেন তারকা গুরুত্ব তাঁর আগে কেউ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। পাশাপাশি জগন্ময় মিত্র ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতো মস্ত গাইয়ে ছিলেন। অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন তাঁরাও। তবে প্রথম তারকা বোধহয় হেমন্তই। যার পিছনে সলিল চৌধুরী সুরারোপিত 'গাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'পালকির গান' ইত্যাদি গানের অবদানও বিরাট। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, মাইকে মাইকে বেজেছে এসব গান। তারপর সেখান থেকে উঠে এসেছে জনগণের ঠোঁটে। সরল, মর্মস্পর্শীভাবে গাওয়া এই গানগুলোয় একটা সমাজচিত্র ছিল, দলিত সমাজের সুখ-দুঃখের কড়চা ছিল। সর্বোপরি, গানগুলোয় শিল্পী সমাজের বিবেক প্রতিফলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতির তৎকালীন আদর্শবান ভাবমূর্তির সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা ভীষণ মানিয়ে গিয়েছিল। হেমন্ত, সলিল, দেবব্রত, সুচিত্রা গণনাট্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল হিসেবে উঠে এসেছিল।

এক সময় গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে হেমন্তর সম্পর্ক চুকে গেলেও মধ্যবিত্ত সমাজের চোখে তিনি রয়ে গেলেন সেই 'রানার' ও 'গাঁয়ের বধূ'র হেমন্ত। কোনো জলসা, কোনও অনুষ্ঠানে সলিলের সুর-করা এই গানগুলার কোনো একটি পেশ না-করে আসর শেষ করেননি তিনি। আর জীবনের শেষ আসর অবধি কোনো অনুষ্ঠান শুরুও করেননি একটি অন্তত রবীন্দ্রসংগীত না-গেয়ে। মধ্যবিত্ত রুচি, সংস্কার ও মনোভঙ্গিতে নিজেকে গেঁথে তার সঙ্গে ওতপ্রোত করে রেখেছিলেন তিনি। বম্বেতে বেশ কিছুদিনের মতো কায়েম হলেও নিজের গান, অনুষ্ঠান ও ভাবমূর্তি থেকে এক চুলও নড়লেন না তিনি। ক্রমে ক্রমে শহর কলকাতায় মধ্যবিত্ত সোফিস্টিকেশনের একটা প্রতিভূ হয়ে উঠলেন তিনি। বম্বের গানের চলন দ্বারা যিনি বিধ্বস্ত, উদ্‌বাস্তু হলেন না। উলটে হিন্দি গান গাওয়াতেও একটা সুনির্দিষ্ট বাঙালিয়ানার, রাবীন্দ্রিক শিক্ষার ছাপ রাখলেন। যে-কারণে যত দিন যাচ্ছে ওঁর সেইসব পুরোনো হিন্দি গান তাদের স্বভাব ও চরিত্রে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। কীরকম চরিত্রবান আধুনিক গান সেসব। কিছুটা বিলিতি ভাব, কিছুটা রাবীন্দ্রিক, কিছুটা লৌকিক, কী ভীষণ শহুরে, আর সব মিলিয়ে আগমার্কা হেমন্ত। যার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন বিশেষ একজন—বম্বের ফিল্ম সংগীতে যাঁর অবদান কোনো দিনও বিস্মৃত হবে না মানুষ—শচীনদেব বর্মন।

তবে হেমন্তর গানের মধ্যবিত্ত চারিত্র্য আরও কিছুটা গভীরের বিষয়। ওর গান মধ্যবিত্তের নিছক বিনোদন নয়, সেখানে তার কিছু শ্লাঘা, অহমিকা, আত্মপরিচিতি মিশে আছে। এই গান শুনে বা গেয়ে সে নিজেকে কিছুটা বিজ্ঞাপিত করে, জাহির করে। এ হল এমন এক গান যা সে নিজের বক্তব্য হিসেবে গাইতে পারে। যা সে বোঝে, ভাবে, অনুভব করে তাই যেন সুরে সুরে তাদের হয়ে বলে যাচ্ছেন হেমন্ত। বস্তুত, তাঁর সবচেয়ে রোমান্টিক গানেও হেমন্ত যেন শুধু নিজের অনুভব নয়, একটা শ্রেণির অনুভবকে বাঙ্ময়, সুরেলা করছেন। নিজের অনুভূতি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্রেণির হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করছেন। তিনি মধ্যবিত্তের শ্রেণিসংগীত গাইছেন, ইস্তেহার গাইছেন, নিজের জীবনী গাইতে গাইতে তিনি জীবনকথাও শুনিয়ে দিচ্ছেন। 'আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শোনো/আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে/তবু আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'—এই কথা কোনো ব্যক্তিগত আস্ফালন নয়, এ হল এক শ্রেণির সম্মেলক ঘোষণা। তার বিশিষ্টতম প্রতিনিধি ও প্রতিভূর কণ্ঠাশ্রয়ে বলা। দৃপ্ত, সরল, হার্মোনাইজড প্রক্ষেপণে। উদ্ধৃতির প্রথম পঙ্‌ক্তি ভারী, নাদী, ওজস্বী আরোহী সুরে। 'শোনো' কথাটায় সামান্য একটু নাটকীয় বার্তা 'আমি যদি আর না-ই আসি হেথা ফিরে' এবং

অবশেষে, ফের এক মন্দ্র উচ্চারণ খাদে নেমে এসে। ক্রোম্যাটিক টেনশনে, খুব খাড়া স্বরক্ষেপণে। সরল, সাদাসিধে ভাবে সুর লাগিয়ে এক বেদনার মূর্ছনা।

এভাবে গানের পর গানে গলা ফেলা যে কী ভীষণ কঠিন কাজ তা হেমন্ত কোনো দিনই তাঁর ব্যাপক শ্রোতৃগোষ্ঠীকে বুঝতে দেননি। ফলে একটা বড়োসড়ো সংখ্যক অনুকারী গোষ্ঠী তাঁর তৈরি হয়েছিল যাঁরা একনিষ্ঠভাবে তাঁর গান তাঁর মতন করে গেয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের নিজেদের গানও গেয়েছেন হেমন্তর ঢঙে। যা করে নিজের কোনো স্কুল না-করে, শিক্ষকতা না-করেও হেমন্ত একটা নিজস্ব ঘরানার পত্তন করে ফেলেছিলেন প্রায় নিজের অজান্তেই। অন্যকে শেখানোর ব্যাপারে শেষ জীবন পর্যন্ত বেশ কুণ্ঠাই ছিল তাঁর। বলতেন, শেখানোর কী আছে? কী-ই বা শেখাতে পারি? আমি যেভাবে গাইতে চেষ্টা করেছি এইটা নজর করতে হবে। কবিতা পড়তে হবে, বুঝতে হবে। সেই মানে সুর লাগিয়ে বার করতে হবে। এটা শিল্পীর নিজের কাজ। এ কাউকে শেখানো যায় না।

এ কথা হেমন্ত বলতে পারতেন কারণ তাঁর নিজের স্টাইল তৈরি হয়েছিল একলব্যের মতো দূরের প্রভাব ও ব্যক্তিগত অনুশীলনে। একটা সময় ছিল যখন তাঁর এক প্রিয় গায়ক শচীনদেব বর্মনের গান অল্পবয়সী হেমন্ত শচীনদেবের বাড়ির জানালার নীচে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন শুনতেন। আলাপ নেই, কাজেই ভেতরে যাওয়া চলে না। ওই গলিতে দাঁড়িয়েই শুনছেন শিল্পী কীভাবে তাঁর খোলা গলায় পল্লিগানে প্রয়োজন হলে আনুনাসিক ভাব এনে সুরকে করুণ করে তুলছেন। পরবর্তীকালে ওঁর ওই দরাজ কণ্ঠেও হেমন্ত সামান্য সামান্য নেজাল এফেক্ট, আনুনাসিক ছোঁয়া এনে দুর্ধর্ষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করতেন।

তবে একটা প্রশস্ত সময় ধরে হেমন্ত প্রায় অনুসরণ করেছেন পঙ্কজকুমার মল্লিকের গান। পরে ধীর পদে সরে এসেছেন নিজের ঢঙের মধ্যে। একাগ্রভাবে শুনেছেন অন্তর্মুখীন গাইয়ের গানের ভাব। একেবারে ভিন্ন রাস্তার গাইয়ে, যেমন আমির খাঁ-কে, শুনতেন। বলেছিলেন আমাকে, গোলাম আলি খাঁ, আমির খাঁ-কে খুব শুনতাম, দেখতাম কীভাবে গানকে দাঁড় করান ওঁরা। মুগ্ধ ছিলেন কে এল সায়গলের দ্বারাও। ঠিক তুলবেন বলে, এক পঙ্কজবাবুকে ছাড়া, কাউকে সেভাবে না শুনলেও বিভিন্ন শিল্পীর গলা ফেলার ওপর নজর রাখতেন হেমন্ত। একবার খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন, শেষ অব্দি তুমি কীভাবে গলা দিলে সেইখানেই ভো গান। বাকি সবই তো প্রস্তুতি।

আর এই হেমন্তদাকে দিয়ে ওঁর গানের ফিলোজফি সম্পর্কে কিছু বলাতে জেরবার হয়ে গিয়েছিলাম। শুধুই বলেন, ফিলোজফি তেমন কিছু নেই। ভালো করে গাইতে হবে। যখন জিজ্ঞেস করলাম, এ ছাড়া? বেশ অম্লান ভাবে বললেন, এ ছাড়া আর কী? দেখতে হবে কাব্যকে কতখানি তুলে ধরতে পারলে। যখন জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? ফের হাসলেন। বললেন, গাইবার সময় আমি খেয়াল রাখি গানের কথায় ধরা ছবিটার দিকে। আর সুরে সুরে সেই ছবিটা এঁকে দিতে চেষ্টা করি। সেই ছবিটা যদি ফোঁটে তাহলে সেই সঙ্গে গানের আরও অনেক কিছু না-বলা কথা, ভাব, রহস্যও বেরিয়ে আসবে। আর সেই পার্ফেক্ট ছবিটার জন্য চাই পার্ফেক্ট সুর লাগানো, গলা মেলা, ভাব সংযোগ। আবার কী? প্রথম থেকেই গানের রহস্য-রহস্য করলে গানটাই তলিয়ে যাবে রহস্যে। যখন সাক্ষাৎকারগুলো নিতাম তখন মনে হত হেমন্তদা বড্ড কৃপণতা করছেন। ঝেড়ে কাশছেন না। এখন বুঝি, তাঁর বিশদ করে বলার কিছু ছিল না। গানটাই তাঁর সব বলা, তাঁর শেষ বলা।

হেমন্তর গানের বিশিষ্ট স্টাইলটা আমাদের কানে বসে যাওয়াতে একটা কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি। তা হল কত কত রকম ভিন্ন উপকরণও সহজ ভাবে মিশে গেছে তাতে। আলাদা করে পল্লিগীতির চর্চা তো তিনি করেননি কখনও, অথচ পল্লিগানের রেশ, শৃঙ্খলা, ধরনধারণ মিশেছে তাঁর গানে। গেয়েছেন বা বেঁধেছেন খুব আধুনিক ছকে, কিন্তু পল্লি ভাবের আমেজটুকুও রেখেছেন। গানগুলো হয়ে উঠেছে যাকে বলে আর্বান ফোক, তেমন কিছু। পাশ্চাত্যে যে-ধরনের একটা বিখ্যাত চলন সৃষ্টি করেছেন বব ডিলান, জোন বায়েজের মতো শিল্পীরা। হেমন্তদার 'ও নদীরে' গানটা (যার ভাষা না বুঝেও প্রথম শ্রবণেই কনরাড রুক্স টের পেয়েছিলেন যে এটা নদীর গান, নৌকোর গান, এবং তৎক্ষণাৎ ঠিক করেন যে সেটাকে তাঁর 'সিদ্ধার্থ' ছবির থিম সং করবেন) কী 'পলাতক', 'ফুলেশ্বরী' ছবির গানগুলো পল্লি সুর ভেঙে, কিছুটা সরল করে, তাতে কিছুটা রবীন্দ্রনাথ মিশিয়ে বানানো। 'পলাতক', 'ফুলেশ্বরী'র উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে বলেছিলেন, ওইরকম কিছু ছবিতে আমি রবীন্দ্রনাথ আর ফোককে প্রায় পাশাপাশি নিয়ে আসতে পেরেছি। তাঁর সুর করার অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, নিজেই জানিয়ে গেছেন, শচীনদেব বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও পঙ্কজকুমার মল্লিকের কাজ থেকে। তিন জনের তিন ধরনের পথ। শচীনদেবের সুরে পল্লি সুরের ঝোঁক, কৃষ্ণচন্দ্রের গানের কাজে পুরাতনী ও কীর্তন, পঙ্কজকুমারের সুরারোপে রবীন্দ্রসংগীত, গজল ও ভজন। কিন্তু তিনজনের কাজেই একটা সাধারণ গুণ—সরলতা। যা হেমন্তকে আকৃষ্ট করত। বুঝে ভালো লাগা গানের থেকে

ভালো লেগে বোঝার গানের প্রতিই তাঁর আনুগত্য ছিল। নিজের সুরারোপের কথা বলতে গিয়ে উপরিউক্ত তিন শিল্পীর নাম করে বলেছিলেন, এঁদেরই গান শুনতে শুনতে আমরা বড়ো হয়েছি। এঁদের গানই আমাকে সব থেকে বেশি ইমপ্রেস করে। তারপর খানিক বাদে যোগ করলেন, 'আমার স্টাইল বলতে আমি খুব সহজ, সরল একটা ঢং-এর কথা ভাবতে পারি।' ব্যাস, ওই পর্যন্ত!

তো মোটামুটিভাবে, সংক্ষেপে, এই হল হেমন্তদার গান ও সুরের রকম। সহজ, সরল ঢংটা তাঁর স্টাইল আর সেই স্টাইলই ধরিয়ে দেয় মানুষটাকে। মায়া মমতা, সাংসারিক দায়দায়িত্বে জড়ানো, পরিচ্ছন্ন স্বভাবের, সচেতন নাগরিক মানুষ। যে-সমাজের মানুষ তিনি সেই সমাজকেই একটু একটু করে বদলাচ্ছেন নিজের রুচি ও কীর্তি দিয়ে। কিন্তু সারাক্ষণ মুখে বলে যাচ্ছেন, এটা পারি না, ওটা পারি না, বেশি জানি না, কিছু শিখিনি ইত্যাদি। শুনতে শুনতে একেক সময় অবাক লাগত। ভাবতাম বিনয়টাই ওঁর অহংকার। কিন্তু এখন ভাবি না। এখন বরং এই প্রসঙ্গে মনে করতে চেষ্টা করি ওঁর গুরু আলাউদ্দিন খা সম্পর্কে বলা রবিশঙ্করের কথা। খাঁ সাহেব নাকি স্টেজে বসেই বলতেন, কিসুই জানি না, কী-ই বা শিখলাম? আমাকে আপনারা নিজ গুণে মাফ করবেন। আর বলছেন কে? না, সংগীতের সাগর বলতে যাঁকে এক বাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে সবাই সেই মহৎ 'সেনী ঘরানা' উস্তাদ!

ভনিতা নয়, এ এক মানসিকতা। অত্যন্ত বৃহৎ মনের মানসিকতা। যে-মন কিছু স্বর চিনেছে, প্রকৃতির বৈভব থেকে কিছু সুরের সন্ধান পেয়েছে, যে ঈষৎ অনুভব করেছে গান কী, কেন, কোথায়, কতটুকু। আলাউদ্দিন খাঁ তো খোদ সাগরই, কিন্তু নিজের গণ্ডি, আয়তি, পরিমণ্ডলের মধ্যে হেমন্তও ছিলেন বিশুদ্ধ প্রতিভা ও বিনয়ের এক নমুনা। তিনি জানতেন তিনি কিছু 'কাজ' অন্তত করেছেন এবং দু-এক দশকের মধ্যে ছুড়ে ফেলার মতো কাজ সেসব নয়। অথচ ওই সংকোচ ও বিনয়ের বেড়াজাল থেকে একবারও বেরিয়ে আসা হল না তাঁর। একেক সময় মনেও হয়েছে মানুষটা বিনয় করছেন না, প্রকৃতই এ হল তাঁর দ্বন্দ্ব।

হেমন্ত কীভাবে এখন আছেন সেটা কাউকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবাই সারাক্ষণ সেটা জানতে পারছেন। তবে আজ থেকে বত্রিশ বছর আগেও কীভাবে ছিলেন তার একটা ছোট্ট নমুনা দিয়ে লেখা শেষ করব। আমাদের বাড়িতে সংসারের কর্তা বলতে তখন আমার ব্যাচেলার কাকা। বছর দুয়েক হল বাবা নেই। কাকা ভীষ্মদেব, জ্ঞান গোঁসাই, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ভক্ত। সারাক্ষণ ওঁদের রেকর্ড বাজে বাড়িতে। রেডিয়ো খুলে অনুরোধের আসর শুনলে কাকা কিছুটা বিরক্তই হন। আধুনিক বাংলা গানের যুগে পৌঁছোতে পারেননি তিনি।

কাকার পছন্দের গান আমারও ভালো লাগে। পাশাপাশি আমার ভালো লাগে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, লতা, গীতা, সতীনাথ, শ্যামল, প্রতিমা, আলপনা। যা কেবল শোনা হয় রেডিয়োতে। রেকর্ড কেনায় কাকা প্রাচীনপন্থী, কখনও হয়তো নিয়ে আসেন একগুচ্ছ রেকর্ডে ধরা বাংলা নাটক। তো এরকম একদিন আমরা রেডিয়োতে শুনছিলাম আধুনিক। বোধহয় একটু জোরেই। কাকার গুরুতর কাজ ছিল, তাই হঠাৎ পাশের ঘর থেকে উঠে এসে বন্ধ করে দিলেন রেডিয়ো। তারপর ঝাঁঝের মাথায় বেরিয়ে গেলেন লক্ষ না করেই যে কীরকম অভিমানী অশ্রুবিন্দু জমে উঠছিল আমার চোখে। আমি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম এবং কখন এক সময় ঘুমিয়েও পড়লাম। ঘুম ভেঙেছিল শীতের বিকেলে কাকার ডাকেই। বাইরেটা তখন একটু-একটু অন্ধকার। কাকা বললেন, চল, আমরা আজ রেকর্ড কিনব। বলতে ইচ্ছে করল, তোমার রেকর্ড কেনা মানেই তো যত পুরোনো-পুরোনো গান। কিন্তু বলতে পারলাম না। কারণ ওই অল্প বয়সেই টের পেয়েছিলাম কাকা লোকটা কত গুণী আর কত ভালোবাসা ওঁর বুকে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গে রেকর্ডের দোকানে যেতে আমার ভালোও লাগত খুব। চটপট রেডি হয়ে বেরিয়ে গেলাম।

কাকা দোকানে গিয়ে নিজের রেকর্ড বাছার আগেই কাউন্টারের ভদ্রলোককে বললেন, দেখুন তো ছেলেটা কী রেকর্ড চায়। ও বাছুক, তারপর খান দুয়েক দিন। আমি রেকর্ডের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে বেছে নিলাম দুটো ৭৮ আরপিএম ডিস্ক। যার একটার গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সেই সন্ধ্যাতে কাকার হাত ধরে হেমন্তর রেকর্ড বুকে নিয়ে যে বাড়ি ফিরলাম সেটাই আমার প্রথম রেকর্ড কেনা। নিজে পছন্দ করে। তারপর সেই স্মৃতি আর ওই সব গান থেকে কখনও মুক্ত হইনি।

বাঙালি জীবনে এইভাবে, এইরকম নানান ভাবেই আছেন হেমন্ত। সরল, স্বাভাবিক মানুষটার জীবনে মৃত্যুটাই তাঁর একমাত্র ভণিতা।

গানের অরণ্যে তিনি হেমন্ত

ঠিক কুড়ি বছর আগে এই দিনটাতে, মেঘলা আকাশ থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টিও পড়ে যাচ্ছে, ফুলের পাহাড়ে শোয়ানো হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দেহ নিয়ে ট্রাক যখন ওঁর বাড়ি থেকে শ্মশানের পথে রওনা দিল, অদূরে দাঁড়িয়ে কেনই জানি না ভাবনাটা উঁকি দিয়েছিল মনে—হায়, বাংলা আধুনিকের যুগই হয়তো শেষ হয়ে গেল!

কেন ভাবলাম কথাটা তখনই বুঝিনি, তবু ভাবলাম তো! মনের মধ্যে দুটো গানের লাইন তখন কেবলই ঘুরঘুর করছে—'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে' আর 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা', দুটো গানই সেই কবে পাঁচের দশকে গাওয়া। অথচ হেমন্তর কণ্ঠ, ব্যক্তিত্ব ও ক্যারিশমার মতো তিন দশক জুড়ে থেকে গেছে আজ-কাল-পরশুর গান হয়ে। শুধু গানই বা বলি কেন, হেমন্তর আত্মজীবনীর দুটো পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছেদের মতো। ওঁর বন্ধু, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'হেমন্তর কী মন্তর' হয়ে।

মিছিল যখন মিলিয়ে গেছে বাড়িঘর অট্টালিকার অন্তরালে, গুটি গুটি ফিরে আসছি, মনে এল হেমন্তর আরও দুটি গান। প্রথমটা রবীন্দ্রনাথের বাণী ও সুরে, যেটি প্রায় নিজের জীবনের এক অভিমানী উচ্চারণ করে নিয়েছিলেন শিল্পী—'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' আর দ্বিতীয়টা, গানকে চিরকাল একটা 'কাজ' হিসেবে দেখা হেমন্তর এক বিনীত স্বীকারোক্তি—'এক দিনে তো হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'। খানিক বাদে আরও একটা ভাবনা ভর করল মনে : গানগুলো শুধু অপরূপ বিনোদন আর অনুভূতিতে গলে শেষ হয়ে যায় না, এদের মধ্যে একটা সত্য উচ্চারণও আছে। আজ, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯, স্বর্ণযুগের আধুনিক পর্বের হয়তো ইতি হল, কিন্তু হেমন্ত শেষ হলেন না। তিনি শুধু গান হয়ে গেলেন। নিজের ঠোঁট ছেড়ে জনগণের ঠোঁটে ভর করলেন।

শেষ জীবনে ওঁর খুব কাছাকাছি থাকতাম বলে আরেকটা কথাও খুব মনে আসত সেসময়। জিজ্ঞেস করেছিলাম, খুব একাকী লাগে? বললেন, তা তো

লাগেই। তবে গান গাইলে আর লাগে না। তখন মনে পড়েছিল ফরাসি মনীষী আঁদ্রে মালরো-র আত্মজীবনী 'অ্যান্টিমেমোয়ার'-এর একটা কথা। মালরো জিজ্ঞেস করছেন মাও জে দং-কে, 'চেয়ারম্যান, কখনও কি নিঃসঙ্গ বোধ করেন?' মাও উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। তবে জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিঃসঙ্গ'। অ্যালোন উইথ দ্য মাসেজ। জনসংযোগের দুই শিখর দৃষ্টান্ত মাও এবং হেমন্তর দুই প্রেক্ষিত সেই থেকে ভাবিয়ে এসেছে আমাকে। একজন একাকী বোধ করতেও জনতাকে সঙ্গী করেন, অন্যজন একাকিত্ব থেকে রেহাই পেতে গানকে, যা তাঁকে জনতার কাছে নিয়ে যায়। কারণ একা-একা, মনের আনন্দে খেয়ালখুশির গানে তিনি অভ্যস্থ হননি কখনও। জীবনের প্রথম থেকেই গান তাঁর কাছে থেকে গেছে একটা 'কাজ'। যা সচেতন ভাবে, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে করতে হবে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, গানের মাধ্যমে প্রেমের সংলাপ বলাটাকেও কি 'কাজ' বলা হবে? হেমন্তর মতে, ঠিক তাই। এই সংলাপ বলার জন্যও একটা হারমোনিয়াম চাই, বাঁধা সুর চাই, প্রত্যক্ষ শ্রোতা কিংবা স্টুডিয়োর আয়োজন চাই, গানের একটা পরিবেশ চাই, আর এই এতগন্ডা জিনিসের সংযোগেই হতে পারবে গান। পেশাদারি গান। যা জনগণের সঙ্গে শিল্পীর যোগ ঘটিয়ে দেবে। শিল্পীকে অব্যাহতি দেবে নিঃসঙ্গতা থেকে।

আজ তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পর হেমন্তর এইসব কথা, তাঁর গাওয়া গানের বেশ কিছু বাণীকে প্রায় **prophetic**, ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতো মনে হচ্ছে। খ্যাতি ও যশের আকাঙ্ক্ষায় এত বেশি গানের শিল্পীর উদ্‌গম হয়েছে যে তাঁরা নিজেরাই একটা বিপুল জনতা। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হওয়ার উপক্রম। কত কত ভালো গানও হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে উপযুক্ত পেশাদারিত্বের অভাবে। অধিকাংশ গানের মৃত্যু হচ্ছে আঁতুড়ে। শিল্পীর তাগিদ থাকবে যেমন জনতার কাছে পৌঁছোনোর, জনতাকেও চেষ্টায় থাকতে হবে শ্রোতা হয়ে ওঠার। এই দুটোর কোনটা কতখানি হচ্ছে বা হচ্ছে না তা নিয়েই তো যত সমস্যা। না হওয়াটার সম্ভাবনা এবং সুযোগ দিন দিন বাড়ছে কারণ গান এবং শিল্পীকে তালেগোলে মিলিয়ে একটা প্যাকেজ বানানোর চেষ্টা চলছে, আর শ্রোতা বলতে একটা বাজার। ফলে গান কী হল, না-হল সেটা কোনো বড়ো ব্যাপার নয়। ব্যাপার হল বাজার কোনো প্যাকেজ নিচ্ছে বা নিচ্ছে না।

হেমন্তর জীবনের শেষ দিকে গানের বাজারে একটা অভিনব উপদ্রব চালু হয়েছিল যা ওঁকে কিছুটা বিরক্তই করত বলেই মনে হয়—গোল্ড ডিস্ক। কথায় কথায় গোল্ড ডিস্ক। রেকর্ড বা ক্যাসেট বেরুনোর তিন দিনের মাথায় ঢালাও বিজ্ঞাপন : গোল্ড ডিস্ক! গান বা শিল্পীর গুণাগুণ রীতিমতো পর্দানশিন সে-

সব বিজ্ঞাপনে, যা কিছু বার্তা ওই দুটি শব্দে—গোল্ড ডিস্ক। বাংলা আধুনিকের স্বর্ণযুগের অবসানই মনে হয় সূচিত হয়েছিল ওই সব গোল্ড ডিস্ক বা স্বর্ণালি রেকর্ডের উদ্ভবে। যখন শিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও গানের প্রযোজকদের হাত থেকে গানের নিয়ন্ত্রণ সরে গেল তথাকথিত প্যাকেজমেকারদের হাতে। গান ভালো কি মন্দ তা নিয়ে কেউ দেখি রা কাড়ে না, সবাই সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনামের কথা বলে!

এই গোল্ড ডিস্ক জমানার শুরুটাও খুব কাছ থেকে দেখা আমার। শুরু হল বিড্ডুর সুরে নাজিয়া হাসানের 'ডিস্কো ডিওয়ানে' দিয়ে। একটা অ্যালবামের প্রমোশন যে কোথায় যেতে পারে তার একটা ইউসেন বোল্টীয় নজির খাড়া করে দিয়েছিল এইচ এম ভি এই টাইটেল দিয়ে। এবং এই ধামাকা শেষ হতে না-হতেই সংস্থা ফের মাঠে নামল রুনা লায়লার এলপি নিয়ে। আমরা গালে হাত দিয়ে ভাবতাম গোল্ড ডিস্কের মুনাফা শেষে খাদ্যেমদ্যে উবে যাবে না তো? এইসব ধামাকাদারিতে রেকর্ড কোম্পানিকে সুরের আকাশে ধ্রুবতারা ঠাহর হচ্ছে যখন ঠিক তখনই বেচারির রোগ ধরা পড়ল। কর্তাদের অনেককেই খেদ করতে শোনা গেল, গান না লাগলে কী করা যাবে? শিল্পীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল, কই, রয়্যাল্টি আসে না কেন? কোনো কোনো শিল্পীর রেকর্ডই বেরুল না পুজোতে। তাঁরা অন্য কোম্পানিতে নাম লেখালেন। দেখতে দেখতে খান কুড়ি ক্যাসেট কোম্পানিও গজিয়ে উঠল, যাদের কেউ কেউ দু-দিন অন্তর একটা করে গোল্ড ডিস্কও হাঁকতে লাগল বাজারে। কেউ আবার ক্যাসেটের প্রথম বিজ্ঞাপনেই ঘোষণা করে দিল 'গোল্ড ডিস্ক'! ততদিন অবধি আমাদের ধারণা ছিল গোল্ড ডিস্ক মানে পঞ্চাশ হাজার ইউনিট। তলব করতে জানা গেল সে সংখ্যাটা রেকর্ড-ক্যাসেট মিলিয়ে নেমে এসেছে পনেরো হাজারে। আর সেই পনেরো হাজারও সত্যিই বিক্রি হয় কি না তা নিয়েও ঘোর সন্দেহ। আধুনিক গান এবং শ্রোতার মধ্যে প্রথম বাস্তব বিভাজনের সেই সূত্রপাত।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের কুড়ি বছরের মধ্যে তিনটি বড়ো ঘটনা ঘটে গিয়েছে বাংলা গানে। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের (যাঁকে পরে চিনতে হল কবীর সুমন বলে) আবির্ভাব ও উত্থান, রিমেক গানের আগ্নেয় বিস্তার এবং ব্যান্ডের রমরমা দবদবা ঘ্যামঘ্যামা। সুমনের গান বাংলা আধুনিকেরই এক প্রলম্বিত পর্ব বলে মনে করার কারণ আছে, কারণ এর প্রধান অস্ত্র কবিতা এবং সুর। সলিল চৌধুরীর পর কবিতা ও সুর নিয়ে এত আন্দোলন আর কারও কাজে হয়নি। বিশুদ্ধ, পরিণত কবিতা নিয়ে গান সুমনের আগে যিনি বেঁধেছিলেন তিনি, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ। ফলে বাংলা গানে সুমনের

আবির্ভাব ও প্রসার একটা কোয়ান্টাম লিপ। উপরন্তু ওঁর গান নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মকে যেভাবে এক সুরে গাঁথল তা এক কথায় বৈপ্লবিক। হেমন্তবাবু বেঁচে থাকলে আহ্লাদে আটখানা হতেন, হয়তো ওঁর এক-আধটা গান গাইতেও চাইতেন।

তবে সুমনের গানের যেটা মস্ত প্রভাব তা ত্রিবিধ। এক, আধুনিক কবিতার একটা পাকা ঘর তৈরি হল বাংলা গানে। তাতে তৃতীয় শ্রেণির 'আমি আর তুমি' কেস গীতিকারদের কাজ গেল। হঠাৎ করে সেরা পুরোনো আধুনিকের দিকে নজর গেল মানুষের। আবার আধুনিক লিরিক ও গিটার হাতে কিছু কণ্ঠহীন, কম সুরের গায়ক-গায়িকার দৌরাত্ম্য হল। সুখের কথা যে সুমনের রাস্তায় দুটি চমৎকার গানওয়ালাও এসে পড়লেন আসরে—নচিকেতা ও লোপামুদ্রা।

এই সুমন ঘরানায় যাঁকে ফেলতে পারি না, অথচ যাঁর কণ্ঠলাবণ্যে বাংলা আধুনিককে নতুন করে খুঁজে পাই তাঁর নাম শ্রীকান্ত আচার্য। আমি শ্রীকান্তকে হেমন্তরই উত্তরসূরি জ্ঞান করি, বাংলা আধুনিকে যে-একটা রাবীন্দ্রিক মেজাজ বইয়ে দিয়েছিলেন হেমন্ত তার কিছুটা শ্রীকান্ততেও আছে। আর রাগসুরের মূর্ছনায় বাংলা লিরিককে নিবিড় ভাবে ধরার এক প্রাণজুড়োনো স্টাইল দেখেছি মনোময়, রূপঙ্কর, শুভমিতার গানে। এখনকার বাংলা গানে শ্রীকান্ত এবং এই তিনজনের নতুন কাজের অপেক্ষায় থাকি। এবং, অতি অবশ্য, শ্রেয়ার। লতা, গীতা, সন্ধ্যা, প্রতিমা ও আরতির পর যাঁর মতো আকর্ষক মহিলা কণ্ঠ হয়েছে বলে মনে হয় না। ওঁর হিন্দি গানের মধ্যেও আমি একটা বাংলার আওয়াজ শুনতে পাই।

সুমনের যুগটা হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল কেন এ নিয়ে কম তর্ক নেই। একটা প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, সুমন এক ওয়ানম্যান ইন্ডাস্ট্রির মতো। দুর্ধর্ষ কবিতা তো আছেই, তার সঙ্গে ওই এক বিলিতি বাউল মেজাজ এবং ওই নাদ ও কান্না মেশানো রেশমি কণ্ঠ। আজকাল অনেককেই ওঁর গান গাইতে দেখি কেমন একটা হাফগেরস্ত ঢঙে, ভাল্লাগে না।

তবু সুমনের প্রভাবেই বাংলা গানের মুখ বদলেছে। বাংলায় যে ব্যান্ড গান এল তার একটা কারণও সুমন। যেভাবে আমরা সব ব্যাপারে ভুবনীকৃত হচ্ছিলাম তাতে একটা না-একটা সময়ে ব্যান্ডগান আসতই। আসাটা ত্বরান্বিত হল পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে ব্যান্ডসংগীতের সফল বিস্তারে। তবে ওদের ওই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গানের বাণীর দুর্বলতা মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ছিল। সুমনের প্রভাবে এখানকার ব্যান্ডগীতিতে ঝাঁ চকচকে কবিতার প্রয়োগ প্রথম দিকে দিব্যি মুগ্ধ করে দিচ্ছিল আমাকে। সুমনের সেই 'তোমাকে চাই'-এর পর

'ভূমি'-র 'বারান্দায় রোদ্দুর' তো একটা পথফলক সৃষ্টি হয়ে গেল। 'চন্দ্রবিন্দু গোষ্ঠীর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রিল ভট্টাচার্যের গলা ও কথায় ব্যান্ডেরও নির্জন ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ছিল, ব্যান্ড মানেই সম্মেলক হল্লা, যান্ত্রিক সুনামি নয়। ভালো লাগছিল ভূমির গানও, তাতে বাংলার লৌকিক সুরের অঢেল আনাগোনা।

দৈবক্রমে হেমন্তবাবু ফিরে এলে এ পর্যন্ত যা-যা বললাম তা দেখে বিভ্রান্ত, বিস্ত্রস্ত হতেন না। দুর্ভাগ্যের, যে বাংলা গান কিন্তু এভাবেও থেকে যেতে পারল না। এখনকার বাংলা গান বলতে যদি ব্যান্ড বোঝায় সে-ব্যান্ডকে বাংলা ব্যান্ড বলার কোনো মানে হয় না। সে-ব্যান্ডে যে-বাংলা কথা গাওয়া হচ্ছে তাই তো ধরা পড়ে না। আর ব্যান্ড মানেই যদি দেড়শো ডেসিবেল, চল্লিশ হাজার ওয়াট এবং নাচের কুস্তি তাহলে তাকে গান বলাই বা কেন। অথচ এদের নিয়েই এখনকার ব্র্যান্ডমেকারদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। Gaan can go to hell.

একটা সাফাই অবশ্য ব্যান্ড এবং ব্র্যান্ডওয়ালারা গাইতেই পারেন—বেঁচে থাকলে বা মৃত্যুর এতকাল পর ফিরে এসে হেমন্তবাবু কী ভাবতেন, না-ভাবতেন তাতে কী এল গেল। যেভাবেই হোক বাংলা গানকে তো টিকতে হবে বাজারে। অকাট্য যুক্তি, আর এর জবাবটাও অকাট্য। টিকতে তো হবে নিশ্চয়ই, তবে টিকতে কি পারছে? কল শো-এ ডার্ক এবং যে-কোনো ইভেন্টে—রাবড়ি রসগোল্লা কেক প্যাটিস থেকে নেল পলিশ, শু পলিশ, গাড়ি বাড়ি বিদেশপাড়ি ভুঁড়ি ছুঁড়ি নারী ত্বক—সবখানেই ভিড় জমানো, ভিড় ভাঙানো, শব্দের বাজি ফাটানোর জন্য ব্যান্ড ডেসিবেলের দরকার পড়ছে। যে-কোনো জলসা ভরানোর জন্য ব্যান্ড চাই-ই চাই। কারণ ব্যান্ড একটা সোশ্যাল ফেনোমেনন। একটা পর্যায়ে পৌঁছে ব্যান্ড না-হলে ভিড় নাচবে কীসের সঙ্গে? পুজোর প্যান্ডেল মাতোয়ারা হবে কীসের তালবেতালে? ফলে বাণী ও সুরের মিলনে গান সেই বেদের আমুল থেকে বয়ে আসা ফর্মুলাটা আর কিন্তু লাগসই থাকছে না। ব্যান্ডের গলা তার হরেক যন্ত্রের এক অন্য প্রকার হয়ে যাচ্ছে। নুম তোম বা তারানা গাওয়ার স্বাধীন, সুসংস্কৃত, তুঙ্গকণ্ঠ নয়, রক্তমাংসের ধ্বনিযন্ত্র। তাও খুব হেলাফেলার নয়, কারণ নানা ইভেন্ট ও জলসায় আজকের যুবশ্রেণির সঙ্গে এদের যে তালমিল ও আন্তঃক্রিয়া তাকে ছোটো করার কে আমি বড়োঠাকুর! এটা তো ঘটনা যে ব্যান্ডের এইসব প্রায় নামগোত্রহীন গায়করাই যুবশ্রেণিকে দিচ্ছে তাদের value for money. আজকাল কেউ তো আর value for time বা remains of the day নিয়ে ভাবে না, সময়টার কী মূল্য দাঁড়াল বা দিনশেষে কী নিয়ে বাড়ি ফিরলাম;

আজকের গানের বেশির ভাগটাই তাৎক্ষণিক, তিন ঘণ্টার প্যাকেজে যেখানে শুরু সেখানেই শেষ। কবিতার জায়গায় বাণীর লিরিকে ভর করছে দিনের হেডলাইন, রোয়াকের সামাজিক মন্তব্য, social commentary; হয়তো (আমি ঠিক জানি না) আজকের নবীন প্রজন্মের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার জ্বালা, হতাশা ও কান্নাও (অদক্ষ কথায় বলা, শব্দবাজিতে চাপা পড়া) তাতে থাকে যা চিৎকারে চিৎকারে ফুরিয়ে যায়। গান শেষে যা দাঁড়ায় তা, শক্তির একটা কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম ধার করে বলতে, 'সকলে প্রত্যেকে একা'।

হেমন্তবাবু ফিরে এসে এসব দেখে কী বলতেন জানি না, কারণ উনি কখনও নবীন প্রজন্মের নিন্দে করতেন না, তবে পুলকিত বিস্ময়ে নজর করতেন যে ওঁর তাবৎ গানের বিক্রির বহু গুণ বেড়েছে, অজস্র শিল্পী ওঁর গানের রিমেক করছেন, ওঁর গানের রয়্যাল্টির বহর সমানে এক নম্বরে। ওঁর বন্ধু সলিল চৌধুরীর ঘরানার সুরকারদের নবোত্থান হয়েছে, আর যাঁর লিপে গান বসানোর জন্য তাঁর এত সুনাম সেই উত্তমকুমারের মতো তাঁরও লাইফসাইজ মূর্তি বসেছে শহরে, লোকে তাঁকে উত্তমের মতো আইকন জ্ঞান করে। মৃত্যুর আগে যে-এক অল্প বিষণ্ণতায় তাঁকে গ্রাস করত মাঝেসাঝে তা কেটে যেতে পারত।

আবার ভাবি, কাটত কি? যে-লোকটা জনতার সঙ্গ পাওয়াকে লক্ষ্য করেছিলেন তিনি নিছক স্ট্যাচু ও রয়্যাল্টি দেখে মুগ্ধ থাকতেন? যুবক-যুবতিদের গানের মেজাজ দেখে ভাবতেন না কি যে, আমার গান তাহলে আজও কেনে কারা? শ্রোতৃসমাজের পছন্দের এই বিকট বিভাজন দেখে কিছুতেই খুশি হওয়ার কথা তাঁর নয়। তবু সবটা মেনে নিতেন, নতুনরা না চেনার থেকে পুরোনোরা তাঁকে ভুলে গেলে তিনি ঢের বেশি কষ্ট পেতেন। গানকে যিনি 'কাজ' বলতেন তিনি আজ ফিরে এলে কাজ পেতেন না ঠিকই, কিন্তু সন্ধেবেলায় সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে যেতে যেতে কোনো জানলা দিয়ে কোনো বাড়ির টিভিতে 'চাওয়া-পাওয়া' ছবিতে উত্তমের ঠোঁটে ওঁর গান ভাসছে দেখলে হয়তো থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। চোখের এক বিন্দু জল আঙুলে সরাতে সরাতে গুনগুনও করতেন 'যদি ভাব এ তো খেলা নয়, ভুল সে তো শুরুতেই।' মনে পড়ত যে-কথাটা আমাকে বলেছিলেন আজ থেকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে—জানো তো, জীবনে সব চেয়ে বড়ো পুরস্কারই সেদিন পেয়ে গেলুম যখন শুনি এক ভিখিরি ভিক্ষে করছে সিনেমা থেকে আমার গানটা তুলে : 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে, নিও না, নিও না সরায়ে'। বেচারি জানেও না গানটা কত পুরোনো, আর গানটা রবি ঠাকুরের।

ছয় ঋতু জুড়ে হেমন্ত

বছর আট-নয় যাবৎ হেমন্তদা একটা যাই-যাই ভাব ধরেছিলেন। আমরা যারা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত তারা প্রথম-প্রথম খুব তটস্থ হয়ে থাকতাম। 'হেমন্তদা যদি না-থাকেন' এমন একটা আশঙ্কা থেকে সুযোগ হলেই, কাগজপত্রের বরাত পেলেই ওঁর সাক্ষাৎকার নিয়ে ফেলতাম। যা ক্রমে জড়ো হতে হতে একটা বইয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই বই 'আমার গানের স্বরলিপি' যেদিন প্রকাশ পেল তিনি তাঁর প্রথম কপি মাথায় ঠেকিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বললেন, ভারতরত্নের চেয়েও এ আমার বড়ো সম্মান।

এখন ভাবছি বইটা বেরুনোতে 'হেমন্তদা চলে যাবেন' এই উৎকণ্ঠা, আশঙ্কাগুলো খুইয়ে বসলাম কেন? কেন আরও আরও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করে রাখলাম না? কেন অন্ধ ভালোবাসা থেকে ভেবে বসলাম হেমন্তদা অমর। কিংবদন্তির আবার মৃত্যু কীসের? কেন ভুলে গেলাম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়েরও একটা রক্তমাংসের দেহ আছে, জ্বরজারি, সর্দিকাশি হাঁপানি হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য আছে? ফলে সত্যি যখন হেমন্তদা আর থাকলেন না আমি এবং আমার মতো অগণিত মানুষ ভাবতে বসলাম, হঠাৎ এটা কী হল!

আসলে যা হবার তাই হয়েছে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হৃদ্‌যন্ত্রের কাজকর্ম ২৬ সেপ্টেম্বর মধ্যরাত থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাঁর ৬৯ বছর বয়সী কণ্ঠে আর গান গাইছেন না, ফাংশনে ফাংশনে গাইতে কিংবা সংবর্ধনা নিতে যাচ্ছেন না, হ্যাঙার থেকে নামিয়ে ধুতি-শার্ট পরছেন না, টেলিফোন তুলে ভরাট কণ্ঠে বলছেন না, 'হ্যালো', বাড়ির মানুষ সনৎবাবুকে হাঁক পেড়ে বলছেন না 'সনৎ! আমি বেরুবো', তাঁর নিজস্ব টেবিলে আনমনে তাল ঠুকছেন না টুক টুক করে, বারান্দার ওপারে সবুজ গাছগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেলে গালে হাত দিয়ে অবান্তর ভাবনা ভাবছেন না বা টিভি চালিয়ে উত্তমকুমারের ছবিতে উত্তমের ঠোঁটে নিজের গান শুনছেন না। তা বলে আমরা যাকে মৃত্যু বলি সেইটা ওঁর হয়েছে বলে বলা যায় না। গোটা দেশটা কীরকম গমগম করছে হেমন্তর গানে, গলায়। আর কী ভীষণ ভালো লাগছে,

বিষণ্ন লাগছে, আবার ভালো লাগছে হেমন্তর এই সর্বব্যাপিতা। শহরের এক বিশেষ বাড়ির ঠিকানা বদলে হেমন্ত উঠে এসেছেন শহর ও পল্লির যত্রতত্র। দেশের মানুষের সঙ্গে থাকার যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তিনি চুয়ান্ন বছর ধরে একটু একটু করে সেরে আনছিলেন হঠাৎ তার সরকারি, উচ্চ আদালত ডিক্রি হয়ে গেল যেন। 'হেমন্তদা চলে যাবেন' এই ভয় আর আমাদের পেতে হবে না। 'হেমন্তদা আছেন' এই আশ্বাস বিশ্বাস স্তোকেরও প্রয়োজন নেই। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একটা অনড়, অকাট্য 'ঘটনা' হয়ে গেলেন। ছিলেন জীবন্ত কিংবদন্তি, কিন্তু কিংবদন্তির সেই ধোঁয়াশাও মিলিয়ে যাচ্ছে। উনি একটা সাধারণ 'বাস্তব' হয়ে উঠলেন। দিন, রাত, আলো, আঁধার, বাতাস, জল, পাখি, পাখির গান, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভালো ও খারাপ সাহিত্য, সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত এবং হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের মতন। 'হেমন্ত নেই' এইটা আর হবে না। 'হেমন্ত আছে' এইটা বলার দরকারও ফুরোল। হেমন্ত 'হেমন্ত' হয়ে গেল।

এতখানি কিন্তু হেমন্ত কোনোদিনই আশা করেননি।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা-টাঙ্ক্ষার ধার বিশেষ ধারতেন না। উচ্চবিত্তের মতো পয়সা রোজগার করেও সারা জীবন থেকে গিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত। শুধু মধ্যবিত্তই নয়, কিছুটা যেন বা ছা-পোষা। 'মেয়েটার কী হল?' 'ছেলেটা কেমন আছে?' 'অজিতটার (বন্ধু অজিত চ্যাটার্জি) অসুখ কি সারল?' 'তারা (ভাই তারাজ্যোতি) এলো না কেন?' 'তনুবাবুর (তরুণ মজুমদার) নতুন ছবি কি লাগল?'— এইসব এককাঁড়ি চিন্তা সারা মাথায় সারাক্ষণ আটপৌরে ভাবটাকে একটা শিল্পের পর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এল, সনৎবাবু এসে মনে করালেন রবীন্দ্র সদনে গান আছে। অমনি তৈরি হয়ে ফিয়েটে চড়ে সেখানে। আর স্টেজে উঠে ডায়াসে বসে, সামনে চেয়ারে রাখা হারমোনিয়ামে একটু সুর তুলেই বিরল মাধুর্যে ধরে ফেললেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।' আর তৎক্ষণাৎ গায়ে রোম দাঁড়িয়ে গেল আমাদের, যারা এই লোকের কণ্ঠে বহুশ্রুত কিছু গান শুনে নতুন ভাবে রোমাঞ্চিত হব বলে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটেছি ছ-দিন আগে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে যাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়া মাত্র আমাদের এই মস্ত শিহরণ সেই মানুষটি কিন্তু তাঁর গানের এই রসায়ন, ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবতেন না। গানকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন 'কাজ'। বলেছেন, 'আজ এখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষার সময়। তুমি জানতে চাইলে এখন আমার মনে কি রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান আসছে। এমনি বৃষ্টি পড়লেই আমার মনে বর্ষার গান আসে না। বরং, আমি বৃষ্টির দিকে চেয়ে

বসে থাকি। মাঝে মাঝে একেকটা গান মনে এলেও আসতে পারে। তবে তেমন কিছু না। আকাশে হয়তো খুব মেঘ জমেছে, বৃষ্টি আসবে-আসবে ভাব—তখন কি কোনো গান দিয়ে রিঅ্যাক্ট করতে ইচ্ছে হয় আমার? রবীন্দ্রনাথের কোনো গান কি মনে আসে? ঠিক সেরকম কিন্তু মনে আসে না। বৃষ্টিবাদলের দিনে আপন মনে গান গেয়ে উঠিনি। আমি গাই বড়ো কম। যেটুকু লোকের সামনে গাইতে হয় বা রেকর্ড করার সময়। তা ছাড়া বাড়িতে আমি গাই না। তবে বর্ষার গান যখন গাই তখন মনের মধ্যে বৃষ্টি ফিরিয়ে আনার জন্য একটা সচেতন ভাব থাকে, সেটা এসে যায়।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বর্ষার আবেগে উদ্‌বেল হয়ে যেমন-তেমন গাইলেই শ্রোতার মনে বর্ষা নামবে না। মনের বর্ষা লুকিয়ে আছে কথায় ও সুরে, যাকে নিখুঁত করে গাইতে হবে, যা নিখুঁত করে গাওয়ার মধ্যে সুর রস ও বাণীর পূর্ণ সংযোগ বোঝায়। যা সচেতনভাবে, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে করতে হবে এবং এই করাটা একটা 'কাজ', শিল্পীর কাজ। হেমন্তর গানকে বলা হয়েছে কাব্যিক, কারণ কাব্য সেখানে তার যাবতীয় পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয়। হেমন্ত নিজেও বলেছেন যে কবিতার মধ্যে যে-ছবি সেই ছবিকে সুরে সুরে ফুটিয়ে তোলাই তাঁর গান। কিংবা 'কাজ'। ওঁর অনুপম রোমান্টিক বাংলা আধুনিকগুলোকেও তিনি পাওয়ারফুল ওভারফ্লো অফ ইমোশন হিসেবে দেখেননি। বলেছেন, ভেবে ভেবে রোমান্টিক অনুভূতিটাকে বার করতে চেষ্টা করেছি সুরে। কবিতার মতো, সংলাপের মতো করে বলে গেছি কথাগুলোকে। শুধু সুরে। আর আমরা যোগ করব, লিরিককে তিনি বলে গেছেন প্রেমের সংলাপের মতো।

কিন্তু এই প্রেমের সংলাপ বলাটাকেও কি 'কাজ' বলা হবে? হেমন্তর মতে, ঠিক তাই। এই সংলাপ বলার জন্যও একটা হারমোনিয়াম চাই, বাঁধা সুর চাই, প্রত্যক্ষ শ্রোতা কিংবা স্টুডিয়োর আয়োজন চাই, গানের একটা পরিবেশ চাই আর এই এতগণ্ডা জিনিসের সংযোগেই হতে পারবে গান। পেশাদারি গান। অল্প বয়সে গানকে পেশা করার পর বাকি জীবন তিনি গান গেয়েছেন পূর্ণ পেশাদারিত্বে। কাজ হিসেবে। জীবিকা হিসেবে এবং সেভাবে হেমন্ত সে কথা না বললেও, জীবন হিসেবে। ফলে তাঁর সমস্ত নিবেদন থেকে একটা নির্ভুল পেশাদারিত্ব ও একটা সঠিক ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে। আমরা যখন কোনো হেমন্ত-নিবেদন শুনি আমরা এই ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বটির প্রেমে পড়ি। উনি যা 'কাজ' মনে করে গাইছেন তাই ক্রমে ক্রমে আমাদের আপ্লুত করে রোমান্টিসিজম হিসেবে। আমরা গানের রসায়নে দ্রবীভূত হয়ে শিল্পীটিকেও মনে করে নিই রোমান্টিক।

অবশ্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রোমান্টিকও। মধ্যবিত্ত বাঙালির নাড়ি তিনি জেনে গিয়েছিলেন। ফুল শার্ট আর ধুতি পরা এই মানুষটারই একটা স্ক্রিন ইমেজ হয়ে উঠেছিলেন 'শাপমোচন', 'চাওয়া-পাওয়া', 'বন্ধু', 'দুই ভাই', 'ইন্দ্রাণী', 'সবার উপরে' ইত্যাদি ছবির নায়ক উত্তমকুমার। হাফ হাতা শার্ট ও ধুতির অভিমানী মধ্যবিত্ত বাঙালি ইমেজও একটা রপ্ত করেছিল উত্তম অভিনীত কিছু কিছু চরিত্র। যাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেল হেমন্তর স্বর্ণালি, রোমান্টিক কণ্ঠ। ক্রমে উত্তম ও হেমন্ত দুজনেই গলে গলে নিশ্চিহ্ন হলেন একটি ইমেজ, ভাবমূর্তিতে। যে-মূর্তির সঙ্গে নিজেদের ষোলো আনা মিলিয়ে নিতে পারত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অধিকাংশ বাঙালি যুবা। উলটো দিকে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলার জন্য বাঙালি যুবতীরা পেয়ে গেল সুচিত্রা সেন-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জুটিকে। এটা ঘটে যাওয়ার পেছনে কোনো গৎ, কোনো বন্দিশ, কোনো পরিকল্পনা কাজ করেনি, সমাজ ও সময়ের নিজস্ব নিয়মেই এটা ঘটে গিয়েছিল। হেমন্ত তাঁর গানকে 'কাজ' মনে করতেন আরও একটা কারণে। এই গান গেয়েই তাঁর সংসার চলত, নাম-যশ হত, স্বাচ্ছন্দ্য আসত, মানুষের সঙ্গে গিয়ে মিশতেন তিনি। এটা না-করে তাঁর চলত না। বলেছিলেন যে গান কখনও তাঁর কাছে শৌখিনতা, বিলাসিতা, জীবনের অলংকার হয়নি। গানকে যিনি জীবন করেছিলেন তাঁর কাছে গান অলংকার হবেই বা কোন সুবাদে? ফলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান গেয়ে যেতে পারাটাই তাঁর একমাত্র প্রার্থনা ছিল ঈশ্বরের কাছে শেষ জীবনে এবং জীবনের আরও অনেক প্রার্থনার মতো তাঁর এই বাসনাটিও অপূর্ণ রাখেননি ঈশ্বর। মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও ঢাকায় সরকারি আয়োজনের অনুষ্ঠানে তিনি পরপর আঠারোটি গান গেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন বাংলাদেশী শ্রোতাকে। কলকাতায় ফিরেও তাঁর কথা ছিল একটা বড়ো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার। শরীরের কারণে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অপারগ হওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন কাগজে। যা দেখে হেমন্তর বহু অনুরাগীই প্রশ্ন তুলেছিলেন, ওঁর কি এই শরীরেও না গাইলেই নয়? সত্যিই না গাইলেই চলত না হেমন্তদা-র। আর তার কারণ দুটো। প্রথমটা একেবারেই আটপৌরে, মধ্যবিত্ত। অল্প বয়স থেকেই সংসারের হাল ধরেছিলেন তিনি। বিয়ের পর স্ত্রী বেলাদেবীর সংসারেরও অভিভাবক হন তিনি। এ ছাড়া বন্ধুবান্ধবেরও প্রয়োজনে তিনি ছিলেন দরাজহস্ত, সুখ-দুঃখের সাথী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সাংসারিক দায়দায়িত্ব তিনি অকাতরে পালন করে গেছেন। কোনো ক্ষোভ নয়, বরং একটা সূক্ষ্ম তৃপ্তি পেতেন এইভাবে নিজেকে জড়িয়ে, প্রয়োজনীয় করে রেখে। দ্বিতীয় কারণটা শিল্পী স্বভাবের সঙ্গে সংযুক্ত। গানকে

তিনি এমনই কাজ মনে করতেন যার থেকে রিটায়ার করা যায় না। ওরকম নাটকীয় ভাবে না বললেও আড়েঠারে তিনি কখনো-কখনো বুঝিয়ে দিতে কসুর করেননি যে গান তাঁর শেষ পারানির কড়ি। বলেছিলেন, 'এই পঞ্চাশ বছরের ব্যাপারগুলোয় মনে হয় যে একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। তবে নিজেকে পূর্ণ মনে হয় না। আমার শরীরটা নিয়ে এত বেশি চিন্তিত যে সেটাকে আমাকে ভালো করতেই হবে। যাতে করে যে-কটা দিন বেঁচে আছি গান যাতে শোনাতে পারি। বেঁচে থাকার এ আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।' এখানে বিশেষ লক্ষণীয় হল দুটো কথা। 'গান যাতে শোনাতে পারি।' হেমন্ত শুধু গাইতেই চাননি, নিজের জন্য, আত্মভোলা হয়ে। তিনি 'শোনাতে' চেয়েছেন। কারণ শিল্পীর এটাই ধর্ম। দ্বিতীয় ব্যাপার হল যে, গান শোনানোকে তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলেছেন। ইন্টারভিউতে বলা একটা গালভরা কথা যে এ নয় তার এক মস্ত প্রমাণের কথাও আমি জানি। আমাদের এক বন্ধু এবং হেমন্তদার এক অন্ধ অনুরাগী বরুণ বক্সি একবার একটা প্রস্তাব শিল্পীকে দেন। প্রস্তাব হল যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'হেমন্তর শেষ অনুষ্ঠান' বলে একটা আসরের আয়োজন সে করবে। সেই অনুষ্ঠানে থেকে সে অন্তত বিশ লক্ষ টাকা তুলে দেবে শিল্পীকে। তাতে হেমন্তদার যাবতীয় খুচখাচ প্রোগ্রাম করার প্রয়োজন মিটে যাবে। শর্ত শুধু একটাই : তিনি আর আসরে গান গাইতে পারবেন না।

হেমন্তদা তাঁর এই বিশুদ্ধ হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রস্তাব শুনে বহুক্ষণ নীরব ছিলেন। তারপর হতাশভাবে বললেন, স্বগতোক্তির মতো, আর গান গাইতে পারব না! তাহলে থাকব কী নিয়ে? না বরুণ, এ হয় না। এ আমি পারব না।

এদিক দিয়ে দেখলে এই নিটোল সাংসারিক লোকটি ছিলেন নিটোল রোমান্টিকও। আর তেমনধারা ছিলেন বলেই না 'রানার', 'পালকির গান', 'গাঁয়ের বধূ' যে অতুল্য মাহাত্ম্যে গাইলেন ঠিক সেই সিদ্ধিতে গাইতে পারলেন 'লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে', 'যদি ভাবো এতো খেলা নয়', 'তোমার আমার কারো মুখে কথা নেই', 'এই রাত তোমার আমার' বা 'কাছে রবে, কাছে রবে'র মতো নিবিষ্ট প্রেমের গান। আমরা ক-বার ভেবেছি সরলভাবে যে হেমন্ত কত শত বিক্ষিপ্ত উপাদান ও প্রণালীর সূক্ষ্ম সমাহারে এক গভীর সংহতি? হেন ঢং আছে যা তিনি গাননি? কিংবা গেয়ে মর্যাদা আদায় করেননি? আর সেইসব ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে কী-ই বা তালিম ছিল ওঁর? আমরা এগুলো ভাবি না কারণ ভাববার সুযোগই আমাদের দেননি কখনও হেমন্ত। 'পলাতক' ছবির লোক-আঙ্গিকের গান শুনে যে অবাক বিস্ময় আমাদের হয় তারপর কখন আর ভাবার সুযোগ পাই যে এই হেমন্ত প্রথম

যৌবনে শচীনদেব বর্মনের গান শুনতেন বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পীর বাড়ির বাইরে জানালার নীচে দাঁড়িয়ে? একলব্যের মতো এই স্বয়ংসিদ্ধ দক্ষতা তাঁকে দূর থেকে অনেক মহৎ শিল্পীর প্রভাব জুগিয়েছে। কোনো কিছুই তাঁকে নাড়া বেঁধে শিখতে হয়নি, সবই তিনি পেয়েছেন ভাব ভঙ্গি ও ইশারায়। আর সব কিছুই নিজের মধ্যে, নিজের মতন করে মিলিয়ে সব কিছুকে আগমার্কা হেমন্ত স্টাইলে পরিণত করেছেন। তাঁর অনবদ্য রবীন্দ্রসংগীতই তিনি শিখেছেন বলতে গেলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের থেকে। অর্থাৎ ধ্যানে ও মননে। স্রেফ কবিতার অর্থ অনুসরণ করে স্বরলিপির প্রয়োগে ও হৃদয়ের সংযোগে তিনি একেক রবীন্দ্রগানকে চিরকালের ফর্ম্যাট বানিয়ে রেখে গেছেন। শুনে বিগলিত হওয়ার পর ভেবে স্তম্ভিত হই যে এই লোকটির রবীন্দ্রসংগীতেও কোনো আশ্রমিক ছাপ ছিল না। প্রথম জীবনে পঙ্কজকুমার মল্লিকের ঢঙে গাইতেন, তারপর খোলস ছাড়িয়ে এক সময় বেরিয়ে এলেন স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত, পরিমার্জিত বলিষ্ঠ জিনিয়াস। ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'সত্তরের দশকের হেমন্ত' ক্যাসেটে 'কৃষ্ণকলি' গানটি শুনে আমার মনে হল যে ১৯৭৯-তে ফাংশন থেকে রেকর্ড করা এই নিবেদনটির জন্যই যেন গানটি অপেক্ষায় ছিল এতকাল, এত দীর্ঘকাল। অতি অসাধারণ ভাবে 'কৃষ্ণকলি' ইতিপূর্বে গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র ও শান্তিদেব ঘোষ। কিন্তু গানটি অবশেষে সত্যি-সত্যি চলে গেল হেমন্তর দখলে। সুচিত্রা ও শান্তিদেবের প্রতি আমার শ্রদ্ধার অন্ত নেই, কিন্তু এই কথাটা আজ না বললে হেমন্তদা-র প্রতি অন্যায় করা হবে।

ক্যাসেটটা শোনার পর যখন মনের ভাব শিল্পীকে ফোন করে বলি উনি পুলকিত বিস্ময়ে প্রথমে বললেন, তোমার এত ভালো লেগেছে? তারপর বিনম্র ভাবে বললেন, ওটা সুচিত্রার প্রিয় গান তো। তাই বিশেষ গাই না। গানটা ওরই থাক। আমার ক্যাসেটটা তোমরা শুনো।

তো এই ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমার কাছে। মায়া মমতা বিনয় ও প্রতিভার মিশেলে এক আশ্চর্য মানুষ। আমি সত্যিই ভীষণ মুগ্ধ হয়েছি সত্যজিৎ রায়ের কথায়। তিনি মানুষ হেমন্তকে খুব শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন! এই মহৎ মানুষটির কথা বহুবার আমাকে বলেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই মানুষটির কথা 'স্বরলিপি' বইটির জন্য লিখে জানিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। আর অনেকখানি জেনে ফেলতে পেরেছি আমি নিজে নিজেই। কোনো উষ্মা নেই, বিরাগ নেই, ব্যথা আছে কিন্তু বিক্ষোভ নেই, আর আছে অঢেল, অফুরন্ত ক্ষমা। কত বিদ্‌ঘুটে সমালোচনা বেরিয়েছে ওঁর গানের, ওঁর সাফল্যের, কিন্তু ওঁর কোনো বিকার নেই। নিজের স্বাস্থ্য ও সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তা ছিল, কে কী বলল, না-বলল তা নিয়ে

নিতান্তই নীরব। দুঃখ করে একবার শুধু বলেছিলেন, আমার গান থাকলেই আমি থাকব, নিন্দে বা প্রশংসা দিয়ে রেকর্ড কাটানো যায়, তাও এক এডিশন। তার বেশি কিছু হয় না।

একাশি সন অবধি হেমন্ত তাঁর প্রযোজনার ফ্লপ ছবির মাশুল গুনেছেন। চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো ধার পাই-পাই শোধ করেছেন। তারপর যখন একটু হাত-পা ঝাড়া ভাব হল ঠিক তখনই হার্টের রোগ ধরল। অসম্ভব হ্যান্ডসাম চেহারা ভেঙে গেল। রোগা হয়ে গেলেন। কিন্তু লড়াই ছাড়লেন না। গেয়ে গেয়ে তিনি বেঁচে রইলেন প্রবলভাবে। আর তখন ঢল নামল সম্মান, শ্রদ্ধা, সংবর্ধনার। যেমনটি আর কোনো বাঙালি শিল্পী কখনও পাননি। নিয়তির এক অদ্ভুত খেলা দেখলাম হেমন্তর সঙ্গে। তাঁকে কত দেয়, আবার ফিরিয়ে নেয়, তারপর আবার উজাড় করে দেয়। হেমন্ত সব নেন একটা অভিমানী বালকের মতো মুখ বুজে। যার খেলনা হারালে কাঁদে না, খুঁজে পেলে হাসতে ভুলে যায়।

শেষে সেই নিয়তিকেও জব্দ করে দিয়ে গেছেন হেমন্ত। বাঙালি জাতিকে নিকেশ করতে না পারলে এই মানুষটিকে আর মুছতে পারবে না নিয়তি। হয়তো সেটা সে চায়ও না। নাহলে ওঁকে দিয়েই গাইয়ে নিয়েছিল কেন সেই গান? — 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।'

বিশ সাল বাদ

আজ, ২৬ সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর ভোরে সার্দান অ্যাভিনিউয়ে নিজের লাইফসাইজ স্ট্যাচুর দিকে এক বারটি তাকিয়েই কীরকম আনমনা হয়ে গেলেন হেমন্ত। ভাবলেন, ঠিকই তো, সেই কস্মিনকালে পঞ্চাশের দশকে গৌরীর কথায় গেয়ে দিয়েছিলাম 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'। তাতে কি অমরত্ব-টমরত্ব কিছু বোঝায়? জানি না। তা বলে গোটা একটা প্রমাণ সাইজ স্ট্যাচু! এসব তো রবি ঠাকুর-টবি ঠাকুরদের হয়। অবিশ্যি উত্তমেরও একটা হয়েছে দেখলুম স্টুডিয়ো পাড়ায়।

আরেকটি বার ঘাড় উঁচিয়ে নিজেকে দেখলেন হেমন্ত। তারপর ঘাড় নেড়ে নিজেকেই বললেন, বিশ্বাস হয় না।

হেমন্তর এটাও মনে নেই যে, আজ থেকে ঠিক, এক্কেবারে ঠিক কুড়িটা বছর আগে এই পাশের রাস্তা শরৎ চাটুজ্জে স্ট্রিটের আস্তানা থেকে ওঁকে মিছিল করে নিয়ে গেছল ভক্তরা সব। মনে নেই, কারণ ফুলমালায় চাপা পড়ে গভীর ঘুমে তখন। ওরা কী গান বাজিয়েছিল সে দিন? যাই বাজাক, সতীনাথের সুরে আমার ওই গানটি নিশ্চয়ই বাজায়নি। 'তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই, বাতাসের নেই সাড়া, থেকে থেকে শুধু কথা বলে ওই দূর আকাশের তারা'। আহা রে, শব্দ দিয়ে কী সুন্দর নৈঃশব্দ্য গড়ে নেওয়া!

গত কয়েক দিন পাড়ায় ঘুরে কথাটা দানা বেঁধেছে মনে। কত কত গান হয়ে গেছে এই ক-বছরে, যার ল্যাজামুড়ো কিছুই ধরতে পাচ্ছিনে। সে কালে এসব গানকে বলতুম কোরাস গান, এখন বলছে ব্যান্ড। এত কাণ্ড ঘটাল কে? করতে যে পারত সেই সলিলও তো শুনছি বহু দিন নেই।

প্রশ্নটা হেমন্ত নিজেকেই করেছিলেন, কিন্তু পাশ থেকে শুনে ফেলেছিল অনিন্দ্য। চন্দ্রবিন্দুর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। বড়োজনের পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল, দাদা, আপনি কিন্তু অনেক দিন পর এলেন। আপনার নিজেরই প্রোডিউস করা ছবির নাম ধরে বললে, 'বিশ সাল বাদ'।

হেমন্ত বেশ অবাকই হয়েছেন—তাহলে তুমি আমায় চিনলে কী করে?

মাথা চুলকে লাজুক হেসে অনিন্দ্য বলল, কারণ ভুলিনি বলে।

কথাটা মিথ্যে নয়, চাটুকারিতাও নয়, হেমন্ত টের পেয়েছেন এই ক-দিনে। ব্যান্ডের গানের তুমুল রবের আশপাশে আজও বাজছে ওঁর সঙ্গে অখিলবন্ধু, শ্যামল, সতীনাথ, মানব, দ্বিজেন, সুবীর, জটিল, মৃণালের গান। এরই মধ্যে হঠাৎ করে সেদিন ধনঞ্জয়ের 'অন্তবিহীন এই অন্ধ রাতের শেষ' শুনে রীতিমতো থমকে গিয়েছিলেন। কী আমেজ গানে, কিন্তু গলাটা তো ঠিক ধনঞ্জয়ের ঠেকল না।

পাশ থেকে কে একটা বলে উঠল, ওটা শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত আচার্য। ছেলেটা আপনার গানও দিব্যি গায়।

হেমন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে শুধোলেন, কোনটা গায়?

পাশের জন জবাব দিল, কেন 'মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে, যার চোখ তাকে আজ মনে পড়ে না'।

—তা কেমন গেয়েছে?

—খাসা।

—তা সে নিজের গান কী গায়?

—ভালোই গায়, আপনারই মতো বেশ একটা রাবীন্দ্রিক ভাব আছে আধুনিক গানে। আপনারই উত্তরসূরি।

উত্তরসূরি কথাটা সেই দ্বিতীয় বার শোনা হয়েছিল। কোথায় একটা নতুন ছেলের গান শুনে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। বাপ রে, এত দারুণ গান তো জন্মেও শুনিনি। এ কবে এল?

যাঁর বাড়িতে বসে সিডিতে শুনছিলেন সেই অনুরাগী বন্ধু সুবীর মজুমদার বললেন, আপনার তিরোধানের বছর পাঁচেকের মধ্যেই। আপনার বন্ধু সুদিনবাবুর ছেলে সুমন।

অ। তা ক-টা বছর আগে এলেই পারত। এর কথায়, সুরে আমিও না হয় ক-টা গান গেয়ে দিতুম। 'তোমাকে চাই'টা আরেক বার বাজাবে? পারলে আরেক বার শুনিয়ে দাও 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'। আহা, কী কবিতায় কী সুর!

সুবীর বললেন, আপনি চলে যেতে সে যে কী রব উঠল, বাংলা গান গেল, গেল। তখন এই তো এসে হাল ধরল।

বলো কী, একে কি হাল ধরা বলে? একে তো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বলে। যেমন সলিল এক সময় উড়িয়ে নিয়ে গেছল। এই শিক্ষাটাই তো রবি ঠাকুর দিয়ে গেছলেন। প্রাণ ভরে কবিতা করো, সুর তাকে ঠিক আগলে নেবে।

—তাহলে বলছেন একে আপনার উত্তরসূরি মানা যায়?

—আমার কেন, ও তো রবি ঠাকুরের বংশধর।

নিজের মূর্তি দর্শনের পর এবার ঠিক কোন দিকে যাবেন ঠিক করতে পারছিলেন না হেমন্ত। পদক্ষেপও একটু নড়বড়ে হচ্ছিল। এক বার ভাবলেন, পুলু, মানে সৌমিত্রর ওখানে যাবেন, পরক্ষণেই মনে পড়ল কে যেন বলেছিল, ওঁর অকৃত্রিম ভক্তটির অসুখবিসুখ যাচ্ছে। তাই ভাবনাটা বাতিল করে, একটা ৫৫৫ ধরিয়ে লেকের এক কোণে গিয়ে বসলেন। দুটো লম্বা টান দিতে মনে পড়ল সারেগামা-র করিমের মুখে দু-দিন আগে শোনা কথাটা—দাদা, আজও সব রকম মিলিয়ে আপনিই টপ সেল!

—কারা কেনে?

—ওটা অত সহজে বলা যাবে না, দাদা।

এখন নির্জনে বসে ক-দিন ধরে দেখা শহরের কালচারটা মনে করছিলেন। প্যান্ডেল জুড়ে কী গান, কী গান! কিন্তু এত যন্ত্র কেন?

এরই মধ্যে ভূমি দলটার 'বারান্দায় রোদ্দুর' শুনে হঠাৎ মনটা নেচে উঠল। এখনকার ছেলেমেয়েদের মুখের বুলিতে লোকগানের চলন। বেশ ওদের গানে কেমন একটা পল্লি মেজাজ যেন, কীর্তন, পালাগান সবই কেমন আপন মনে যাতায়াত করছে। সুমনের গানে যেমন একটা বিলিতি বাউল ভাব... অপূর্ব!

মনে পড়ল ওঁর জীবনীকার ছোকরার কথা। বলছিল, হেমন্তদা, আপনি চলে যাবার পর বাংলা গানে তিন-তিনটে পর্ব কেটে গেল। —তিন-তিনটে পর্ব! বলো কী গো? হেমন্ত যথার্থই বিস্মিত হয়েছিলেন। না জিজ্ঞেস করে পারেননি, কী কী পর্ব বলো তো? সেই ছোকরা, এখন আর মোটেই ছোকরা নেই, রীতিমতো বর্ষীয়ান, বললে, প্রথমে সুমন, পাশাপাশি এবং পরে রিমেক, তার পর থেকে এই যা শুনছেন—ব্যান্ড।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, তা সুমনের স্টাইলটার থেকে কেউ কিছু নিলে না?

এক কালের ছোকরা বললে, নিল না মানে? সব্বাই-ই তো নিল। আধুনিক কবিতায় সুর লাগিয়ে উচ্চারণ তো সব্বাই ধরে নিয়েছে। ওঁরই রাস্তায় গেছেন নচিকেতা আর লোপামুদ্রা। তারপর কে নয়?

হেমন্ত বলেছিলেন, তাতে তো ভালোই হওয়ার কথা। গানের আবার এ পাড়া, ও পাড়া, বেপাড়া কিছু আছে নাকি। এই দ্যাখো না, কাল রাতে কার একটা বাড়িতে শুনছিলুম আমার সেই 'এই রাত তোমার আমার'। তুমি তো জানো সে কালে কী চেল্লামিল্লি, ''হেমন্ত এটা কী করলেন! 'ব্রিজ অন দ্য রিভার কোয়াই' থেকে ঝেড়ে দিলেন!'' কই, কাল তো গানটা শুনে বেশ

ভিজেই আসছিল চোখটা কেমন। গানের আবার কোয়াই, খোয়াই আছে নাকি? যৌবনে রবি ঠাকুরের কত গান গেয়ে দিয়েও টের পাইনি সেগুলো সাহেবদের থেকে নেওয়া।

এই সময় এক নিতান্তই টিনএজার এসে প্রণাম করল হেমন্তকে। হেমন্ত 'করো কী! করো কী!' করে পা বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ছেলেটি ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বলল, আশীর্বাদ করুন যদি একটু গলা হয়।

হেমন্ত তোতলাতে তোতলাতে বললেন, গ-গ-গলা কেন?

ছেলেটিরও তোতলামি এসে গেল, একটু গা-গা-গান গাই যে!

সে জন্য আশীর্বাদ কেন? রেওয়াজ করো।

কিন্তু আমরা যে শুনেছি আপনার সোনার গলা রেওয়াজ ছাড়াই...

হেমন্ত বুঝে পেলেন না কী বলবেন ছেলেটাকে। ঠিক তক্ষুনি ওঁর প্রতিরক্ষায় চলে এল আরেক ছেলে। সেও ব্যান্ডের। তবে মাথার চুলে একটু পাক। একটা ঝুঁটিও আছে বলে মনে হল যেন। —দাদা, এরা এখনকার ব্যান্ড। বাজাতে বললে হেন যন্ত্র নেই বাজিয়ে দেবে না। তবে গাইতে বললে সমস্যা আছে।

হেমন্ত জিজ্ঞেস করলেন, কেন সমস্যা কেন?

—আপনি গলা নিয়ে জন্মেছেন, আপনাকে বোঝানো যাবে না।

—তা এরা তো যন্ত্র নিয়েও জন্মায়নি। সেসব তো শিখেইছে।

—তা শিখেছে। আর ওইটা শিখে গেলেই ভাবে ব্যান্ড হয়ে গেল।

—তাহলে বলি শোনো। আমার মা সারাটা জীবন ধরে একটা স্মৃতিকথা লিখতেন একটা লাল মোটা বইয়ে। তাতে এক সময় কী এক বিশ্বাসবশেই লিখে ফেলেছিলেন যে একদিন 'আমার হেমন্তরও ছবি বসবে সায়গল, পঙ্কজ, শচীনদেবের ছবির পাশে।' এটা জানা ইস্তক আমার তো আর অন্য কিছু ভাবারও উপায় ছিল না।

—সেটা তো ঘটেইছে। তবেই না...

সে ছেলের কথা শেষ হয়নি, হেমন্ত বেঞ্চি ছেড়ে উঠে হাঁটা ধরলেন। মনটা হঠাৎ কীরকম মুষড়ে পড়ল। জীবনের শেষ দিকে গলায় রক্ত উঠিয়ে গাইতে হয়েছে রোজগারের জন্য। এখন নাকি বারো মাসে তেরো পার্বণে ইভেন্টের ছড়াছড়ি। দল বেঁধে গাইলে বাজালে যে-কোনো আসর অবিলম্বে মাত। কই বাংলা গানে তো সেভাবে আর করুণ রস, শৃঙ্গার রস ফোটে না। বাংলা কথাগুলোও সেভাবে ফুটে বেরোয় না। তাহলে ওই যুবকটি এসে আশীর্বাদ চাইল কী জন্য? স্ট্যাচু দেখে?

এমন করে ভাবলে হেমন্তর এখনও ওঁর শেষ বয়সের সেই হাঁপটা ধরে। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হনহনিয়ে হাঁটা ধরলেন টালিগঞ্জ পাড়ার দিকে। উত্তমের স্ট্যাচুর নীচে একবারটি দাঁড়াবেন বলে। যেতে যেতে ভাবলেন রমা মানে সুচিত্রাটাই বা কেমন আছে ইদানীং। কী সব গান ওঁর জন্য গেয়ে দিয়েছিল সন্ধ্যা! আর সে-ই বা কেমন আছে কে জানে!

হেমন্তর আর স্ট্যাচু অবধি যাওয়া হল না। জীবনীকার ছোকরা বলছিল, লতা, গীতা, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আরতির পর এই এক আশ্চর্য মহিলা কণ্ঠ এসেছে বাংলা গানে। হিন্দিতেও নাম্বার ওয়ান। ওর হিন্দি গানেও বাংলার আওয়াজ শোনা যায়। শ্রেয়া। শ্রেয়া ঘোষাল। 'হেমন্তদা শুনবেন কিন্তু'—আর্জি ছিল ছোকরার।

গুটি গুটি উঠে গিয়ে নিজের ফেলে যাওয়া বাড়ির বারান্দায় গিয়ে বসলেন হেমন্ত। বিলকুল শুনশান বাড়ি। কিছু দিন হল বেলাও সংসারের ঠিকানা ছেড়ে চলে গেছে। বারান্দায় একলা বসতে পাশের বাড়ির থেকে ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠের গান। গীতার গানের আবেশ তাতে। তবে গীতা তো নয়। একটু লতার ছোঁয়াও কোথাও যেন। আহা, কী মিঠে বাঙালি ধ্বনি। ও কে? ও কী গাইছে?

সেই সকাল থেকে ওঁর পিছু নিয়েছে জীবনীকার ছোকরা, যে আর তত ছোকরা নেই, এ বার নিঃশব্দে ওঁর পাশের চেয়ারে এসে বসে বলল, হেমন্তদা, ওটাই শ্রেয়া। এই হালের একটা ছবি 'অন্তহীন'-এ গাওয়া ওর গান। 'চন্দ্রবিন্দু' বলে যে ব্যান্ড হয়েছে তার অনিন্দ্য ও চন্দ্রিলের লেখা কথা। আর...

ছোকরাকে কথা শেষ করতে দিলেন না হেমন্ত, আর সুরটা কে করল?

—শান্তনু মৈত্র বলে একটা খুবই নতুন ছেলে।

—ফার্স্ট ক্লাস। সে আর কী করেছে?

—শরৎবাবুর 'পরিণীতা'র হিন্দি ভার্সানের গানের কাজ।

—জমিয়ে দিয়েছে বলছ?

—আজকালকার স্টাইলে বললে ফাটিয়ে দিয়েছে।

—বলো কী? কী করে করলে?

—রবি ঠাকুরের 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' মুখড়া ধরে দারুণ একটা মুডসং। তার পর কোথায় না কোথায় চলে গেল সুর ভেঙে ভেঙে। সে গানেও শ্রেয়া।

—বাহ্! তাহলে বিশ সাল বাদে ফিরে ভালোই হাওয়া বদল হল।

হেমন্তর কান ফের টেনে নিল শ্রেয়ার 'যাও পাখি'। উনি ফের একটা ৫৫৫ ধরিয়ে চোখ বুজলেন। সেই চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করলেন রাগসুরের

কারা বেশ গায় যেন! শুনলাম এই ক-দিনে। নামগুলো ছাই মনে থাকে না। তাতে একটা মেয়েও আছে।

ছোকরা, সে আর অত ছোকরা নেই, বলল, শুভমিতা?

—ঠিক ধরেছ? আর?

—নচিকেতা-মনোময়-রূপঙ্কর...

—ব্যস, ব্যস, ব্যস অনেক বলে ফেলেছ। এর বেশি তো শুনিইনি।

—আর কী শুনলেন তাহলে?

—কই আর শুনলাম! রেডিয়োর 'ক' স্টেশন তো ধরতেই পারলাম না মহালয়ার ভোরে। বীরেনদা'র স্তোত্র পাঠ মিস হল।

—আর?

—ব্যান্ডের কয়েকটা বাদ দিলে বাকিদের ঠাওরাতেই পারছি না। পণ্ডশ্রম হবে এ বয়সে। সন্ধেবেলায় তুমি বরং...বলব?

—বলুন না!

—তুমি অখিলের কিছু গান শোনাও তো আমাকে। ভাল্লাগবে শুনলে 'কিছু মনে কোরো না, কেউ যদি কিছু বলে'।

—বেশ! আর?

—গীতার 'নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে'।

—বাব্বা, আপনি তো বেশ প্রেমিক আছেন এই বয়সেও! আর নিজের কোনো গান শুনবেন না?

হেমন্ত ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, নিজের গান তো নিজেই গেয়ে শুনে নিতে পারি। বলেই একটু গুনগুনোলেন কী সব। তার পর আস্তে করে সামনে পা ফেলে বললেন, তবে নিজের দুটো গান শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু গাইতে লজ্জা পাই।

ছোকরা জিজ্ঞেস করল, কী গান, হেমন্তদা?

—তার একটা দিয়ে তো আমার স্মৃতিকথার বইয়ের নামকরণই করেছ —'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'।

—তা লজ্জার কারণ?

—কীরকম দাম্ভিক শোনায়।

—আর অন্য গানটা?

—'এক দিনে তো হইনি আমি তোমাদের এই হেমন্ত'।

—এটার জন্য লজ্জা কেন?

—কারণ কথাটা যে খুবই সত্যি!

———————

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য নির্বাচিত
১৫০টি ছায়াছবি ও আধুনিক
বাংলা গানের সংকলন

আমার প্রিয় গান

প্রিয় দেড়শো আধুনিক বাছতে গিয়ে দেড় বছর বয়স বেড়ে গেল। এত সুর আর এত গান ভিড় করে এল ক'দিন যাবৎ যে কাকে রেখে কাকে ছাড়ি ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। বার বার মনে এল সুবীর সেনের গানের ওই কথাটা— সারাদিন তোমাকে ভেবে হল না আমার কোনো কাজ।

তবু একেবারে কাজ হল না বলছি না, দেড়শো গানের তালিকা একটা তো তৈরি হল। শুধু গান বাজিয়ে বাজিয়ে আর স্মৃতিতে ধরা সুর ও কথা দিয়ে এ কাজ সম্ভব ছিল না। আমাকে যারপরনাই সাহায্য করেছে সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় ও সরোজ ঘোষের সম্পাদনা ও সংকলনে গড়া 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আধুনিক বাংলা গান' বইটি। ওই সংকলকদের এই সুযোগে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আমার এই বই পড়ে অনেক গানমনস্কই ওই সংকলনের অভিমুখী হবেন।

যে-গান রাখতে পেরেছি তাতে সুখ হচ্ছে, যে-গান রাখতে পারিনি তার বেদনা আরও বড়ো। আমি এরকম দুটি গানের উল্লেখ এখানে করব : এক, কবীর সুমনের 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' এবং 'মলয় মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু নেই তবু দিতে চাই'। পাশাপাশি উল্লেখ করব অজয় চক্রবর্তীর 'আমি সুরে সুরে ওগো তোমায় ছুঁয়ে যাই' এবং যে আকাশে ঝরে বাদল' গান দুটিরও। এই চারটি গান এবং আরও কিছু আধুনিক নির্মাণ নিয়ে পরে বড়ো করে লেখার ইচ্ছে আছে।

আপাতত এই বই পড়ে যদি কারও বাংলা আধুনিকের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হয় আমি ভীষণ সুখী হব। এ বই তো আমার অনেকখানি জীবন দিয়ে পাওয়া।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

১। আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে।
আমার নয়ন দুটি শুধুই তোমারে চাহে,
ব্যথার বাদলে যায় ছেয়ে॥
বয়ে চলে আঁধিয়ার রাত্রি, আমি চলি দিশাহীন যাত্রী
দূর অজানার পারে আকূল আশার খেয়া বেয়ে॥
কত কাল আর কত কাল এই পথ চলা ওগো চলবে
কত রাত এই হিয়া আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।
কোনো রাতে মনে কি গো পড়বে
ব্যথা হয়ে আঁখিজল ঝরবে
বাতাস আকুল হবে তোমার নিশাসটুকু পেয়ে॥

শিল্পী: লতা মঙ্গেশকর। কথা: পবিত্র মিত্র। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৬)

২। আকাশ এত মেঘলা যেও না কো একলা
এখনি নামবে অন্ধকার,
ঝড়ের জলতরঙ্গে নাচবে নটী রঙ্গে
ভয় আছে পথ হারাবার॥
গল্প করার এই তো দিন
মেঘ কালো হোক মন রঙীন,
সময় দিয়ে হৃদয়টাকে বাঁধব নাকো আর॥
আঁধার ছায়াতে চেয়েছি হারাতে
দু-বাহু বাড়াতে তোমারি কাছে—
যাক না এমন এই তো বেশ
হয় যদি হোক গল্প শেষ
পূর্ণ হৃদয় ভুলবে সেদিন সময় শূন্যতার॥

শিল্পী: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথা: সুনীলবরণ। সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৬৩)

৩। আকাশে আজ রঙের খেলা মনে মেঘের মেলা
হারালো সুর হারালো গান ফুরালো যে বেলা
আমার মনে মেঘের মেলা॥
অনেক ব্যথার অনেক ঝড়ে মনের আকাশ শুধুই ভরে
আসে না দিন বাজে না বীণ নীরব অশ্রু ফেলা॥

হৃদয়ে আজ বাউল বাতাস উদাস হয়ে ফেরে
মেঘের আঁচল কেমন করে স্বপ্নকে তার ঘেরে।
চলার পথে চরণ থামে অঝোর ধারায় বাদল নামে
কোথা সে দিন ছিল রঙিন মিলন স্বর্গ খেলা।

শিল্পী: আশা ভোঁসলে। কথা ও সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৫৯)

৪। আজ মনে হয় এই নিরালায় সারাদিন ছন্দের গান শুনি
আমি এক স্বপ্নের জাল বুনি নিজেরে হারাই সুরের মায়ায়॥
বাতাসের এই আবেশে চলে যাই অজানা দেশে
পাখিরা যেখানে শুধু মরমের কাকলি শোনায়॥

কে যেন বলে গো আমায় আজ পৃথিবীতে নাই ব্যথা নাই,
সে শুধু তুমি ওগো এতো কাছে আছ তাই।
জীবনের এই দোলাতে যেন তাই হৃদয় মাতে
ফুলেরা কেন কে জানে এতো সে সুরভি ঝরায়॥

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথা: পবিত্র মিত্র। (১৯৬৪)

৫। আর কত রহিব শুধু পথ চেয়ে
আমার আকাশ হয় না তো নীল
মেঘে মেঘে রয় ছেয়ে।
বকুলের মুকুলেতে নেই কোনো গুনগুন
মাধবীর স্বপ্নে আসে না তো ফাল্গুন
কিসের আশায় তবু জেগে রই
বেদনারই গান গেয়ে।
হাসি ভুলে আর কত কাঁদি
বালুচরে মিছে ঘর বাঁধি
অবহেলা পেয়ে আমি আঁখি জলে সিক্ত
অসহায় এই আমি কত যেন রিক্ত
ঝড়ের আঘাতে হাল ভেঙে যায়
খেয়া তবু যাই বেয়ে।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৬)

৬। আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
আমি জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে
তুই কোলে তুলে নিতে আয় মা॥
পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না,
এই পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা॥

শিল্পী: লালচাঁদ বড়াল। কথা: অতুলকৃষ্ণ মিত্র। এই গানটি ১৮৮১ সালে মঞ্চস্থ 'মাধবী কঙ্কণ' নাটকে প্রথম গীত হয়। আধুনিক কালে গানটি বিখ্যাত হয়েছে পান্নালাল ভট্টাচার্যের গায়নে।

৭। আমার জীবন নদীর ওপারে
এসে দাঁড়ায়ো দাঁড়ায়ো বঁধু হে!
আমি তরীটি বাহিয়া আসব
তুমি চরণখানি বাড়ায়ো হে॥
দিনের আলোটি নিভে যাবে
আঁধার আসিবে ঘিরে!
তুমি নয়নের কোণে সোহাগের দীপ
জ্বালিয়ে রেখো হে ধীরে।
(আমি) আপনা হারায়ে নিজেহারা
তুমি এতটুকু হারায়ো বঁধু হে॥

শিল্পী: আঙুরবালা দেবী। কথা: বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি' চলচ্চিত্রে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গানটি গেয়েছিলেন।

৮। আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাই বা জ্বলে,
কণ্ঠ-মালার বকুল যদি যায় গো দলে।
ওগো প্রিয়! জাগব বাসর শূন্য শয্যা পাতি,
আমার বিফল রাতি।
বন্ধ হবে সেদিন গানের খেয়া চুকবে সেদিন সকল দেয়া নেয়া
পথের পাশে ঝরবে শেফালিকা দীর্ঘশ্বাসে মাতি।
ওগো প্রিয়! জাগব বাসর শূন্য শয্যা পাতি আমার বিফল রাতি।
তোমার পায়ের চিহ্ন স্মরি হৃদয় তলে রাখব ধরি
মরণ যেদিন আসবে ঘিরে নিভবে যখন বাতি।

ওগো প্রিয়! জাগব বাসর শূন্য শয্যা পাতি
আমার বিফল রাতি।

শিল্পী: রবীন মজুমদার। কথা: হীরেন বসু। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়। (১৯৪২)

৯। আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে।
পান্থ পাখির কূজন কাকলি ঘিরে,
আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো
আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে।
অশথের ছায়ে মাঠের প্রান্তে দূরে,
রাখালি বাঁশির বেজে বেজে ওঠা সুরে
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।
ঝরা পাতাদের মর্মর ধ্বনি মাঝে,
কান পেতে শুনো অশ্রুত সুরে মোর এই গান বাজে।
পরাগ ঝরানো স্বপ্ন ভরানো বনে, ভ্রমর যেথায় সুর তোলে মনে মনে
আমার এ গান খুঁজো তুমি তারই মীড়ে।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: নচিকেতা ঘোষ। (১৯৫৮)

১০। আমার মালতী লতা ওগো কি আবেশে দোলে,
আমি সে কথা জানি না আমায় কে গো দেবে বলে?
জানি না একি হাওয়া ছুঁয়েছে কারে, সেজেছে কেন ফুলে পাতা বাহারে,
কেন দোলে, ঢেউ তোলে, কেন দোলে হিল্লোলে?
বুঝি না একি মায়া লেগেছে মনে
হয়েছে এতো খুশি কেন বিনা কারণে
কেন দোলে, ঢেউ তোলে, কেন দোলে হিল্লোলে?

শিল্পী: লতা মঙ্গেশকর। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: রাহুলদেব বর্মন। (১৯৬৫)

১১। আমায় একটু জায়গা দাও
মায়ের মন্দিরে বসি
আমি অনাহুত একজন
অনেক দোষেতে দোষী।
আমি সবার পিছনে থাকব
শুধু মনে মনে মাকে ডাকব
কারও কাজে বাধা হলে
সাজা দিও যত খুশি।

ভেবো না হঠাৎ সামনে এগিয়ে
মায়ের চরণ ছুঁয়ে দেব
শুধু আরতি যখন করবে
মার পূজাদীপ তুলে ধরবে
আমাকে দেখতে দিও
মায়ের একটু হাসি॥

শিল্পী: মান্না দে। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৯৮)

১২। আলোতে-ছায়াতে দিনগুলি ভরে রয়,
তারি মাঝে ভাবি কাছে এলে বুঝি
তুমি কি আমার নয়।
তোমার নয়নে তাই স্বপন কুড়াতে চাই,
আমারই মালার ফুলের বাসে রাখি তারি পরিচয়,
তবু আমি কি তোমার নয়
(বলো) তুমি কি আমার নয়।
মালতীর মিতা মধুপ সে কথা জানে
কাকলি কূজন কি সুরের দোল
রেখে রেখে যায় ওগো তোমার আমার মনে
এত কাছে কাছে রই,
(তবু) আমি কি তোমার নই—
পিয়াসী এ হিয়া কাঁদিয়া শুধায়
বলো ওগো মনোময়।।

শিল্পী: তালাত মাহমুদ। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়। (১৯৫২)

১৩। আমি চলে গেলে পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম,
বিদায়ের আগে শুধু ওগো এই মিনতি করে গেলাম।।
সারাটি জীবন চেয়েছি কেবল
কারও নয়নের এক ফোঁটা জল,
একটি দীর্ঘনিশাস আমার সকল গানের দাম॥
আমি যে দেখেছি মধু বসন্তে মরা ফুল আছে পড়ে,
সবুজ বনের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘর ভেঙে গেছে ঝড়ে।
আমি যে শুনেছি সুখের বাসরে
দুখের রাগিণী হাহাকার করে,
যে ব্যথা মহান তারি পায়ে আমি জানিয়ে গেছি প্রণাম॥

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথা: শ্যামল গুপ্ত। (১৯৫২)

১৪। আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি
তবু মনে হয়, এ যেন গো কিছু নয়
কেন, আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়॥
তোমার কাজল চোখে যে গভীর ছায়া কেঁপে ওঠে ওই
তোমার অধরে ওগো যে হাসির মধুমায়া ফোটে ওই।
তারা এই অভিমান বোঝে না আমার
বলে, তুমি তো আমায় ভালোবেসেছ,
শুধু আমার গোপন ব্যথা কেঁদে কেঁদে কয়
কেন, আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়॥
তুমি তো জানো না ওগো,
তোমার প্রাণের ওই সুরের কাছে আমার গানের বাণী
আহত পাখির মতো লুটায়ে আছে।।
তবু এ মাধবী রাতে আমায় যে মালা তুমি পরালে
যে মাধুরী দিয়ে মোর শূন্য জীবন তুমি ভরালে।
তারা এ দীনতাটুকু দেখে না আমার
বলে তুমি তো আমায় ভালোবেসেছ॥
শুধু আমার গোপন ব্যথা কেঁদে কেঁদে কয়
কেন, আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়॥

শিল্পী ও সুরঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কথাঃ শ্যামল গুপ্ত। (১৯৫৭)

১৫। আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা
আমি কাঁদলাম, বহু হাসলাম
এই জীবন জোয়ারে ভাসলাম
আমি বন্যার কাছে ঘূর্ণির কাছে
রাখলাম নিশানা
কখন জানি না সে, সে যে আমার জীবনে এসে
যেন সঘন শ্রাবণ প্লাবনে দু-কূলে ভেসে
শুধু হেসে ভালোবেসে॥
যত যতনে সাজানো স্বপ্ন হল সকলি নিমেষে ভগ্ন
আমি দুর্বার স্রোতে ভাসালাম তরী অজানায় নিশানা॥
ওগো ঝরাপাতা যদি আবার কখনও ডাকো
সেই শ্যামল হারানো স্বপন মনেতে রাখো
যদি ডাকো, যদি ডাকো—

আমি আবার কাঁদব হাসব এই জীবন জোয়ারে ভাসব
আমি বজ্রের কাছে মৃত্যুর মাঝে
রেখে যাব নিশানা॥

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৬১)

১৬। আমি যামিনী, তুমি শশী হে, ভাতিছ গগন মাঝে
মম সরসীতে তব উজ্জ্বল প্রভা
বিম্বিত যেন লাজে।
তোমায় হেরি গো স্বপনে শয়নে তাম্বুল রাঙা বয়ানে
মরি অপরূপ রূপ মাধুরী বসন্তসম বিরাজে॥
তুমি যে শিশির বিন্দু মম কুমুদির বক্ষে
না হেরিলে ওগো তোমারে তমসা ঘনায়ে চক্ষে
তুমি অগণিত তারা গগণে প্রাণ বায়ু মমজীবনে
তব নামে মম প্রেম মুরলী পরানের গোঠে বাজে।

শিল্পী: মান্না দে। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: অনিল বাগচী।
ছবি: এন্টনী ফিরিঙ্গী। (১৯৬৬)

১৭। আমি যে জলসাঘরের বেলোয়ারি ঝাড়
নিশি ফুরালে কেহ চায় না আমায়
জানি গো আর।

আমি যে আতর ওগো আতরদানে ভরা
আমারই কাজ হল যে গন্ধে খুশি করা।
কে তারে রাখে মনে ফুরালে হায়
গন্ধ যে তার।

হায় গো কি যে আগুন জ্বলে বুকের মাঝে
বুঝেও তবু বলতে পারি না যে
আলেয়ার পিছে আমি মিছেই ছুটে
যাই বারে বার।

কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: অনিল বাগচী। শিল্পী: মান্না দে।
ছবি: এন্টনী ফিরিঙ্গী (১৯৬৬)

১৮। উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।
হে কাল, হে গম্ভীর অশান্ত সৃষ্টির প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম, উদাসীন বারোমাস...
চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে তুমি নেই, আমি নেই,
কেউ নেই, কেউ নেই,
ওড়ে শুধু একঝাঁক পায়রা।
দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি শান্তি, নীল কপোতাক্ষীর কান্তি—
একফালি নাগরিক আকাশে, কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে
হে কপোত, পারাবত, পায়রা, যেদিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যদ্দূর
শুধু শ্বেত, পিঙ্গল, কৃষ্ণ,
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা।

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: বিমলচন্দ্র ঘোষ। সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫৩)
বিমলচন্দ্র ঘোষের মূল কবিতাটি থেকে ওপরের অংশটুকুতে সুরারোপ করেছিলেন সলিল চৌধুরী।

১৯। এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার
ও কি সূর্য নাকি স্বপনের চিতা
ও কি পাখির কূজন—নাকি হাহাকার।
রাত্রি সে তো স্বভাবে মলিন তাকে সয়ে থাকা যায়;
ভোরের পথের দিকে চেয়ে থাকা যায়;
সে ভোর অন্ধ হল নিজেই এখন
তার যে কথা ছিল আলো দেবার।

আজ থেকে বুঝি আমার রাত্রি ফুরিয়ে যাওয়া ফুরাল,
আজ থেকে বুঝি আমার দিনেরা আকাশ-পথ হারাল।
সূর্যটাকে কী জানি কি ভেবে চেয়ে দু-হাতে নিয়ে
জ্বেলে আবার সে গেছে নিভিয়ে
যাবার সময় গেছে তাকে মাড়িয়ে
জ্বলতে না পারে যেন কখনও আবার॥

শিল্পী, কথা ও সুর: জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। (১৯৭৪)

২০। এ শুধু গানের দিন
এ লগন গান শোনাবার।
এ তিথি শুধু গো যেন দখিন হাওয়ার॥
এ লগনে দুটি পাখি মুখোমুখি নীড়ে জেগে রয়
কানে কানে রূপকথা কয়।
এ তিথি শুধু গো যেন হৃদয় চাওয়ার।
এ লগনে তুমি আমি একই সুরে
মিশে যেতে চাই।
প্রাণে প্রাণে সুর খুঁজে পাই।
এ তিথি শুধু গো যেন তোমায় পাওয়ার॥

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।
ছবি: পথে হল দেরী (১৯৫৭)

২১। এক বৈশাখে দেখা হল দুজনায়
জষ্ঠিতে হল পরিচয়
আসছে আষাঢ় মাস
মন তাই ভাবছে, কী হয় কী হয়।
কি জানি কী হয়!
তখনি তো হল দেখা যেই না নয়ন কিছু চেয়েছে
জানাজানি হয়ে গেছে অধর যখনই কথা পেয়েছে
জানি না তো কী যে হবে
এরপরে কিছু পেলে এ-হৃদয়!
প্রথমে চমক ছিল
তারপরে ভালোলাগা এসেছে
ডুবে গেছে সেই মন যে মন খুশির স্রোতে ভেসেছে
জানি না তো কী যে হবে
সব কিছু হয়ে গেলে তন্ময়।।

শিল্পী: আরতি মুখোপাধ্যায়। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: নচিকেতা ঘোষ।
ছবি: বিলম্বিত লয়। (১৯৭০)

২২। একটা গান লিখো আমার জন্য
না হয় আমি তোমার কাছে ছিলেম অতি নগণ্য।
সে গান যেন আমায় উজাড় করে নেয়
সে সুর যেন আমায় ব্যাকুল করে দেয়

আমি যেন হই তোমার মাঝে ধন্য।
আমি ছিলেম তোমার প্রেমের প্রথম স্বপ্ন-নায়িকা।
লিখেছি তোমার মনের আখরে অনেক ছন্দ লিপিকা।
সে দিন আমার আজও মনে পড়ে যায়
কেমন করে যেন আমায় খুঁজে পায়
জীবন তরী যে বোঝাই সহজ পণ্য।

শিল্পী: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা: সুবীর হাজরা। সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৬১)

২৩। এত সুর আর এত গান যদি কোনোদিন থেমে যায়
সেই দিন তুমিও তো ওগো জানি ভুলে যাবে যে আমায়।
কত দিন আর এ জীবন কত আর এ মধু লগন
তবুও তো পেয়েছি তোমায়
জানি ভুলে যাবে যে আমায়।
আমি তো গেয়েছি সেই গান যে গানে দিয়েছি এই প্রাণ
ক্ষতি নেই আজ কিছু আর ভুলেছি যত কিছু তার
এ জীবনে সবই যে হারায় জানি ভুলে যাবে যে আমায়॥

শিল্পী: সুবীর সেন। কথা ও সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৫৭)

২৪। এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়— এ কি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু
কোন রক্তিম পলাশের স্বপ্ন মোর অন্তরে ছড়ালে গো বন্ধু।
আমলকী পিয়ালের কুঞ্জে কিছু মৌমাছি এখনও যে গুঞ্জে,
বুঝি সেই সুরে ভরালে গো বন্ধু।
বাতাসের কথা সে তো কথা নয়, রূপকথা ঝরে তার বাঁশিতে,
আমাদের মুখে কোনো কথা নেই, শুধু দুটি আঁখি ভরে থাকে হাসিতে।
কিছু পরে দূরে তারা জ্বলবে, হয়তো তখন তুমি বলবে,
জানি মালা কেন গলে পরালে গো বন্ধু।

শিল্পী: গীতা দত্ত। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: অমল মুখোপাধ্যায়। ছবি: হসপিটাল (১৯৬০)

২৫। এই রাত তোমার আমার ওই চাঁদ তোমার আমার
শুধু দুজনে।
এই রাত শুধু যে গানে, এই ক্ষণ এই দুটি প্রাণে,
কুহু কুজনে।
এই রাত তোমার আমার।

তুমি আছ আমি আছি তাই অনুভবে তোমারে যে পাই

শুধু দুজনে

এই রাত তোমার আমার

ওই চাঁদ তোমার আমার।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
ছবি: দীপ জ্বেলে যাই। (১৯৫৯)

২৬। এই কি গো শেষ দান বিরহ দিয়ে গেলে

মোর আরও কথা ছিল বাকি, আরও প্রেম, আরও গান

ক্ষণিকের মালাখানি তবে কেন দিয়েছিলে আনি

কেন হয়েছিল শুরু হবে যদি অবসান।

যে পথে গিয়াছ তুমি

আজ সেই পথে হায়

আমার ভুবন হতে বসন্ত চলে যায়!

হারানো দিনের লাগি, প্রেম তবু রহে জাগি

নয়নে দুলিয়া ওঠে হৃদয়ের অভিমান॥

শিল্পী: রবীন মজুমদার। কথা: প্রণব রায়। সুর: কমল দাশগুপ্ত। ছবি: গরমিল। (১৯৪২)

২৭। এই ঝির ঝির ঝির বাতাসে

কী গান ভেসে আসে

সেই সুরে সুরে মন নাচে উল্লাসে তুমি কত দূরে তবু এই সুরে

মনে হয় যেন তুমি আছ মোর পাশে।।

জীবনে তাই আজ এত আলো তোমারে যে বেসেছি গো ভালো

তুমি আছ বলে তারা দীপ জ্বলে

মেঘের আড়ালে চাঁদ তাই যেন হাসে।।

জানো নাকি ওগো মধুমিতা আমার মনের এই কথা।

মেঘে মেঘে আজ কত খেলা রঙে রঙে আজ তাই মেলা

দূর হতে দূরে হৃদয় যায় উড়ে

সোনালি স্বপনে ভরা নীল নীলাকাশে।।

শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা ও সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৫৭)

২৮।	এমন একটি ঝিনুক খুঁজে পেলাম না
যাতে মুক্তো আছে
এমন কোনো মানুষ খুঁজে পেলাম না
যার মন আছে।
শুনে গেলাম অনেক কথা
অনেক গল্প অনেক গাথা
এমন একটা কথা খুঁজে পেলাম না
যাতে সত্যি আছে!
পথেই শুধু পথ হারালাম
নিরুদ্দেশে গেলাম না
ভালোবাসা অনেক পেলাম
ভালোবাসা পেলাম না;
স্বপ্ন অনেক গেলাম দেখে
রোদ বৃষ্টি নামল চোখে
এমন একটি আশাও খুঁজে পেলাম না
যার অন্ত আছে!!

শিল্পী: নির্মলা মিশ্র। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: নচিকেতা ঘোষ। (১৯৭২)

২৯।	এমনও দিন আসতে পারে
যখন তুমি দেখবে আমি নাই
আমায় তুমি ভুল বুঝো না যেন
তোমার আগে আমিই যদি যাই।
ফেরে না কেউ যেথায় গেলে হায়
সাধ করে আর কেইবা বলো সেথায় যেতে চায়
তবু যদি তোমায় ছেড়ে হয় গো যেতেই কভু
দূরে থেকেও তোমায় যেন
এমনি করেই পাই।
তবুও তো নতুন করে ফুটবে বকুল আবার
সেইতো হবে লগন ওগো আমায় ফিরে পাবার।
ফুটলে বকুল আবার।
তোমার কাছে আমার যত ঋণ,
পারব না তো জানিয়ে যেতে তোমায় কোনোদিন
ফিরব ভেবে আশায় থেকে হও গো নিরাশ যদি
এই কথাটি তোমায় আমি জানিয়ে দিলাম তাই॥

শিল্পী ও সুর: শ্যামল মিত্র। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৫৪)

৩০।   এমনি বরষা ছিল সেদিন, শিয়রে প্রদীপ ছিল মলিন
তব হাতে ছিল অলস বীন, মনে কি পড়ে প্রিয়
আমি শুধানু তোমায় বলো দেখি
কোনোদিন মোরে ভুলিবে কি?
আঁখিপাতে বারি ঝুরিবে কি
আমার তরে প্রিয়।
মোর হাতখানি ধরে কহিলে হায়—মন দিয়ে মন ভোলা কি যায়,
কাঁদিবে আকাশ মোর ব্যথায় বাদল ঝড়ে প্রিয়।
হায় তুমি নাই বলে মোর সাথে
তাই কি বিরহ বরষাতে।
এত বারিধারা আজি রাতে   অঝোরে ঝরে প্রিয়॥

শিল্পী: যূথিকা রায়। কথা: প্রণব রায়। সুর: কমল দাশগুপ্ত। (১৯৫০)

৩১।   এইতো সেদিন তুমি আমারে বোঝালে
আমার অবুঝ বেদনা
দু'টি হাত ধরে আমি তোমায় বলেছি
এ শুধু আমার, তুমি কেঁদো না॥

তোমার প্রেমের কাছে চিরঋণী করে
আরও কী চেয়েছ দিতে এ-হৃদয় ভ'রে
কণাটুকু তার আমি শুধিতে পারিনি
ব্যথা দিয়ে তাই আর বেঁধো না॥

অনেক হারাতে হল জীবনে তোমার
সেই অপরাধে আমি অপরাধী
এবার একলা আমি কাঁদি;
বিদায় নেবার আগে শুধু বলে যাই
তোমার ক্ষমার মাঝে পাই যেন ঠাঁই
স্বরলিপি ভুল করা শেষের এ-গান
স্মৃতির বীণায় আর সেধো না॥

শিল্পী ও সুর: মান্না দে। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩২।　　এই মেঘলা দিনে একলা
ঘরে থাকে না তো মন
কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।
যূথীবনে ওই হাওয়া　　করে শুধু আসা-যাওয়া
হায় হায়রে দিন যায় রে
ভরে আঁধারে ভুবন।
কাছে যাব কবে পাব ওগো তোমার নিমন্ত্রণ।
শুধু ঝরে ঝরোঝরো আজ বারি সারাদিন
আজ যেন মেঘে মেঘে হল মন যে উদাসীন
আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে
কি যে ভাবি আনমনে
তুমি আসবে, ওগো হাসবে কবে হবে সে মিলন।।

শিল্পী ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবিঃ শেষ পর্যন্ত। (১৯৬০)

৩৩।　　এই প্রাণ ঝরনা জাগল, পাষাণ কারা ভাঙল,
কালোরাতের কাজল বুকে আলোর ছটা লাগল।

এই আলোতে ইন্দ্রধনুর সাতটি রঙের আলপনা,
লক্ষ আশা মেলছে পাখা কল্প সূতায় জালবোনা—
চমকে দেখি হঠাৎ একি, বাঁধন আমার কাটল
অতল জলে টান লেগেছে সাগর বুঝি ডাকল—

শিবের জটা শিথিল হল, ভগীরথের আহ্বানে,
শৈল চূড়ার আবাস ছেড়ে গঙ্গা ছোটে কার পানে—
চলতে শিলা-শিকল ক্ষ'য়ে বাজল পায়ে নূপুর হয়ে
শুকনো মরু জল সোহাগে সবুজ হাসি হাসল—

আলোর নেশা জাগিয়ে দিল আমার মনের ছন্দ যে,
মনের মধু মৌমাছি পায় পারিজাতের গন্ধ যে
তাইতো খুশির গান জেগেছে প্রাণের বীণা বাজল—
নতুন দিনের নতুন আলোয় হৃদয়খানি রাঙলো॥

শিল্পীঃ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কথাঃ শৈলেন রায়। সুরঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়।
ছবিঃ লালু-ভুলু। (১৯৫৯)

৩৪। একই বাংলার দুটি নয়নের অশ্রুর দুটি ধারা
কত স্মৃতি নিয়ে, কত প্রীতি নিয়ে,
আজও বয়ে চলে তারা।
এই গঙ্গা, সেই পদ্মা, হাসিকান্নায় দুটি বন্ধুর
আমি ডুবলাম শুধু ডুবলাম যাকে চাইলাম সে কদ্দূর!
যদি বৃষ্টির মেঘ হয়ে ঝরতাম
ঝাঁপ দিয়ে বুকে তার পড়তাম,
দু-হাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে হতাম
সোনালি যদি রোদ্দুর॥

আজ, আমি কত ক্লান্ত যদি গো সে জানত,
আমার পিয়াসী মন প্রেমের সুধায় হত শান্ত;
যদি, স্বপ্নের সেতু দিয়ে বাঁধতাম
গান হয়ে প্রাণে তার কাঁদতাম
ভেঙে দিয়ে লজ্জা পেতে ফুলশয্যা
পরাতাম সোহাগের সিন্দুর।

কথা : শ্যামল গুপ্ত। সুর ও শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১৯৭০)

৩৫। এল বরষা যে সহসা মনে তাই
রিমঝিম রিম রিমঝিম রিম গান গেয়ে যাই।
গানের ধারা মাঝে প্রাণের কথা আছে
সুর তবু লাগে না যে কোথা বলো তারে পাই॥
মনের আকাশে কত খুঁজেছি গো তোমায়
মেঘের স্তরে স্তরে রাতের তারায় তারায়
যদি ভরা এ শ্রাবণে কারও ছোঁওয়া সুর আনে
হৃদয়ের মাঝখানে রেখে দিতে তারে চাই॥

কথা ও সুর : সুধীন দাশগুপ্ত। শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩৬। ওই উজ্জ্বল দিন ডাকে স্বপ্ন রঙিন,
ছুটে আয়রে লগন বয়ে যায়রে মিলন বীন
ওই তো তুলেছে তান, শোনো ওই আহ্বান।
তারই সুরে বাজে গুরু গুরু,
হোক গানে গানে পথ চলা শুরু,
আজ অন্তরে অন্তরে, প্রান্তরে প্রান্তরে,
কণ্ঠে ছড়াব এই গান।

আয় আয়রে ছুটে আয় বাঁধন টুটে
আনি মুক্তো আলোর বন্যা
আয় ক্লান্তি ভাঙাই আয় শান্তি জাগাই
এই শ্যামল ধরণি হবে ধন্যা।
ওই আকাশে বাতাসে দোলা লাগল
আজ জীবনে জোয়ার বুঝি জাগল
নব উচ্ছ্বল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম উল্লাসে
ছন্দে জাগাবো এই গান।

শিল্পীঃ সুবীর সেন। কথা ও সুরঃ সুধীন দাশগুপ্ত। (১৯৫৫)

৩৭। ওই সুর ভরা দূর নীলিমায়—
ওই তারা ঘেরা স্বপ্ন সীমায়—
যেথা চন্দ্রকলা বাঁকা নায়, মোর মন আজ উধাও হতে চায়।
ওই ঝুর ঝুর দখিনার গুঞ্জন, আজ এই রাত তাই এত উন্মন
জোছনা জোয়ার তুলে' বনানীর ফুলে ফুলে
ঝিকি মিকি মুক্তো ছড়ায়॥
তোমায় পেয়েছি তাই এ ভুবন, সুরে সুরে ভরে ওঠে অনুখন
তোমার আঁখির কোলে, আমার ফাগুন দোলে
তুমি আছো রিক্ত হিয়ায়।

শিল্পীঃ গীতা দত্ত। কথাঃ অনল চট্টোপাধ্যায়। সুরঃ কানু ঘোষ। (১৯৫৯)

৩৮। ও আকাশ প্রদীপ জ্বেলো না
ও বাতাস আঁখি মেলো না
আমার প্রিয়া লজ্জা পেতে পারে।
আহা কাছে এসেও ফিরে যেতে পারে!
তার সময় হল আমায় মালা দেবার
সে যে প্রাণের সুরে গান শোনাবে এবার
সেই সুরেতে ঝরনা তুমি চরণ ফেলো না।
ও পলাশ ফিরে চেয়ো না
ও কোকিল তুমি গেয়ো না
লাজুক লতা হয়তো গো লাজ পাবে
তার মুখের কথা বুকেই রয়ে যাবে,
তার অনেক ভীরু স্বপ্ন জাগে আশায়

আহা হৃদয় মাঝে সুরের খেয়া ভাসায়
দোহাই বকুল ছন্দে তাহার গন্ধ ঢেলো না॥

শিল্পী ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৫৮)

৩৯। ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা
একটি শিসে জাগিয়ে গেল লাগছে তাও মন্দ না।
ছোট্ট চাঁপার কলি শোনো
শোন তোমায় বলি শোনো
আমার এ মন জাগিয়ে গেল, সে শুধু তার গন্ধ-না॥
ছোট্ট দিঘির কোলে কোলে ছোট্ট শালুক দোদুল দোলে
তারও চলে রাত্রি জেগে দূরে চাঁদের বন্দনা!
ছোট্ট দুটি কথা ভরা মুখরতা
আমার এ মন মাতিয়ে গেল সে শুধু তার ছন্দ না॥

শিল্পীঃ আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথাঃ পবিত্র মিত্র। সুরঃ নচিকেতা ঘোষ। (১৯৫৮)

৪০। ও আমার মন যমুনার অঙ্গে অঙ্গে
ভাবতরঙ্গে কতই খেলা
বঁধু কি তীরে বসেই মধুর হেসে
দেখবে শুধুই সারা বেলা॥
ও রূপের মিথ্যে গরব অমন যদি বিরূপ থাকে,
ও গুণের কী দাম বলো লাজেই যদি আগুন ঢাকে,
কবে আর আসবে সময় বাসবে ভালো
ভাসবে ময়ূরপঙ্খী ভেলা॥
কী অত বিচার করা অবিচারের ভয় করে যে
কী অত হিসাব করা বেহিসাবের ভুল ধরে যে।
এখনও ডুব না দিলে
করবে সিনান হায় গো কবে,
গাগরী ভরার বেলা অবহেলায় সাঙ্গ হবে,
মনের ওই সোনা যে হয় আন্‌মনা গো
দিন গোনাতে মাটির ঢেলা॥

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে। কথাঃ শ্যামল গুপ্ত। (১৯৫৯)

৪১। ও বাঁশি হায়, বাঁশি কেন গায়
আমারে কাঁদায় কি গেছে হারায়ে
স্মরণের বেদনায় কেন মনে এনে দেয়।
ও বাঁশি কখনও আনন্দ ছিল জীবনের ছন্দে,
হৃদয় মাতাল হত ফাগুনের গন্ধে।
সে গেল কোথায় আমি বা কোথায়
যদি না জানায়।
ও বাঁশি তমাল কদম্ব আমার গোপিনী সঙ্গিনি
যমুনার জল গেছে আর তো দেখিনি
সবই যদি যায় ধূলিতে মিলায়!
তবু কেন হায়
বাঁশি কেন গায় আমারে কাঁদায়॥

শিল্পী: লতা মঙ্গেশকর। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৬০)

৪২। ও দয়াল বিচার করো দাও না তারে ফাঁসি,
আমায় গুণ করেছে আমায় খুন করেছে ...ও বাঁশি!
সে-আমার মনের মানুষ বলে, মরেছি অনেক জ্বালায় জ্বলে
এবার দাওগো সমন সাক্ষী দেবো ...হব সর্বনাশী!
বেজো না যখন তখন বলেছিলেম যারে
সে কথা সত্যি ভেবে মরণ জ্বালা আনতে সে কি পারে?
আমি যে মুখেই মানা করি, মরমে তারই পরে পড়ি
ও দয়াল... দিব্যি করে বলছি তোমায়
তারেই ভালোবাসি!!

শিল্পী ও সুর: অখিল বন্ধু ঘোষ। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৬০)

৪৩। ওরে মাঝি তরী হেথায় বাঁধব না কো আজকে সাঁঝে
ভিড়িও না চলুক তরী নদীর মাঝে।
ওই গাছে ওই বকুলগাছে জলটি যেথা ছুঁয়েই আছে
এখনও যে ওই ঘাটেতে পল্লিবালার কাঁকন বাজে
মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী কতই ব্যথা আনছে ডেকে
গ্রামের ছোটো দীপটি প্রাণে বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে
একটি গৃহ হেথায় কিনা ছিল আমার বড়োই চেনা
ছবিটি যার আজও আমার হৃদয় কোণে সদাই রাজে॥
এই নদীর এই ঘাটেতে এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া

যেত ছোটো কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া
সোহাগে জল উছলে উঠি পড়ত তাহার বক্ষে লুটি
পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোমটা দিত হর্ষ লাজে॥
এই ঘাটে ওই গাছের পাশে তটিনীর ওই শ্যামল কূলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে
এখন সেই চিতার 'পরে শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার দেয় যে বাধা সকল কাজে।

শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। কথা: কুমুদরঞ্জন মল্লিক। (১৯১৬)

৪৪। কত দূরে আর নিয়ে যাবে বলো কোথায় পথের প্রান্ত।
ঠিকানা হারানো চরণের গতি হয়নি কি তবু ক্লান্ত।
পিছনের পথে উঠেছে ধূলির ঝড় সমুখে অন্ধকার,
বলো তবে ওগো কবে হবে অভিসার।
তৃষিত আশারে কোরো না গো তুমি ভ্রান্ত।
তবুও তো যেতে হবে
কাঁটা বিঁধে পায়ে যদি গো রক্ত ঝরে
অশ্রুতে মোর তবু হাসি ছুঁয়ে রবে।
প্রদীপের পায়ে প্রজাপতি তার প্রেম করে গো সমর্পণ
সে তো মরণের কাছে জীবনের নিবেদন
ঝড় চলে গেলে পৃথিবী যে হয় শান্ত।

শিল্পী ও সুর: মান্না দে। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৫৩)

৪৫। ও আমার চন্দ্রমল্লিকা
বুঝি চন্দ্র দেখেছে
যেন কোনো শুক্লাপঞ্চমী
চোখে স্বপ্ন এঁকেছে।
তার সবুজ পাতা দোলে
তার অবুঝ হিয়া ভোলে
ও তার অঙ্গভঙ্গিমায়
বাতাস ছন্দ রেখেছে।
আমার ভাঙল দ্বিধা ভয়
কুঁড়ি রাঙাল পরাগে
আঁধার মানল পরাজয়
নতুন আলোর সোহাগে

সেই প্রহর ফিরে এল
সেই ভ্রমর দোসর পেলো
ও সে পাপড়ি ভরে আজ
রেণুর স্বর্ণ মেখেছে।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : নচিকেতা ঘোষ। শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৪৬। ওরে কোয়েলিয়া গান থামা এবার
তোর ওই কুহুতান ভালো লাগে না আর।।
আন-বধূ যার মন টানে—ফিরে যে না চায় ঘর পানে
তোর ওই কুহু কুহু তানে তারে মনে পড়ে বারবার।।
প্রিয় বুঝি তোর, ওরে পাখি মোর মত তোরে দিল ফাঁকি
তাই কি রে তুই ডাকি' ডাকি' প্রাণ কাঁদাস দুখিনী রাধার।।

কথা ও সুর : জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। শিল্পী : বাণী কোনার।

৪৭। কত কথা হল বলা কত কথা আছে বাকি
তোমারে তাই পিছু ডাকি।
জানি না কী ভেবে আমার কাছে এলে
বিদায় নিয়ে কেন সহসা চলে গেলে
আকাশে আধো চাঁদ
মেঘেতে গেল ঢাকি।
চরণ দুটি ধরে কেঁদেছে ঝরা ফুল
তবু তো চলে গেলে হল যে সবই ভুল।
আমার মালাখানি ধূলিতে আছে পড়ে
কে তারে মনে রাখে যে তারা গেল ঝরে!
এ হিয়া আমি তাই—
পাষাণে বেঁধে রাখি।।

শিল্পী: দীপক মৈত্র। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৭)

৪৮। কোন দূর বনের পাখি বারে বারে মোরে ডাক দেয়
বলে, ঘর ছেড়ে তুই আয় না ওরে ঘর যে তোর তরে নয়।।
ওই চাঁদ ডুবে যায় গো নীল সাগরের সীমানায়,
কেন আপনারে তুই বাঁধিস তোর পিঞ্জরের সীমানায়
ভেঙে আয় ছুটে মোর পাশে, ওরে আয়রে খোলা হাওয়ায়।।

ভ্রমরা গুনগুনায় গো সেথা কমলিনী-পাশে
সেথা পাখনা মেলে কত রাঙা প্রজাপতি আসে
কত স্বপ্নপরি নামে সেই ফাল্গুন-মধুমেলায়।।

শিল্পী: গায়ত্রী বসু। কথা ও সুর: দিলীপ সরকার । (১৯৫২)

৪৯। কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা
তোমায় শোনাই শোনো রূপকথা নয় সে নয়
জীবনের মধুমাসের কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা
শিশির ভেজা কাহিনি শোনাই শোনো।
একটুখানি শ্যামল ঘেরা কুটিরে তার স্বপ্ন শত শত
দেখা দিত ধানের শিষের ইশারাতে
দিবাশেষে কিষান যখন আসত ফিরে
ঘি ম' ম' আম-কাঁঠালের পিঁড়িতে বসত তখন
সবখানি মন উজাড় করে দিত তারে কিষাণী
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ঘুঘু ডাকা ছায়ায় ঢাকা গ্রামখানি কোন মায়া ভরে
শ্রান্ত জনে হাতছানিতে ডাকত কাছে, আদর করে সোহাগ ভরে
নীল শালুকে দোলন দিয়ে রং ফানুসে ভেসে
ঘুমপরি সে ঘুম পাড়াতো এসে কখন জাদু করে
ভ্রমরা যেত গুণগুনিয়ে ফোটা ফুলের পাশে
আকাশে বাতাসে সেথায় ছিল পাকা ধানের বাসে বাসে সবার নিমন্ত্রণ।
সেখানে বারো মাসে তেরো পাবন, আষাঢ় শ্রাবণ কি বৈশাখে
গাঁয়ের বধূর শাঁখের ডাকে
লক্ষ্মী এসে ভরে দিত, গোলা সবার ঘরে ঘরে,
হায়রে কখন এল শমন অনাহারের বেশেতে
সেই কাহিনি শোনাই শোনো।
ডাকিনী যোগিনী এল শত নাগিনি এল পিশাচেরা এল রে
শত পাকে বাঁধিয়া নাচে তাতা তাথিয়া নাচে তাতা তাথিয়া নাচে রে
কুটিলের মন্ত্রে শোষণের যন্ত্রে গেল প্রাণ শত প্রাণ গেল রে
মায়ার কুটিরে নিল রস লুটিরে মরুর রসনা এল রে।
হায় সেই মায়া ঘেরা সন্ধ্যা ডেকে যেত কত নিশিগন্ধা
হায় বধূ সুন্দরী কোথায় তোমার সেই মধুর জীবন মধুছন্দা
হায় সেই সোনা ভরা প্রান্তর সোনালি স্বপন ভরা অন্তর
হায় সেই কিষানের কিষানির জীবনের ব্যথার পাষাণ আমি বহি রে
আজও যদি তুমি কোনো গাঁয়ে দেখো ভাঙা কুটিরের সারি

জেনো সেইখানে সে গাঁয়েরই বধূর
আশা স্বপনের সমাধি।।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৪৯)

৫০। কাঠফাটা রোদে পিচ্ ঢালা পথে
ঝড় বাদলেতে শীতের রাতে
রিকশা চালাই মোরা রিকশাওয়ালা।
ঠুন-ঠুন-ঠুন-ঠুন-ঠুন-ঠুন ঘণ্টি বাজে,
সওয়ারি হাঁকে, 'এই জলদি চলাও'
ওরা বোঝে না যে—
পেটের টানে মোরা পিঠে মানুষ বই
তবু জোটে কই দুটি বেলা?
গদি আঁটা মোদের এই পিঠে
ফুটপাতে শুয়ে যে রাত কাটে
মোদের বাসা নাই যে।
সারা জনম মোরা ভাড়া খেটে খাই,
বাঁচাটাও যেন গাড়ি ঠেলা।
এমন ভাবে মোদের জীবন কাটে।
গোরু-ঘোড়ার মতো মানুষ খাটে,
কেউ ভাবে না যে,—
বসে খায় কেউ, কেউ খেটেও শুকায়
এ কি শুধু নিয়তির খেলা?

শিল্পী, কথা ও সুর: দিলীপ সরকার। (১৯৫২)

৫১। ক্লান্তি নামে গো রাত্রি নামে গো
বাইতে পারি না যে তরণি—আর কত দূর।
হায় কোথায় শ্যামল মাটির মায়া
হায় কোথায় সবুজ বনের ছায়া
কোথা সে নীর গভীর প্রেমের মোহনা
আহা কোথায় সে তীর।
এ শুধু নিঠুর ঢেউয়ের খেলা দিবানিশি ভাসাই আশার ভেলা
মনোবীণার তারে শুধুই বাজে হারানো সুর।।
তবু তুমি আশার দীপ জ্বেলে রেখো
বাতায়নে আমারই পথ চেয়ে থেকো

আবার আমি তোমারই দ্বারে
বিজয়ীর বেশে আসিব   মর্মর মুখরিত সন্ধ্যায়।
এই জীবনে যদি কিছু হারায়ে থাকি
এই ভুবনে জানি জানি যাবে না ফাঁকি
এ বিরহ-বিধূর রাতে মিলনের গান গাহিও
আবার আমি এই ধরণির ধূলির পরে আসিব মর্মর মুখরিত সন্ধ্যায়।।

শিল্পী: দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫৪)

৫২।   কে তুমি আমারে ডাকো অলখে লুকায়ে থাকো
ফিরে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই।
মনে তো পড়ে না, তবুও যে মনে পড়ে—
হাসিতে গেলেই কেন হৃদয় আঁধারে ভরে
সমুখের পথে যেতে পিছনে টানিয়া রাখো
নতুন অতিথি ওই দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে
তবু ফিরাতে হবে যে তারে, ফিরাতে হবেই তারে
ভুল করে মালা যদি দিতে চাই কারও গলে—
কেন কাঁপে হাত বলো বাধা পাই পলে পলে
আমারই আকাশ শুধু মেঘে মেঘে কেন ঢাকো।।

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: অনুপম ঘটক।
ছবি: অগ্নিপরীক্ষা। (১৯৫৫)

৫৩।   কাজল নদীর জলে ভরা ঢেউ ছল ছলে
প্রদীপ ভাসাও কারে স্মরিয়া
সোনার বরণী মেয়ে বলো কার পথ চেয়ে
আঁখি দুটি ওঠে জলে ভরিয়া।
সাঁঝের আকাশে এত রং কে গো ছড়াল
মনের বীণায় এত সুর কে গো ঝরাল
কারে মালা দেব বলে অঝোরে বকুল পড়ে ঝরিয়া।
মনের ভ্রমর বুঝি গুঞ্জরে অনুখন স্মৃতির কমলটিরে ঘিরে
যে পাখি হারায় নীড় সুদূর আকাশে সে কি আসে কভু ফিরে।
শিউলি ঝরানো আজি সন্ধ্যার বাতাসে
কে গো সাড়া দিয়ে যায় স্বপ্নের আভাসে।
কার লাগি দুলে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে থরো থরো এ হিয়া।।

শিল্পী: তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা: পবিত্র মিত্র। সুর: শ্যামল মিত্র। (১৯৫৬)

৫৪।   কথা দাও ভুলব না গো, আমি তো ভুলব না
ও কাজল কালো চোখে, ব্যথা ঢেউ তুলব না
আজ হাসিটুকু সোহাগে থাক জড়ানো
শরম রাগে রাঙা এ মায়া থাক ভরানো
ভালোবেসে দেওয়া এ মালা ভুলেও খুলব না।
এ ফাগুন হারায় যদি তুমি তো থাকবে
হৃদয়ের আরও কাছে চুপি চুপি ডাকবে
এ গান ঘিরে মাধুরী থাক জড়ানো
মরণে তারই ছোঁওয়া আবেশে থাক ভরানো
দোলা দিলে মনে,
সে দোলা ছাড়া তো দুলব না।

শিল্পী ও সুর: মৃণাল চক্রবর্তী। কথা: শ্যামল গুপ্ত। (১৯৬০)

৫৫।   কে প্রথম কাছে এসেছি   কে প্রথম চেয়ে দেখেছি
কিছুতেই পাই না ভেবে   কে প্রথম ভালোবেসেছি
তুমি না আমি?
ডেকেছি কে আগে কে দিয়েছে সাড়া কার অনুরাগে
কে গো দিশাহারা
কে প্রথম মন-জাগানোর সুখে হেসেছি
তুমি না আমি?
কে প্রথম কথা দিয়েছি   দুজনার এ'দুটি হৃদয়
একাকার করে নিয়েছি;
শুরু হল কবে এত চাওয়া-পাওয়া একই অনুভবে
একই গান গাওয়া
কে প্রথম মন হারানোর স্রোতে ভেসেছি
তুমি না আমি?

শিল্পী: মান্না দে ও লতা মঙ্গেশকর। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: সুধীন দাশগুপ্ত।
ছবি: শঙ্খবেলা (১৯৬৬)

৫৬।   কাছে রবে কাছে রবে জানি কোনোদিন হবে না সুদূর।
দূর আরও দূর যাবে এই পথ— শুধু এই ক্ষণ হবে না সুদূর।
জীবনের ভালোলাগা এসে, হৃদয়ের দ্বারে আজ মেশে,
তাই সব কিছু যেন শুধু নীরবে বলে (তাই)।

এ যেন নতুন এক ভাবের খেলায়
হৃদয় হারিয়ে গেছে রঙের মেলায়
দুজনার এই পথে শেষে বসন্ত এসে যাবে হেসে
এই গান এই ক্ষণ এ আলো হাসি (তাই)।
কাছে রবে কাছে রবে—

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: মিন্টু ঘোষ। সুর: অসীমা ভট্টাচার্য। ছবি: চৌরঙ্গী (১৯৬৮)

৫৭। কেউ বলে ফাল্গুন কেউ বলে পলাশের মাস
আমি বলি আমার সর্বনাশ।
কেউ বলে দখিনা কেউ বলে মাতাল বাতাস
আমি বলি আমার দীর্ঘশ্বাস।
কেউ বলে নদী কেউ তটিনী
কেউ বা দিয়েছে নাম তরঙ্গিনী
আমি তো তাকে কোনো নামে ডাকিনি
সে যে আমার চোখেই জলোচ্ছ্বাস।।
জোনাকির নাম নাকি আঁধারমানিক
আমি তো দেখি আগুন জ্বলে ধিকধিক
খর বৈশাখে প্রথম যেদিন মেঘের মিছিলে
ওই আকাশ রঙিন
তৃষিত হৃদয়ে বাজে আনন্দবীণ,
আমি শুনি ঝড়ের পূর্বাভাস।।

শিল্পী, কথা ও সুর: জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। (১৯৭০)

৫৮। কি আশায় বাঁধি খেলাঘর বেদনার বালুচরে
নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে
বেদনার বালুচরে।
হায় গো হৃদয় তবুও তোমার আশা কেন যায় না
যতটুকু চায় কিছু তার পায় না।
কে জানে কেন যে আমার আকাশ মেঘে মেঘে শুধু ভরে।
নিয়তি আমার ভাগ্য লয়ে যে নিশিদিন খেলা করে।
প্রতিদিনই ওঠে নতুন সূর্য প্রতিদিনই আসে ভোর
ওঠে না সূর্য আসে না সকাল জীবন আঁধারে মোর।
পৃথিবী আমারে দিল যে ফিরায়ে কে যেন ডাকিয়া কয়
নাহি হেথা ঠাঁই। আমি তো কেহ নয়

ক্লান্ত চরণ আকুল আঁধারে পথ শুধু খুঁজে মরে
বেদনার বালুচরে।।

শিল্পী: কিশোরকুমার। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: শ্যামল মিত্র।
ছবি: আনন্দ আশ্রম। (১৯৭৭)

৫৯। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই
কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই
আজ আর নেই।
নিখিলেশ প্যারিসে মইদুল ঢাকাতে
নেই তারা আজ কোনো খবরে
গ্র্যান্ডের গিটারিস্ট গোয়ানিজ ডি'সুজা
ঘুমিয়ে আছে যে আজ কবরে।
কাকে যেন ভালোবেসে আঘাত পেয়ে যে শেষে
পাগলা গারদে আছে রমা রায়
অমলটা ধুঁকছে যে দুরন্ত ক্যানসারে
জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায়।
সুজাতাই আজ শুধু সবচেয়ে সুখে আছে
শুনেছি তো লাখপতি স্বামী তার
হিরে আর জহরতে আগাগোড়া মোড়া সে
গাড়ি বাড়ি সব কিছু দামি তার।
আর্ট কলেজের ছেলে নিখিলেশ সান্যাল
বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকত
আর চোখ ভরা কথা নিয়ে নির্বাক শ্রোতা হয়ে
ডি'সুজাটা বসে শুধু থাকত।
একটা টেবিলেতে সেই তিন চার ঘণ্টা চারমিনার ঠোঁটে জ্বলত
কখনও বিষ্ণু দে কখনও যামিনী রায়
এই নিয়ে তর্কটা চলত
রোদ ঝড় বৃষ্টিতে যেখানেই যে থাকুক
কাজ সেরে ঠিক এসে জুটতাম
চারটেতে শুরু করে জমিয়ে আড্ডা মেরে
সাড়ে সাতটায় ঠিক উঠতাম।
কবি কবি চেহারা কাঁধেতে ঝোলানো ব্যাগ
মুছে যাবে অমলের নামটা
একটা কবিতা তার হল না কোথাও ছাপা
পেল না সে প্রতিভার দামটা।

অফিসের সোস্যাল-এ অ্যামেচার নাটকে
রমা রায় অভিনয় করত
কাগজের রিপোর্টার মইদুল এসে রোজ
"কি লিখেছে" তাই শুধু পড়ত।
সেই সাতজন নেই আজও টেবিলটা তবু আছে
সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই,
একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন কুঁড়ি
শুধু সেই সেদিনের মালি নেই।
কত স্বপ্নের রোদ ওঠে এই কফি হাউসে
কত স্বপ্ন মেঘে ঢেকে যায়,
কতজনই এলো গেল, কতজনই আসবে
কফি হাউসটাই শুধু থেকে যায়।।

শিল্পীঃ মান্না দে। কথাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুরঃ সুপর্ণকান্তি ঘোষ। (১৯৮৩)

৬০। কেন রে তুই চড়লি ওরে বাবুদের জুড়ি গাড়িতে
মনের সুখে সেজেগুজে গয়না শাড়িতে
ও গাড়ি থামবে গিয়ে সোজা চোরাবালির চর
যে চরে কোনো দিনও বাঁধে না কেউ ঘর
কাগজের ফুলের মত থাকবি পড়ে বাগান বাড়িতে।।

হাট বাজারে শাঁখা সিঁদুর অনেক পাওয়া যায়
কপালে থাকলে তখন তবেই পরা যায়
মন্দ ভালো ভাবে না কেউ যখন জড়িয়ে ধরে নেশা
জীবন নিয়ে করিসনে তুই সর্বনাশের পেশা
ওই সখের শাড়ি লাগবে কাজে
যখন ফিরবি না আর কারও বাড়িতে।

কথা : মুকুল দত্ত। সুর : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শিল্পী : কিশোরকুমার

৬১। গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু
আজ স্বপ্ন ছড়াতে চায় হৃদয় ভরাতে চায়।
মিতা মোর কাকলি কুহু
সুর শুধু যে ঝরাতে চায় আবেশ ছড়াতে চায় প্রাণে মোর।
মৌমাছিদের মিতালি পাখায় বাজায় গীতালি,
মিড় দোলালো সুরে আমার কণ্ঠে মালা পরাতে চায়।

বাতাস হল হেঁয়ালি, পাতায় ছড়ায় মিতালি
কে জানে গো তার বাঁশি আজ--- কি সুর প্রাণে ধরাতে চায়।

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: অনুপম ঘটক।
ছবি: অগ্নিপরীক্ষা (১৯৫৫)

৬২। গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
দুই চোখে দুই জলের ধারা মেঘনা-যমুনা।
একই আকাশ একই বাতাস
এক হৃদয়ে একই তো শ্বাস
দোয়েল কোয়েল পাখির ঠোঁটে একই মূর্ছনা।
এ-পার, ও-পার কোন্ পারে জানি না
ও আমি সব পারেতে আছি।
গাঙের জলে ভাসিয়ে ডিঙা আমি পদ্মাতে হই মাঝি,
শঙ্খ চিলের ভাসিয়ে ডানা আমি দুই নদীতে নাচি।
একই আশা ভালোবাসা কান্না হাসির একই ভাষা
দুঃখ সুখের বুকের মাঝে একই যন্ত্রণা।।

শিল্পী ও সুর: ভূপেন হাজারিকা। কথা: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৭৪)

৬৩। ঘুমাল রাতের চাঁদ মেঘের শয়নে ওই
তুমিও ঘুমাও শুধু আমি একা জেগে রই।
এখনও মিলন-মালা কণ্ঠে জড়ানো
এখনও মধুর হাসি অধরে ছড়ানো
অনুরাগে দেখে হিয়া আবেশে বিভোর হই।।

নিবু-নিবু প্রদীপের আধো-আলোছায়াতে
স্বপন-মাধুরী ঝরে একী মধু মায়াতে
এই শুভ'খন বলে ধন্য যে আমি
ফুলের বাসরে এল স্বর্গ যে নামি
পৃথিবীর যত প্রেম এ হৃদয়ে আমি বই।।

কথা : শ্যামল গুপ্ত। সুর ও শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬৪। চাঁদের এত আলো তবু সে আমারে ডাকি
উতলা মাধবী রাতে মাগিছে এ মোর আঁখি।
ফুলের সুরভি আছে তাহারে ছাড়িয়া যাচে
মনের সুরভি মম সমীরণ থাকি থাকি।
বনের লতার কোলে কত না বিহগ জানি
গানের লহর তোলে কহে গো কত না বাণী
মোর কথা মোর গানে শুনিয়া অবাক মানে
আমার কণ্ঠ যাচে মহুয়া বনের পাখি।

শিল্পী: তালাত মামুদ। কথা: কমল ঘোষ। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়। (১৯৫২)

৬৫। চম্পাকলি গো কত নামে ডেকেছি তোমায়
কিছু মনে লেখা, কিছু আঁখির কোনায়।।
সোনার বরণী তুমি ভোরের বেলায়
বাসন্তিকা তুমি ফুলের মেলায়
রাঙা গোধূলিতে তুমি রূপমায়া গো
সন্ধ্যাতারা তুমি সাঁঝের ছায়ায়।।
চাঁদের লাবণিঝরা ভালোবাসাতে
তুমি কমলিনী, ওগো মায়াবী রাতে।
কতদিন চলে গেছ তবু কোনো বার
তুমি তো দাওনি সাড়া সে ডাকে আমার
কী ভেবে প্রথম আজ, শোনো, বলে ডেকে
শরমে অধরে, দেখি হাসি ছুঁয়ে যায়।।

কথা : শ্যামল গুপ্ত। সুর : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিল্পী : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬৬। ছিল চাঁদ মেঘের পারে, বিরহীর ব্যথা লয়ে
বাঁশরির সুর হয়ে কে গো আজ ডাকিল তারে।
ধরণির ধূলি থেকে চামেলি সে কহে ডেকে
এসো, প্রিয় আমারই দ্বারে।
চাঁদ কহে সুদূরে আমি মোর প্রেম জ্যোছনা সে
কেঁদে মরে তব পাশে ওগো ফুল কেমনে নামি?
চামেলি কহিল তবে আমি যাই দূর নভে,
ঝরিল সে পথের ধারে।।

শিল্পী: গীতশ্রী গীতা দাশ। কথা: অজয় ভট্টাচার্য। সুর: হিমাংশুকুমার দত্ত। (১৯৪১)

৬৭। জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল
মুখপানে যার কভু চাওনি ফিরে
কেন তারি লাগি আঁখি অশ্রু আকুল।।
চিরদিন যারে তুমি দিয়েছ হেলা, হৃদয় নিয়ে শুধু খেলেছ খেলা
মরণে তারে আজি বলো গো কেন
শূন্য লাগে এ ধরণি বিপুল।।
আমি তো ছিলাম প্রিয় তোমারই সাথে, সেই বকুল তলে সেই চাঁদনি রাতে
সেদিন কেন দিলে না গো হায়
যে মালাখানি ছিল তোমারই হাতে
মোর যত প্রেম, মোর যত গান, চাইনি তো কভু কোনো প্রতিদান
চিরদিন হায় যবে নিলাম বিদায় আমি
তুমি বুঝবে কি গো তব হৃদয়ের ভুল
মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।।

শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত। কথা: প্রণব রায়। সুর: শৈলেশ দত্তগুপ্ত। (১৯৪২)

৬৮। জীবনে দীপ যদি জ্বালাতে নাহি পারো
সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিও।
এখনও কাছে আছি তাই তো বোঝো না
আমি যে তোমার কত প্রিয়।।
হৃদয় চিরে যদি দেখাতে পারিতাম
বুঝিতে তুমি ওগো কি যে তারি দাম
আমি যে অসহায় আমার এ অপরাধ
পারো তো ক্ষমা করে নিও।।
যে দিন চিরতরে হারায়ে যাব আমি
ভাঙিবে ভুল তব তোমারে পাব আমি।
সেদিন ডাকো যদি সে নাম ধরে হায়
রুধির হয়ে যদি অশ্রু ঝরে যায়
তবুও আমায় পাবে না খুঁজে আর
বিরহে হব জানি বরণীয়।।

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৫৫)

৬৯। জীবনপুরের পথিক রে ভাই কোনো দেশে সাকিন নাই
কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।
খেয়াল পোকা যখন আমার মাথায় নড়ে চড়ে
আমার তাসের ঘরের বসতি হে অমনি ভেঙে পড়ে।
তখন তালুক ছেড়ে মুলুক ছেড়ে হইরে ঘরের বার। বন্ধুরে..
মন চলে আগে আগে আমি পড়ে রই
সোনার পিঞ্জিরা দিলাম বাসা বাঁধে কই
(পাখি বাসা বাঁধে কই)
অকূল গাঙে ভাসলাম আমি কূলের আশা ছাড়ি
তবু, কোথাও আমার মনের খবর পেলাম না।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: মুকুল দত্ত। ছবি: পলাতক (১৯৬৩)

৭০। জানি এ ভুল,
ফাগুনের ফুল ঝরে যাবে—
হয়তো তোমার কাছে মন চেয়ে চেয়ে কিছু নাহি পাবে।
সোনা সোনা এই জোছনা
মনের বাতায়নে এই ভাবনার আনাগোনা
হয়তো আমার এই মনোবীণা
তোমার ওই সুর বিনা সুর হারাবে।
অন্ধ মনের কোণে কখন সে ভালোবাসা গেঁথে ছিল নীড়
আজ দেখি হৃদয়ের তীরে জমে আছে সেই বেদনার তির
যেতে হবে তাইতো দূরে
বাঁধন যত ছিঁড়ে যাব বিদায়ের আসরে সরে
হয়তো তোমার ওই মন থেকে
আমার স্মৃতিটুকু জানি ফুরাবে।।

শিল্পী: আরতি মুখোপাধ্যায়। কথা: প্রবোধ ঘোষ। সুর: অনল চট্টোপাধ্যায়। (১৯৬৫)

৭১। জানি না ফুরাবে করে এই পথ চাওয়া
ছল ছল আঁখি মোর জলভরা মেঘে যেন ছাওয়া।
পদধ্বনি শুনে তার আমি বারে বারে, ছুটে যাই দ্বারে
ভুল ভেঙে যায় আমারে কাঁদায়ে শুধু খেলা করে হাওয়া।
আকাশে উঠেছে ঝড় কান পেতে শুনি তার ভাষা
তবে কি বেঁধেছি আমি বালুচরে বাসা
দীপ বুঝি নিবে যায় মন নাহি মানে

তবু তার পানে চেয়ে থাকি হায়
সহিতে পারি না তার এই নিবে যাওয়া।

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: রবীন চট্টোপাধ্যায়।
ছবি: সবার উপরে (১৯৫৫)

৭২। জোছনা করেছে আড়ি আসে না আমার বাড়ি
গলি দিয়ে চলে যায় লুটিয়ে রূপোলি শাড়ি
চেয়ে চেয়ে পথ তারি হিয়া মোর হয় ভারী
রূপের মধুর মোহ বলো না কী করে ছাড়ি।

কথা ও সুর : রবি গুহমজুমদার। শিল্পী : বেগম আখতার।

৭৩। ঝড় উঠেছে বাউল-বাতাস আজকে হল সাথি
সাত মহলা স্বপ্নপুরীর নিবল হাজার বাতি।।
রুদ্রবীণার ঝংকারেতে ক্ষুব্ধ জীবন উঠল মেতে
সকল আশার রঙিন নেশা ঘুচল রাতারাতি।।
আকাশ জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের মাতন হল শুরু,
সুরের স্বপন ভাঙল শুনে মেঘের গুরুগুরু।
উড়ছে ভুলের ঘূর্ণি হাওয়া সকল চাওয়া সকল পাওয়া
শুকনো পাতার মর্মরেতে করছে মাতামাতি।।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: বিমলচন্দ্র ঘোষ। ছবি: শাপমোচন। (১৯৫৫)

৭৪। ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং চুড়ির তালে থই থই বন্যা নাচে রে
রিমঝিম রিমঝিম বরষাতে জলতরঙ্গ বাজে রে।
শাওন এলো মন বলে সে কেন এলো না
মরমে মরমিয়া গুমরিয়া কাঁদে
নয়নেরই ধারা মেশে বাদলেরই মাঝে রে।।
ও ছল ছল ঢেউ মিছে, কেন এ খেলা
যাও দুলে দুলে তারই কুলে
চলো এ বেলা, বধূ আছে একেলা
মন রাঙানিয়া হয়ে যে ছিল পরাণে
হল দুখ জাগানিয়া কেন সে কে জানে
তারই পথ চেয়ে তবু ভুলি শত কাজে রে
জলতরঙ্গ বাজে রে।।

শিল্পী ও সুর: মৃণাল চক্রবর্তী। কথা: শ্যামল গুপ্ত। (১৯৫৮)

৭৫। তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর
হাসি আর গানে ভরে তুলব
যত ব্যথা দুজনেই ভুলব।
সে যে ভুল সে তো আমি বুঝিনি
সেদিন ফুলের পাশে কাঁটা খুঁজিনি
ভেবেছিনু মধুরাতে জীবন দোলায় শুধু দুলব।
যত ব্যথা দুজনেই ভুলব।
শুধু বলো তুমি কি গো জানতে
যেতে যেতে এই পথ শেষ হবে কোন মরুপ্রান্তে
একবার শুধু ওগো বলো না
ফুলবীথি ফুলে কেন ভরা হল না
বুঝিনি তো এই রাখি কোনোদিন নিজ হাতে খুলব
যত ব্যথা দুজনেই ভুলব।

শিল্পী: শ্যামল মিত্র। কথা: পবিত্র মিত্র। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৭)

৭৬। তুমি যে আমার
(ওগো) তুমি যে আমার
কানে কানে শুধু একবার বলো "তুমি যে আমার"।
আমার পরাণে আসি তুমি যে বাজাবে বাঁশি,
সেই তো আমার সাধনা চাই না যে কিছু আর।
তুমি যে আমার দিশা অকূল অন্ধকারে,
দাও গো আমারে ভরে নীরব অহংকারে।
জীবন মরণ মাঝে এসো গো বঁধুর সাজে,
সেই তো আমার জীবনে তোমারই অভিসার।।

শিল্পী: গীতা দত্ত। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
ছবি: হারানো সুর। (১৯৫৭)

৭৭। তোমায় কেন লাগছে এত চেনা
এত আপন ভাবছি কেন তোমায়
বলতে পারো প্রথম দেখা কোথায়?

কবে কখন শিপ্রা নদীর তীরে
কোন পাহাড়ে কোন সে পথের ভিড়ে
চাঁদের আলোয় অস্তাচলের সোনায়?

হয়তো আমার স্বপ্ন ঝরানো
একটি ছবি ছিল মনে
আশায় জড়ানো?

কেমন করে জানলে তুমি তারে
সেই রঙেতে রাঙাও আপনারে
রঙিন আমার কল্পনারি শোভায়!!

শিল্পী: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: ভূপেন হাজারিকা। (১৯৬০)

৭৮। তোমারই পথ পানে চাহি' আমারই পাখি গান গায়
শিশির-নীরে অবগাহি' কানন পথ ফুলে ছায়।
আমারই গান আঁখিজলে তোমারই লাগি পলে পলে
ফুটিয়া প্রেম শতদলে বিরহে প্রিয় দূরে যায়।
তোমারে গিয়েছিনু ভুলি' কুসুমে রাঙা মরু পথে,
জাগায়ে মোর ফুলগুলি দলিয়া গেলে জয়রথে।
তোমারই মালা মোর গলে অনল হয়ে যেন জ্বলে,
বাঁধিয়া রাখি হিয়াতলে হরিয়া মোরে নিলে হায়।।

শিল্পী: মাধুরী সেনগুপ্ত। কথা: শৈলেন রায়। সুর: হিমাংশু কুমার দত্ত। (১৯৩৯)

৭৯। তোমার আমার কারও মুখে কথা নেই
বাতাসেও নাই সাড়া
জেগে জেগে যেন কথা বলে ওই দূর আকাশের তারা।
দুজনেই কাছে তবু যেন কতদূর
মুকুলের কানে মৌমাছি আনে সুর
তোমার আঁখির পল্লবে মোর আঁখি যে নিমেষ হারা।
তোমার আমার মতনই যেন গো
এ রাতের ভাষা নাই—
কথা হারা এই স্বপ্নের মাঝে নিজেরে হারাতে চাই।
জানি না তো কেন দিলে তুমি মোরে ফুল
এ রাতের শেষে মনে হবে সে তো ভুল
হাসি দিয়ে যার শুরু হয় সে তো আঁখিজলে হয় সারা।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মুজমদার। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৬)

৮০। তোমার দু-চোখে আমার স্বপ্ন আঁকা
তাই এত গান গাওয়া তাই এত কাছে থাকা
নীরব মনের নিভৃতে দেখেছি!
সুদূরাকাশে জ্যোছনা হাসে সাগরে বাজে বীন
তুমি ও আমি দিবসযামী কাটাব সোনালি দিন
প্রজাপতিদের পাখায় পাখায় ফুলের পরাগ মাখা।
তোমার দুহাতে আমি যে বেঁধেছি রাখি
কাকলি কূজনে তাই মুখর হয়েছে পাখি;
তুমি যে আশা সুরের ভাষা প্রাণের গানে মোর
তোমারই তরে হৃদয় তরে ঝরে যে আঁখি লোর
তোমারে ঘেরিয়া মোর কবিতার ভাবনা মেলেছে পাখি॥

শিল্পী: প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৫৭)

৮১। তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ
একি অভিশাপ, নাই প্রতিকার
মিথ্যারই জয় আজ সত্যের নাই অধিকার,
কোথায় আযোধ্যা কোথা সেই রাম—
কোথায় হারাল গুণধাম।
একি হল, একি হল, পশু আজ মানুষেরই নাম।
সাবিত্রী সীতার দেশে দাও দেখা তুমি এসে
শেষ করে দাও এই অনাচার।
তোমার কঠিন হাতে বজ্র কি নাই—
হিংসার করো অবসান,
তোমার এ পৃথিবীতে যারা অসহায়—
তুমি মা তাদের করো ত্রাণ।
চরণতীর্থে তব এবার শরণ লব—
দুর্গম এই পথ হব পার।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবি: মরুতীর্থ হিংলাজ। (১৯৫৯)

৮২। তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো।
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?
ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা জমি-জমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা কারখানা আর রেলগাড়ি
তার বেলা?

চায়ের বাগান কয়লাখনি — কলেজ, থানা অফিসঘর
চেয়ার টেবিল দেয়ালঘড়ি — পিয়ন পুলিশ প্রফেসর
তার বেলা?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর — কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির — চলছে যেন হরির লুট
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে — খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা — বাঙলা ভেঙে ভাগ করো
তার বেলা?

শিল্পী: বাণী ঘোষাল। কথা: অন্নদাশঙ্কর রায়। সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫৫)

৮৩। তারে আমি চোখে দেখিনি তার অনেক গল্প শুনেছি
গল্প শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালোবেসেছি।
আসতে যেতে ছলকিয়া যায় রে যৌবন
বইতে পারে না তার বিবশ মন
ভালোবাসার ভালো কথা শুনে নাকি—
শিহরিয়া যায় শুনেছি।
চোখেতে তার স্বপ্ন শুনি ভিড় করে থাকে
মরণ শুনেছি হাতছানি দিয়া ডাকে
বিষের আবার ভালোমন্দ
(কিরে) যখন আমি মরতে বসেছি।।

শিল্পী: কিশোরকুমার। কথা: মুকুল দত্ত। সুর: লতা মঙ্গেশকর। (১৯৭৫)

৮৪। ত্রিনয়নী দুর্গা মা তোর রূপের সীমা পাই না খুঁজে,
চন্দ্র তপন লুটায় মা তোর চরণতলে দশভুজে।
বন্দনা গায় সরস্বতী
লক্ষ্মী সাজায় সন্ধ্যারতি
কার্তিকেয়, সিদ্ধিদাতা সিদ্ধ যে মা তোমায় পূজে।।
ত্রিকাল যে মা থমকে দাঁড়ায় রুদ্রাণী তোর চণ্ডী রূপে
জড়ের বুকে চেতন জাগে যুগান্তরের অন্ধকূপে।
হিমগিরির সিংহ তোমার
বাহন যে মা শক্তি পূজার,
মরণ ভয়ে অসুর কাঁপে পায়ের তলায় চক্ষু বুজে।।

শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা: বিমলচন্দ্র ঘোষ। সুর: রাজেন সরকার। ছবি: ঢুলি। (১৯৫৪)

৮৫। তুমি সুন্দর যদি নাহি হও, তায়
বলো কী-বা যায় আসে
প্রিয়ার কী রূপ সে-ই জানে, ওগো
যে কখনো ভালোবাসে।

শত মনোহর হ'লে তবু হায়
নীরব বীণারে কে-বা দেখে যায়
কাঁদে যদি সুর সমবেদনায়
আঁখি তবে জলে ভাসে।।

জানিতে চাহিনা তুমি কী যে শুধু
তোমার তুমিরে জানি
আমার নয়নে প্রতিমা হয়েছ
তাই তুমি, ওগো রাণি!

কেন তবু এ যে মোহ ভাব হায়
জানো না কি তব করুণা কণায়
কাঙাল হৃদয় ভ'রে গেছে মোর
যেদিন দাঁড়ালে পাশে।।

কথা: শ্যামল গুপ্ত। সুর : ভি. বালসারা। শিল্পী: তালাত মাহ্‌মুদ।

৮৬। তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে,
নিয়ে গেছ হায় একটি কুসুম
আমার কবরী হতে।

নিয়ে গেছ হিয়া কি নামে ডাকিয়া
নয়নে নয়ন দিয়া,
আমি যেন হায় ফেলে-যাওয়া মালা,
কূলহারা নদী স্রোতে।

খেলাঘরে কবি ধূলির খেলায়
দুটি হিয়া ছিল বাঁধা,
আমার বীণাটি তোমার বাঁশিটি
এক সুরে ছিল সাধা।

সে খেলা ফুরালো, সে সুর মিলাল,
নিভিল কনক আলো।
দিয়ে গেছ মোরে শত পরাজয়
ফিরে এসো জয়রথে।।

শিল্পী ও সুর: শচীনদেব বর্মন। কথা: অজয় ভট্টাচার্য।

৮৭। তোমার ভুবনে ফুলের মেলা
আমি কাঁদি সাহারায়
ওগো কমলিকা বুঝিলে না কেন
আমি কত অসহায়!
উষ্ণ বালুর অভিশাপ লয়ে
ভেঙে গেছি আমি অবসাদে ক্ষয়ে
কণ্ঠ আমার দীর্ঘ নিশ্বাসে
ভুল সুরে গান গায়।
আমার আকাশ কাঙাল করে গো
পাঠায়েছি মেঘ যত
তোমার কুঞ্জ বীথিকার ফুল
ফোটাতে মনের মতো;
প্রেম যে আমার আঁধারে লুকায়ে
তারা জ্বালে তব আকাশের গায়ে
গন্ধের ধূপে পুড়ে গেছি আমি
ছাই পড়ে আছে হায়।।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ।

৮৮। তুফান মেল! তুফান মেল যায়...
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ময়নামতীর হাট এড়িয়ে
কাশের বনে ঢেউ খেলিয়ে
বংশীবটের ছায়— যায়-যায়-যায়।
তুফান মেল! তুফান মেল যায়!
কার ফুলে যে হারায় মধু
কার ঘরে যে এলো বধু
কান্না হাসির ইন্দ্রধনুর
রং লাগাতে চায়— যায়-যায়-যায়।

তুফান মেল! তুফান মেল যায়!
অজগরের সেই তো মাসী
চমক দিয়ে বাজায় বাঁশি
সবুজ সোনা রঙের বুকে
ঝলকানি লাগায়— যায়-যায়-যায়।
তুফান মেল! তুফান মেল যায়!

শিল্পী: কানন দেবী। কথা: শৈলেন রায়। সুর: কমল দাশগুপ্ত। ছবি: শেষ উত্তর। (১৯৪২)

৮৯। ধিতাং ধিতাং বোলে কে মাদলে তাল তোলে
কার আনন্দ উচ্ছ্বলে আকাশ ভরে জোছনায়।
আয় ছুটে সকলে এই মাটির ধরাতলে
আজ হাসির কলরোলে নতুন জীবন গড়ি আয়।
আয় রে আয় লগন বয়ে যায়—
মেঘ গুড় গুড় করে চাঁদের সীমানায়
পারুল বোন ডাকে চম্পা ছুটে আয়
বর্গিরা সব হাঁকে কোমর বেঁধে আয়
আয় রে আয়, আয় রে আয়।।
ধিনাক্ নাতিন্ তিনা এই বাজারে প্রাণ-বীণা
আজ সবার মিলন বিনা এমন জীবন বৃথা যায়।
এ দেশ তোমার আমার আর আমরা ভরি খামার
আর, আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে সোনার কামনায়।।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫৪)

৯০। না, না, যেওনা রজনি এখনও বাকি
আরও কিছু দিতে বাকি বলে রাত জাগা পাখি।
আমি যে তোমারই শুধু জীবনে মরণে
ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে।
যে কথা বলিতে বাধে যে ব্যথা মরমে কাঁদে
সে কথা ভুলিতে ওগো দাও।
জীবন রজনি জানি এমনই পোহাবে
চাঁদের তরণি তুমি সুদূরে মিলাবে।

শিল্পী: লতা মঙ্গেশকর। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫৯)

৯১।　নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে
জ্বালায়ে চান্দের বাতি জেগে রব সারারাতি গো
কব কথা শিশিরের সনে রে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে।
যদিবা ঘুমায়ে পড়ি স্বপনের পথ ধরি গো
যেও তুমি নীরব চরণে রে ভোমরা
নিশীথে যাইও ফুলবনে।

কথা : জসীমউদ্দীন। সুর ও শিল্পী : শচীনদেব বর্মন।

৯২।　নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে
কত কি রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে।
বেদনার কলি তুমি দাও ভালোবেসে বঁধু
ফুল ফোটানোর ছলে আমি ভ'রে দেব মধু—
সারা মন কেন তুমি চোখে সাজালে?
জনম সফল হবে বঁধুয়া ঘরে আজ
শরমের আড়ালেতে দেখা যাবে ফুল-সাজ।
নিশিরাতে বিরহের বাঁশি ওরে কে বাজায়?
ভালোবেসে কেন বঁধু　আজ শুধু কেঁদে যায়?
সেধে সেধে কেন তুমি মরণ নিলে?

শিল্পী ও সুর: কিশোরকুমার। কথা: মুকুল দত্ত। (১৯৭৩)

৯৩।　নিশি রাত বাঁকা চাঁদ আকাশে
চুপি চুপি বাঁশি বাজে বাতাসে
ভাঙা ঘরে দু্দিনের এই খেলাঘর
হোক ভাঙা তবু এল জোছনা
ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল বালুচর
স্বপ্ন বাসর করি রচনা
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি
মন বলে তারও বেশি পেয়েছি।
নিশি রাত...

জীবনের পথে পথে চলিতে
যত আশা গিয়েছিল ফুরায়ে

গজমতী হার যেন ভুলিতে
ভিখারিনি আজ পেল কুড়ায়ে
এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি
মন বলে তারও বেশি পেয়েছি।।
নিশি রাত...

শিল্পী : গীতা দত্ত। কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর : নচিকেতা ঘোষ। ছবি : ইন্দ্রাণী (১৯৫৮)

৯৪। প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে
আমারই এ দুয়ার প্রান্তে
সে তো হায় মৃদু পায়
এসেছিল পারিনি তো জানতে।
সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি
হায়, সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি
তারে সে আঁধারে চিনিতে যে পারিনি
আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে।
যে আলো হয়ে এসেছিল কাছে মোর
তারে আজ আলেয়া যে মনে হয়।।
এ আঁধারে একাকী এ মন আজ
আঁধারেরই সাথে শুধু কথা কয়।
আজ কাছে তারে এত আমি ডাকি গো
সে যে মরীচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো
ভাগ্যে যা আছে লেখা হায় রে
জানি চিরদিনই হবে তারে মানতে।

শিল্পী: লতা মঙ্গেশকর। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৮)

৯৫। পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়
খুলে দাও প্রিয়া খুলে দাও বাহুডোর।
প্রণয় তোমার মিছে নয় মিছে নয়
ভালোবাসি তাই মনে জাগে এত ভয়
চাঁদ ডুবে যাবে, ফুল ঝরে যাবে, মধুরাতি হবে ভোর।
সবার মনের দীপালি জ্বালাতে যে দীপ আপনি জ্বলে
কেন আর তারে ঢেকে রাখো বলো তোমার আঁচল তলে।
শোনো নাকি ওই আজ দিকে দিকে হায়,

কত বধূ কাঁদে, কাঁদে কত অসহায়
পথ ছেড়ে দাও, নয় সাথে চলো, মুছে নাও আঁখি লোর।।

শিল্পী: সত্য চৌধুরী। কথা: মোহিনী চৌধুরী। সুর: কমল দাশগুপ্ত। (১৯৪৬)

৯৬। পিয়াল শাখার ফাঁকে ওঠে
একফালি চাঁদ বাঁকা ওই।
তুমি আমি দুজনাতে
বাসর জেগে রই।
তোমার আছে সুর আর আমার আছে ভাষা,
মনের কোণে আছে কিছু পাবার আশা।
এবার কিছু শোনো আর আমিও কিছু কই।

বাতাস যে গান গায় আর ওই তো ফোটে ফুল
আর এই যে প্রহর জাগা এ তো নহে ভুল।
মোর আঁখির পানে চেয়ে তোমার আঁখি হাসে
তবে হঠাৎ কেন এ রাত শেষ হয়ে ওই আসে
ফুরিয়ে যাব ভেবেই এতই ব্যাকুল হই।।

শিল্পী ও সুর: অখিলবন্ধু ঘোষ। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৫৪)

৯৭। পাখি আজ কোন সুরে গায়, বকুলের ঘুম ভেঙে যায়,
আজ কোনো কথা নয়—
শুধু গান আরও গান।
তাই বুঝি দুজনের মন কত সুরে করে আলাপন,
আজ কোনো কথা নয়—
শুধু গান আরও গান।
মধুমালতির বঁধু কয় রে এ ফাগুন হল মধুময় রে,
তাই বুঝি বাঁশি মোর—
এত সুর খুঁজে পায়।
কেন যে আজ কে জানে রে জীবন ভরে ওঠে গানে রে
প্রাণে মোর একি সাড়া পাই রে
জানি না তো কি যে আমি চাই রে
স্বপ্নে একি মায়া—
জাগে মোর আঁখিছায়।

শিল্পী: উৎপলা সেন। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৬)

৯৮। পথের ক্লান্তি ভুলে স্নেহভরা কোলে তব—
মাগো বলো কবে শীতল হবে।
কতদূর আর কতদূর বলো মা?
আঁধারের ভ্রূকুটিতে ভয় নাই—
মাগো তোমার চরণে জানি পাব ঠাঁই,
যদি এ পথ চলিতে কাঁটা বেঁধে পায়
হাসি মুখে সে বেদনা সব।
চিরদিনই মাগো তব করুণায়—
ঘর ছাড়া প্রেম দিশা খুঁজে পায়,
ওই আকাশে যদি মা কভু ওঠে ঝড়
সে আঘাত বুক পেতে লব।
যতই দুঃখ তুমি দেবে দাও—
জানি কোলে শেষে তুমি টেনে নাও,
মাগো তুমি ছাড়া এ আঁধারে গতি নাই
তোমায় কেমনে ভুলে রব।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবি: মরুতীর্থ হিংলাজ। (১৯৫৯)

৯৯। প্রথমত ঃ আমি তোমাকে চাই—
দ্বিতীয়ত ঃ আমি তোমাকে চাই—
তৃতীয়ত ঃ আমি তোমাকে চাই—
শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই—
নিঝুম অন্ধকারে তোমাকে চাই—
রাত-ভোর হলে আমি তোমাকে চাই—
সকালের কৈশোরে তোমাকে চাই—
সন্ধের অবকাশে তোমাকে চাই—
বৈশাখী ঝড়ে আমি তোমাকে চাই—
আষাঢ়ের মেঘে আমি তোমাকে চাই—
শ্রাবণে শ্রাবণে আমি তোমাকে চাই—
অকাল বোধনে আমি তোমাকে চাই—
কবেকার কলকাতা শহরে উৎপাতে,
পুরোনো নতুন মুখ ভরে ইমারতে—
অগুন্তি মানুষের ক্লান্ত মিছিলে—
অচেনা ছুরির শোভা তুমি এনে দিলে।
নাগরিক ক্লান্তিতে তোমাকে চাই—
এক ফোঁটা শান্তিতে তোমাকে চাই—

বহুদূর হেঁটে এসে তোমাকে চাই—
এ জীবন ভালোবেসে তোমাকে চাই—
চৌরাস্তার মোড়ে পার্কে, দোকানে—
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে, এখানে-ওখানে—
স্টেশন, টারমিনাসে, হাটে-বন্দরে—
অচেনা ড্রয়িংরুমে চেনা অন্দরে
বালিশ, তোশক, খাট, পুরোনো চাদরে—
ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরে—
কড়িকাঠে, চৌকাঠে, মাদুরে ও পাপোশে—
হাসি, রাগ, অভিমান, ঝগড়া, আপসে
তো মা কে চা ই—
এক কাপ চা-এ আমি তোমাকে চাই—
ডাইনে ও বাঁয়ে আমি তোমাকে চাই—
দেখা না দেখায় আমি তোমাকে চাই—
না বলা কথায় আমি তোমাকে চাই—
শীর্ষেন্দুর কোনো নতুন নভেলে—
হঠাৎ পড়তে বসা আবোল-তাবোলে—
অবোধ্য কবিতার ছন্দে খেয়ালে,
স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা দেয়ালে দেয়ালে
সলিল চৌধুরীর ফেলে আসা গানে
চৌরাসিয়ার বাঁশি মুখরিত প্রাণে
ভুলে যাওয়া হিমাংশু দত্তর সুরে—
সেই কবেকার অনুরোধের আসরে—
তো মা কে চা ই—
অনুরোধে মিনতিতে— তোমাকে চাই—
বেদনার আর্তিতে— তোমাকে চাই—
দাবিদাওয়া চাহিদায়— তোমাকে চাই—
লজ্জাকে ভুলে আমি তোমাকে চাই—
অধিকার বুঝে নেয়া প্রখর দাবিতে
সারা রাত জেগে আঁকা লড়াকু ছবিতে—
ছিপ্‌ছিপে্ কবিতার ছন্দে ভাষায়
গদ্যের যুক্তিতে বাঁচার আশায়;
শ্রেণিহীন সমাজের চির বাসনায়
দিনবদলের খিদে ভরা চেতনায়
দ্বিধা দ্বন্দ্বের ঘোচার স্বপ্নে

সাম্যবাদের গান ঘুমে জাগরণে—
বিক্ষোভে, বিপ্লবে— তোমাকে চাই—
ভীষণ অসম্ভবে— তোমাকে চাই—
শান্তি অশান্তিতে— তোমাকে চাই—
এই বিভ্রান্তিতে— তোমাকে চাই—
প্রথমত ঃ আমি তোমাকে চাই—
দ্বিতীয়ত ঃ আমি তোমাকে চাই—
তৃতীয়ত ঃ আমি তোমাকে চাই—
শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই—

কথা, সুর ও শিল্পী: সুমন চট্টোপাধ্যায় (১৯৯২)

১০০। ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।
বুঝি কে প্রেমের ডোরে বেঁধে রাখলে প্রাণ-ময়না।
বল সখী কোথায় যাব, কোথা গেলে পাখী পাব,
পুলিশে কি খবর দিব, বল ত জানাই গে থানা।
এমন ধনী কে সহরে, আমার পাখি রাখলে ধরে,
দেখলে পরে মেরে ধরে, কেড়ে নিব প্রাণ-ময়না।।

শিল্পী: মিস গহরজান। (১৯০৬)

১০১। বনের পাখি গায় বোলো না বোলো না
ফাগুন মায়া শুধু ছলনা ছলনা।
কনকচাঁপা ডাকে আয় আয় রে
মাধবী রাতি চলে যায় রে।
তমাল তলে ওই বেণু বাজে
শিহর লাগে হিয়া মাঝে
চাঁদের দোলায় মেঘের দোলনা।
যে মধু-তিথি বিফলে হারায়
কভু সে ফিরে আসে না হায়।
দাও না সাড়া গানে গানে
মনের মুকুল রাঙায়ে তোলো না।

শিল্পী ও সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথা: শ্যামল গুপ্ত। (১৯৬০)

১০২। বসন পরো মা বসন পরো মা

বসন পরো পরো মাগো, বসন পরো মা,
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো।।
কালীঘাটে কালী তুমি, কৈলাসে ভবানী
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী
পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী
কত দেবতা করেছে পূজা দিয়ে নরবলি
অসিতে রুধির ধারা, গলে মুণ্ডমালা
হেঁট মুখে চেয়ে দেখো পদতলে ভোলা
মাথায় সোনার মুকুট ঠেকিছে গগনে
মা হয়ে বালকের কাছে উলঙ্গ কেমনে
তুমি পাগল পতি পাগল, মাগো আরও আছে পাগল
প্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো।।

শিল্পী: পান্নালাল ভট্টাচার্য। কথা: রামপ্রসাদ সেন। সুর: নিখিল চট্টোপাধ্যায়। (১৯৬২)

১০৩। বেনীমাধব বেনীমাধব, তোমার বাড়ি যাব

বেনীমাধব—তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেনীমাধব—মোহন বাঁশি তমাল-তরু মূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতি ইস্কুলে
ডেস্ক-এ বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাস ঘর
বাহিরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর;
আমি তখন নবম শ্রেণি, আমি তখন শাড়ি,
আলাপ হল বেনীমাধব সুলেখাদের বাড়ি।।
বেনীমাধব বেনীমাধব লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে আমার রং কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে,
বেনীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে।।
কুঞ্জে, ওলি গুঞ্জে তবু ফুটেছে মঞ্জরি
সন্ধে বেলা পড়তে বসে অঙ্ক ভুল করি।
আমি তখন নবম শ্রেণি আমি তখন ষোলো
ব্রিজের ধারে বেনীমাধব লুকিয়ে দেখা হল।।
বেনীমাধব বেনীমাধব—এত দিনের পরে,
সত্যি বলো!
সে সব কথা এখনও মনে পড়ে?
সে সব কথা বলেছ তুমি তোমার প্রেমিকাকে

আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে, অপূর্ব সে আলো
স্বীকার করি দুজনকেই—মানিয়ে ছিল ভালো
জুড়িয়ে দিল চোখ, আমার পুড়িয়ে দিল চোখ
রাতে এখন ঘুমোতে যাই এক তলারই ঘরে
মেঝের ওপর বিছানা পাতা জ্যোৎস্না এসে পড়ে।।
আমার পরে যে বোন ছিল চোরা পথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে।
আজ জুটেছে, কাল কি হবে? কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ার সেলাই দিদিমণি।
তবু আগুন বেনীমাধব, আগুন জ্বলে কই
কেমন হবে? আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই।।

শিল্পী: লোপামুদ্রা। কথা: জয় গোস্বামী। সুর: সমীর চট্টোপাধ্যায়। (১৯৯৬)

১০৪। বেহাগ যদি না হয় রাজি বসন্ত যদি না আসে
এই আসরে ইমন তুমি থাকো বন্ধু আমার পাশে।
তোমার সুরের হাতটি ধরে চলো চলে যাই
যেখানেতে আনন্দরাগ বাজে গো সদাই।
কথার ফুলে সুরের ভ্রমর যেথায় মিলন সুখে হাসে!
চোখের দেখা যাক ফুরিয়ে ক্ষতি কিছু নাই
স্বপ্ন দেখার নাই সীমানা দেখে যাব তাই
ভালোবাসাই শিখেছে মন, তাইতো শুধুই ভালোবাসে!

শিল্পী: মান্না দে। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: অধীর বাগচী। দুই পুরুষ। (১৯৭৮)

১০৫। বাঁশি শুনে আর কাজ নাই
সে যে ডাকাতিয়া বাঁশি।
সে যে দিন দুপুরে চুরি করে
রাত্তিরে তো কথা নাই।
শ্রাবণে বিষ ঢালে শুধু
বাঁশি পোড়ায় প্রাণ গরলে
ঘুচাব তার নষ্টামী আজ
আমি সঁপিব তায় অনলে।
ও বাঁশিতে ঘুণ ধরে যদি
কেন বাঁশিতে ঘুন ধরে না

কত জনাই মরে শুধু
পোড়া বাঁশি কেন মরে না।

শিল্পী ও সুরঃ শচীনদেব বর্মন। কথাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৬০)

১০৬। বড়ো সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি
কত কাল দেখিনি তোমায়।
স্মৃতির জানলা খুলে চেয়ে থাকি, চোখ তুলে যতটুকু আলো আসে
সে-আলোয় মন ভরে যায়!
আমার এ অন্ধকারে কত রাত কেটে গেল
আমি আঁধারেই রয়ে গেলাম;
তবু ভোরের স্বপ্ন থেকে সেই ছবি যাই এঁকে
রঙে রঙে, সুরে সুরে, ওরা যদি গান হয়ে যায়!!

কথাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। শিল্পীঃ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৮৫)

১০৭। বনে নয় মনে মোর পাখি আজ গান গায়
এই ঝিরি ঝিরি হাওয়া দোলা দিয়ে যায়
গুনগুন ভ্রমরের ফাল্গুন ডাকে মোরে আয়।

একি তবে রূপময় অপরূপ দিল ডাক,
স্বপনের সমারোহে বেলা আজ কেটে যাক।
সুর আর সুরভিতে উন্মনা মন যেন,
কার সাড়া পায়।

চম্পা বকুলের ভাঙে ঘুম— চঞ্চল হল আজ ফাল্গুন
কার সে চরণের সুর বাজে রুমঝুম।

রঙে রূপে জানি না এ সুন্দর লীলা কার,
সে কি তবে এ জীবনে মধুরের উপহার।
তার ফুল বাঁশরিতে এই আমি আপনারে,
যেন খুঁজে পাই।।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর : নচিকেতা ঘোষ। শিল্পী : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১০৮। বিস্তীর্ণ দু'পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন?
নৈতিকতার স্খলন দেখেও মানবতার পতন দেখেও
নির্লজ্জ অলসভাবে বইছ কেন?
জ্ঞান-বিহীন নিরক্ষরের খাদ্য-বিহীন নাগরিকের
নেতৃত্ববিহীনতায় মৌন কেন?
সহস্র বরষার, উন্মাদনার, মন্ত্র দিয়ে, লক্ষ জনেরে
সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী ক'রে তোলো না কেন?

ব্যক্তি যদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত
তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন?
স্রোতস্বিনী কেন নাহি বও, তুমি নিশ্চয় জাহ্নবী নও
তাহলে প্রেরণা দাও না কেন?
উন্মত্ত ধরার, কুরুক্ষেত্রের, শরশয্যাকে আলিঙ্গন করা,
লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন?

কথা : শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও শিল্পী : ভূপেন হাজারিকা।

১০৯। বারান্দায় রোদ্দুর
আমি আরাম কেদারায় বসে দু'পা নাচাই রে
গরম চায়ে চুমক দিই
আমি খবরের কাগজ নিয়ে বসে পাতা ওলটাই রে
কলিং-এর ঘণ্টা শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলি
দারোয়ান দাঁড়ায় এসে তোমার দেখা নাই।

চতুর্দিক আগোছালো
আমার কাজের লোক ডুব মেরেছে ধুলো বাড়িময়
ঘড়র ঘড় ফ্যানের ব্লেড
আমার ঘুলঘুলিতে চড়াই বসে যাত্রা শোনায় রে
কলিং-এর ঘণ্টা শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলি
দুধওয়ালার গোঁফে মাছি তোমার দেখা নাই।
টেবিলে মানি প্ল্যান্ট
শুধু মানির দেখা নাই গো আমার ফক্কা পকেট রে
বারান্দায় রোদ্দুর
আমি আরাম কেদারায় বসে দু'পা নাচাই রে
কলিং-এর ঘণ্টা শুনে ছুটে গিয়ে দরজা খুলি

সেলসম্যানটাই গোছায় তোমার দেখা নাই
তোমার দেখা নাই রে তোমার দেখা নাই।

কথা : সুরজিৎ। পরিবেশনায় : ভূমি (অ্যালবাম : যাত্রা শুরু)।

১১০। ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে তোমারে করেছে রানি,
তোমারই দুয়ারে কুড়াতে এসেছি ফেলে দেওয়া মালাখানি।
নয়নের জলে যে কথা জানাই—
সে ব্যথা আমার কেহ বোঝে নাই।
মেঘের মরমে যে মিনতি কাঁদে,
চাঁদ বুঝিবে না জানি।
মাধবীলতা গো— মাধবীলতা,
আজ তুমি আছো ফুলের স্বপন সুখে
একদিন যবে ফুল ঝরে যাবে লুটাবে ধূলির বুকে।
খেয়ালি প্রেমের খেলা বোঝা দায়
কখনও হাসায় কখনও কাঁদায়
মূক হয়ে যায় কারও মুখরতা কারও মুখে জাগে বাণী।।

শিল্পী: জগন্ময় মিত্র। কথা: মোহিনী চৌধুরী। সুর: কমল দাশগুপ্ত। (১৯৪৬)

১১১। ভুলে থাকার কথা ছিল তোমারই
আমার তো নয়
কথা রাখার কথা ছিল তোমারই
আমার তো নয়।
সোনানদীর কোনাতে ওই
কূল ছাপানো লহর এলে।

একা তুমিই আঁকবে কিছু
পূর্ণ চাঁদের প্রহর এলে
ছবি আঁকার কথা ছিল তোমারই
আমার তো নয়।
কথা ছিল ভালোবাসায়
আসব আমি মালা নিতে
তুমি শুধু ডাকবে আমায়
অবহেলার জ্বালা দিতে।

চাঁপাবনের কাঁপা হাওয়া
আরও কিছু সরল হলে
অভিমানের যত সুধা
পরিহাসের গরল হলে
হাসি ঢাকার কথা ছিল তোমারই
আমার তো নয়।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : শৈলেন মুখোপাধ্যায়। শিল্পী : মৃণাল চক্রবর্তী

১১২। মন চলো নিজ নিকেতনে
সংসার-বিদেশে বিদেশির বেশে ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয়-পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর, কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে?।
সত্য-পথে মন করো আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চলো অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখো পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখো রে প্রহরী, শম দম দুই জনে।।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসিজনে;
যদি দ্যাখো পথ ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিয়ো দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।।

শিল্পী: অঘোরনাথ চক্রবর্তী। কথা: অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।
স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রিয় গানটি পরবর্তী কালে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়ালের সুরে 'স্বামীজী' (১৯৪৯) এবং মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪) চলচ্চিত্রে।

১১৩। মন দিল না বঁধু মন নিল যে শুধু
আমি কী নিয়ে থাকি।।
মহুয়ার মাথায় ঢোলক দোলে পলাশের নোলক
বাঁধে কেউ বাহুর রাখি।।
হিয়া তোর অবুঝ হিয়া খোঁজে কোন সবুজ প্রিয়া
দিতে চাস আমায় ফাঁকি।।

শিল্পী ও সুর: শচীনদেব বর্মন। কথা: রবি গুহ মজুমদার। (১৯৫৬)

১১৪। মনে করো আমি নেই বসন্ত এসে গেছে,
কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় চৈতালি ভেসে গেছে।
শুক্লাতিথির ওই ছায়াপথে চলেছে নতুন রাত মায়া রথে
তুমি অবাক চোখে চেয়ে অপলকে
ভাবছ ভালো কে বেসে গেছে?
যেন মনে লাগে দোলা সেই দোলা লাগে বিনা কারণেই
শুধু মনে করো আমি নেই;
হঠাৎ খুশির ওই রঙিন পাখি হাওয়ায় লেখে তার ডাকাডাকি
তুমি সেই লগনে ভাবো আপন মনে
আমার হাসি সে হেসে গেছে।

শিল্পীঃ সুমন কল্যাণপুর। কথাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরঃ রতু মুখোপাধ্যায়। (১৯৬৬)

১১৫। মনে পড়ে রুবি রায়
কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি
আজ হায় রুবি রায়, ডেকে বলো আমাকে
তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি।

রোদ জ্বলা দুপুরে, সুর তুলে নূপুরে
বাস থেকে তুমি যবে নামতে
একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে
সে কথা কি কোনোদিন ভাবতে?
দীপ জ্বলা সন্ধ্যায় হৃদয়ের জানালায়
কান্নার খাঁচা শুধু রেখেছি
পাখি সে তো আসেনি, তুমি ভালোবাসনি
স্বপ্নের জাল বৃথা বুনেছি।।

শিল্পী ও সুরঃ রাহুলদেব বর্মন। কথাঃ শচীন ভৌমিক। (১৯৬৯)

১১৬। মাটিতে জন্ম নিলাম মাটি তাই রক্তে মিশেছে
এ মাটির গান গেয়ে ভাই, জীবন কেটেছে।
আকাশের অঝোর ধারে, বনানীর শ্যামল ভারে,
অরুণের সোনার রঙে, আমার মাটি আজ সেজেছে।
এ মাটি ছিনিয়ে নিতে—কতবার ঝড় এসেছে।
এ মাটি ভাসিয়ে দিতে—কতবার বান ডেকেছে।

কত যে বুকের পাঁজর আড়াল করে রুখল সে ঝড়,
কত যে শোণিত ঢেলে উষর মাটি প্রাণ পেয়েছে।।

শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা ও সুর: প্রবীর মজুমদার। (১৯৬২)

১১৭। মধুর আমার মায়ের হাসি   চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার   মাকে মনে পড়ে।
তাঁর মায়ায় ভরা সজল দিঠি   সে কি কভু হারায়
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে   সন্ধ্যারাতের তারায়
সেই যে আমার 'মা'—
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।
তার ললাটের সিঁদুর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে
আলতা-পরা পায়ের ছোঁওয়ায় রক্তকমল ফোটে।
প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে কে জেগে রয় দুখের ঝড়ে
সেই যে আমার মা—
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।।

শিল্পী ও সুর: সুধীরলাল চক্রবর্তী। কথা: প্রণব রায়। (১৯৫১)

১১৮। ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়   রামধনু জ্বলে তার গায়
কোন প্রবালের দ্বীপে দেশে ভেসে যাই
যেথা তুমি ছাড়া আর কেহ নাই
নীল পরি যেথা গান গায়।
হেথা নাই ব্যথা নাই আঁখি জল, নাই পৃথিবীর এই কোলাহল
সেথা মন শুধু হারাতে যে চায়।
শুনি ওই ডাকে আমায় রূপকথা ভরা সেই দেশ
জানি না কবে কোথায় এই চলা হবে শেষ
কতদুর আর কতদূর প্রাণে বাজে নিরাশার সুর
মোর ঘুম-মাঝি শুধু দাঁড় বায়।।

শিল্পী: উৎপলা সেন। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯৫৬)

১১৯। মালতী ভ্রমরে করে ওই কানাকানি
সেই সুরে মনে হয় তোমারেই জানি আমি জানি।।
মালতী বলে ওগো মিতা—
আমি যে তোমারই জানো কি তা।

প্রাণেরও পরশ দাও আনি
তোমারেই জানি, আমি জানি।।
শুধু গান শুধু হাসি এই নিয়ে সারাবেলা,
চলে আজ ফাগুনেরই খেলা।
মালতী বলে ওগো প্রিয়—
এ লগন হোক স্মরণীয়।
শোনাও শপথের বাণী
তোমারেই জানি আমি জানি।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: নচিকেতা ঘোষ।
ছবি: বন্ধু। (১৯৫৮)

১২০। মুক্তোছড়া নেইকো কন্যা নেইকো মতির হার
মনের মুক্তো দিলাম তোমায়— গড়ো অলংকার।
গন্ধরাজের গন্ধে তোমায় ও মন দেব ভরে,
পারিজাতের রঙে তোমায় দেব বিভোর করে,
আর দেব মোর হৃদয়খানি তোমায় উপহার।
আমার ফাগুন দিয়ে তোমার পরাণ ভরে নিও,
বিনিময়ে তোমার শ্রাবণ না হয় মোরে দিও।
বেঁধেছি ওগো কন্যা তোমায় আমার মনের মাঝে,
তবু তোমার মনের নাগাল আজও পেলাম না যে,
দিলাম সবই উজাড় করে যা ছিল আমার।।

শিল্পী: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কথা: আনন্দ মুখোপাধ্যায়। সুর: অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৫৯)

১২১। মহারাজা! তোমারে সেলাম!
মোরা বাংলা দেশের থেকে এলাম।
মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ দেশে দেশে যাই
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই,
মহারাজা—রাজামশাই।।
তবে জানা আছে ভাষা অন্য তোমারে শুনাইয়ে ধন্য
এসেছি তাহারই জন্য, রাজা! মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান, রাজা শোনো ভরে মনপ্রাণ।
এ যে সুরেরই ভাষা, ছন্দেরই ভাষা,
তালেরই ভাষা, আনন্দেরই ভাষা,

ভাষা এমন কথা বলে,　বোঝে রে সকলে
উঁচা নীচা ছোটো বড়ো সমান (রাজা)
মোরা এই ভাষাতেই করি গান, মহারাজা— তোমারে সেলাম।।

শিল্পী: অনুপ ঘোষাল। কথা ও সুর: সত্যজিৎ রায়। ছবি: গুপী গায়েন বাঘা বায়েন (১৯৬৯)

১২২। মেঘ কালো আঁধার কালো আর কলঙ্ক যে কালো
যে কালিতে বিনোদিনী হারাল তার কুল
তার চেয়েও কালো কন্যা তোমার মাথার চুল।
কাশ যে সাদা ধেনু সাদা আর সাদা খেয়ার পাল
সাদা যে ওই স্বপ্ন মাখা রাজহংসের পাখা
তার চেয়েও সাদা কন্যা তোমার হাতের শাঁখা।
লজ্জা রাঙা সিঁদুর রাঙা আর রাঙা কৃষ্ণচূড়া,
রাঙা যে গো সাঁঝ আকাশের ওই যে অস্তরাগ
কন্যা সবার চেয়েও রাঙা তোমার আলতার ওই দাগ।
শস্য সবুজ পাতা সবুজ আর সবুজ টিয়াপাখি
দূর্বা সবুজ তার সাথে যে চিরসবুজ বন
সবার চেয়েও সবুজ কন্যা তোমার অবুঝ মন।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: নচিকেতা ঘোষ। (১৯৫৭)

১২৩। মৌ বনে আজ মৌ জমেছে　বৌ কথা কও ডাকে
মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে।
ছন্দ ভরা গন্ধ ঝরা এ এক নতুন বেলা—
আমাকে আজ কে আর ধরে রাখে।।

নতুন নতুন সুরে পাখিরা গায়
নতুন নতুন ফুলে রং ভরে যায়
তাদের ঘিরে প্রজাপতি পাখায় স্বপ্ন আঁকে।।

নতুন নতুন খুশি হৃদয়ে পাই
নতুন নতুন পথে আজ কোথা যাই।
উঁকি দিল সূর্য্য সোনা　ভাঙা মেঘের ফাঁকে
আজ নতুন কিছু পাবো এবার　জীবন পথের বাঁকে।।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর : নচিকেতা ঘোষ। শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবি : বন্ধু।

১২৪। মন বলছে আজ সন্ধ্যায়
কিছু বলতে তুমি আসবে কি
আমি শুনব কিছু বলব
কিছু স্বপ্ন চোখে ভাসবে কি॥

বনে স্বর্ণ-চাঁপা ফুটবে
দুটি একটি তারা উঠবে
ওরা হয়তো সেই লগ্নে
চেয়ে দেখবে, মৃদু হাসবে কি॥

হয়ে ক্লান্ত নীড়ে পান্থ
পাখি ফিরবে, গান থামবে
কাছে আমরা বসে থাকব
ছায়া ঘিরবে, রাত নামবে
আরও শুনতে তুমি চাইবে
আরও বলতে গান গাইবে
আধো লজ্জায় হাসি দুলবে
দেখে তাই যে, ভালোবাসবে কি॥

কথা : শ্যামল গুপ্ত। সুর : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিল্পী : আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৫। যখন র'বনা আমি দিন হলে অবসান
আমারে ভুলিয়া যেয়ো, মনে রেখো মোর গান।।
আমার মালার ফুলে ধুলা যদি লাগে ভুলে,
গানের কুসুমগুলি হবে নাকো কভু ম্লান।।
(মোর) জীবনের যত ভুল, তুমি ভুলে যেয়ো সেই দিন,
নিবে যাক নিশিভোরে যে দীপ হ'ল মলিন।
গানে গানে পরিচয় সুন্দরতর হয়,—
সেই স্মৃতি হবে মোর বিদায়-বেলায় দান।।

শিল্পী: কে. এল. সায়গল। কথা: প্রণব রায়। সুর: রাইচাঁদ বড়াল। ছবি: পরিচয়। (১৯৪১)

১২৬। যদি ডাকো এপার হতে
এই আমি আর ফিরবে না
আমার খেয়া তোমার কূলে
আর কখনও ভিড়বে না।।

নিরুদ্দেশে যাত্রা করে কবে বলো কেই বা ফেরে
মিলন মালা যদি ছেঁড়ে মায়ার বাঁধন ছিঁড়বে না।।
কাছে আছি তাই তো আমার নেই কোনো আজ দাম।
তোমার ব্যথায় মুখর হবে তোমার দেওয়া নাম।
যায় যদি যাক প্রহর ব'য়ে মর্মে স্মৃতির অশ্রু লয়ে,
তবু এ প্রেম আঁধার হয়ে, প্রদীপ তোমার ঘিরবে না।।

শিল্পী ও সুরঃ শ্যামল মিত্র। কথাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯৫৫)

১২৭। যদি তুমি না এ গান কোনোদিন শোনো
কেউ শোনে বা না শোনে—কী আসে যায়।
যদি তুমি না মোর পথ চেয়ে দিন গোনো
আমি আঁধারে হারালে কী আসে যায়।।
তুমি জানো কি তা জানো না আমি তো জানি
কেন তোমারই কাছে আমি এত অভিমানী,
যদি তুমি কখনও চাও ফিরায়ে দিতে
কেউ ডাকে বা না ডাকে কী আসে যায়।।
তুমি কি দেখে বোঝো না আকাশে কত তারা যে
তবু না পেয়ে জোছনা রজনি দিশাহারা যে,
তুমি মানো কি তা মানো না আমি তো মানি
ওই সাগরে কারও তৃষ্ণা মেটে কতখানি;
যদি তোমারই নদী ঠাঁই না দেবে কূলে
আমি অকূলে হারালে কী আসে যায়।।

শিল্পী ও সুরঃ সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথাঃ শ্যামল গুপ্ত। (১৯৬০)

১২৮। যে বাঁশি ভেঙে গেছে
তারে কেন গাইতে বলো,
কেন আর মিছেই তারে সুরের খেয়া বাইতে বলো।
আজ সোনার খাঁচায় বন্দি পাখির কণ্ঠে যে নেই সুর,
আজ যেন সেই বনের ছায়া সে তো অনেক দূর।
তার হারিয়ে যাওয়া ফাগুনেরে—
ফিরে কেন চাইতে বলো?
একদা সুরে সুরে দিত যে হৃদয় ভ'রে,
দ্যাখো তার গানের বীণা ধুলায় পড়ে।
আজ সব হারানোর নীরব ব্যথায় কাঁদে গো যার প্রাণ,

বলো ওগো কেমন করে গাইবে সে তার গান।
মিছে ফাগুন বেলার হাসিতে তার
সুরের ভুবন ছাইতে বলো?

শিল্পী ও সুরঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথাঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। ছবিঃ স্বরলিপি। (১৯৬১)

১২৯। যারে যারে উড়ে যারে পাখি
ফুরালো প্রাণের মেলা শেষ হয়ে এল বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।।
আকাশে আকাশে ফিরে যা ফিরে আপন নীড়ে
শ্যামল মাটির বনছায়।
শুধু মনে মনে তোরে ডাকি।
চাহি না খেলিতে খেলা শেষ হয়ে এল বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।
আমারই স্বপন হ'য়ে হৃদয় পিঞ্জরে বসিয়া
জানি সবই রয়ে গেল বাকি।
এবারে ভাসাব ভেলা শেষ হয়ে এল বেলা
আর, কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।।

শিল্পীঃ লতা মঙ্গেশকর। কথা ও সুরঃ সলিল চৌধুরী (১৯৫৯)

১৩০। যদি ভাবো, এতো খেলা নয়, ভুল সে তো শুরুতেই।
না ফুটিতে ফুল যদি ঝরে যায় কাঁদুক শ্রাবণ এই ফাগুনেই
যদি শোনো হাওয়া কথা বলে কে জানে সে কার অভিমান
না জ্বলিতে দীপ যদি নিভে যায় শুরুতেই হোক অবসান।।
যদি দ্যাখো নীড় ভেঙে দিতে আকাশে ওই আসে ঝড়
মনে ক'রো কোন বালুচরে তুমি বেঁধেছিলে এই খেলাঘর।।

কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর : নচিকেতা ঘোষ। শিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
ছবি : চাওয়া পাওয়া।

১৩১। যখন কেউ আমাকে পাগল বলে তার প্রতিবাদ করি আমি
যখন তুমি আমায় পাগল বলো ধন্য যে হয় সে পাগলামি
ধন্য আমি ধন্য হে পাগল তোমার জন্য যে।
যখন নেশায় আমার রাস্তা টলে কেউ আমাকে মাতাল বলে
আমি সোজা চলে যাই দেখিয়ে ভাবছো যা তা নই তো আমি।
যখন তুমি আমায় মাতাল বলো ধন্য যে হয় সে মাতলামি

ধন্য আমি ধন্য হে   মাতাল তোমার জন্য যে।
যখন চোখ ভেসে যায় চোখের জলে   কেউ আমাকে দুখী বলে
ওমনি হেসে উঠে দিই বুঝিয়ে   সে অভিনয় কত দামি
যখন তুমি আমায় দুখী বলো   ভালো করে কাঁদি আমি
ধন্য আমি ধন্য হে   দুখী তোমার জন্য যে।
যখন বুকে আমার আগুন জ্বলে   তা বুঝে কেউ "আহা" বলে
আমি বলি তাকে মিথ্যে কেন   হচ্ছো আমার অন্তর্যামী?
যখন একটু তুমি "আহা" বলো   ভালো করে পুড়ি আমি
ধন্য আমি ধন্য হে   পুড়ি তোমার জন্য হে।
যখন সবকিছু যায় রসাতলে   কেউ আমাকে ফকির বলে
আমি চেঁচিয়ে বলি কেউ জানে না   আমার কোথায় আছে কী যে দামি
শুধু তুমি যখন ফকির বলো   রসের অতলে যে তলাই আমি
ধন্য আমি ধন্য হে ফকির(তোমার জন্য হে।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও শিল্পী : মান্না দে। (১৯৭৭)

১৩২। যেন কিছু মনে কোরো না
কেউ যদি কিছু বলে
কত কী যে সয়ে যেতে হয়
ভালোবাসা হলে।
কেউ যদি দেখে ফেলে
আসো তুমি এই পথে
তার কোনো কথা শুনে
থেমো না গো কোনোমতে
চোখ দুটি ভরো না অভিমানী আঁখিজলে।।

ফাগুনকে আরও মনে পড়ে
মেঘ এলে ফাগুনে
সোনা সে তো খাঁটি
সোনা হয় পুড়ে গেলে আগুনে।
তাই বলি ব্যথা পেলে
ভেঙে তুমি পড়ো না গো
স্বরলিপি নাই থাক
গান ভুল করো না গো
সব কথা গঞ্জনা মানো শুধু খেলাছলে।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : দীপালী ঘোষ। শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ।

১৩৩। ললিতা গো

ওকে আজ চলে যেতে বল্ না
ও ঘাটে জল আনিতে যাব না যাব না
ও সখি অন্য ঘাটে চল্ না।
দিবালোকে সে আমায় নাম ধরে ডাকে
আমাকে সবাই দোষে সে সাধু থাকে
অসময় সময় কিছু কেন সে বোঝে না
আমি কি তার হাতের খেলনা?
নিশিরাতে বাঁশি তার সিঁদ কাঠি হয়ে
চুপি চুপি ঘরে এসে বাজে রয়ে রয়ে
যখনই ডাকবে সে তখনই যেতে হবে
আমি কি এমনতর ফেলনা?

শিল্পী ও সুরঃ মান্না দে। কথাঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৬০)

১৩৪। লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে!

সঞ্চিত কত আশা—কত মধু ভালোবাসা
নারিনু পাঠাতে হায় শরমপারে।
খুলি তাই পত্রখানি মোর অনুরাগে আপনি বিভোর
বিরহে জড়ায়ে প্রেমডোর বাঁধিনু আলিঙ্গন ভারে।।
তোমার নয়নে ভরি রাখি
ময়ূরপঙ্খসম মেলি শত আঁখি
তোমারে হৃদয়ে অনুভাবি
জলভরা আকাশেতে রামধনু আঁকি,
দেখি তাই স্বপন-স্মৃতি ছবি মরমের মরমিয়া কবি
অখিলের অফুরন্ত রবি যেন ঘেরে নীল নীলিমারে।।

শিল্পীঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথাঃ হীরেন বসু। সুরঃ অনুপম ঘটক। ছবিঃ শ্রীতুলসীদাস (১৯৫০)

১৩৫। লাল পাহাড়ির দেশে যা

রাঙা মাটির দেশে যা
হেথায় তোকে মানাইছে না রে
ইক্কেবারে মানাইছে না রে
লাল পাহাড়ির দেশে যাবি
হাঁড়িয়া আর মাদল পাবি
মেয়ে মরদের আদর পাবি রে

নদীর ধারে শিমুলে ফুল
নানা পাখির বাসা রে
নানা পাখির বাসা
সকালে ফুটিবে ফুল
মনে ছিল আশারে
মনে ছিল আশা

তুই ভালোবেসে গেলি চলে
কেমন বাপের ব্যাটা রে
তুই কেমন বাপের বেটা
ভাদর মাসে ভাদু পূজা
ভাদু গানের ঘটা রে
ভাই ভাদু গানের ঘটা
ওই কালো মেয়েটার মন মজেছে
গলায় দিব মালা রে
তার গলায় দিব মালা।

তুই মরবি তো মরে যা
ইক্কেবারে মরে যা
হেথায় তোকে মানাইছে না রে।
ইক্কেবারে মানাইছেনা রে।

কথা : অরুণ চক্রবর্তী। সুর ও শিল্পী : সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৬। শোনো শোনো কথাটি শোনো
কাছে এসো প্রিয়তম বলে।
তোলো তোলো ও মুখ তোলো
কেন লাজে নীরব হলে।
প্রেম যদি ব্যথা দেয় সেও ভালো,
হিয়া মাঝে অনুরাগ তবু ঢালো।
কেন দূরে থাকো, প্রিয় নামে ডাকো,
তব স্বপ্ন মোর নয়নে দোলে
বলো বলো কথাটি বলো
ওগো অভিমানে যেও না চলে।
কত যে রাত হায় যায় চলি,
ভালোবাসা কেঁদে কয় কিছু যে বলি।

বলা আজও হল না কোরো না গো ছলনা
হৃদয় লাগিয়া হিয়া যেও না দলে।।

শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। কথা: সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়। সংগীত আয়োজন: দেবু চট্টোপাধ্যায়। (১৯৫১)
ওপরের গানটি হিন্দি 'সমাধি' ছবিতে আমীরবাঈ কর্ণাট্কী ও লতা মঙ্গেশকরের দ্বৈত কণ্ঠে গাওয়া 'গোরে গোরে ও বাঁকে চোরে'- র সুরে গাওয়া। সুরকার ছিলেন সি. রামচন্দ্র।

১৩৭। শ্যামলবরণী ওগো কন্যা
এই ঝিরিঝিরি বাতাসে ওড়াও ওড়না
মেঘের অলক দোলায়ে কোথা যাও
কত হাসির ফোয়ারা তোমার ঝরনা
এসো ওই ভুবন ভোলানো রূপে পরাণে।।
ওগো মোর শ্রান্ত দিবস সন্ধ্যা
তোমার আসার আশায় চেয়ে যায়,
কবে আমার ভাঙা ঘরের আঙিনায়
চপল চকিত চরণে আসিবে।
তোমারে দেখেছি সন্ধ্যার আকাশে তারায় তারায়
প্রদীপ জ্বালাতে বধূদের চোখে
মায়া-অঞ্জন পরাতে ওগো।
শ্যামলবরণী তোমার জন্যে
কত নদী বহে ফুল ফোটে অরণ্যে
খেতে সোনার প্লাবন খেলে যায়
জাগে ঘরে ঘরে কত না রাজকন্যে
রাজারকুমার দেয় জীবন অবহেলে।
ওগো তুমি বুঝি মোর বাংলা
আমার জীবনভর সাধের সাধনা
তোমায় কে দিয়েছে ব্যথা আমায় বলো না,
সুনীল নয়ন কেন গো ছলছল
তোমারে দেখেছি আজ গৃহহারা পথে পথে
কাঁদিয়া ফিরিছ ঘরে ঘরে
যত সন্তানেদের জাগাতে ওগো।।

শিল্পী: দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৫২)

১৩৮। সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত
কখনও তো হই নাই ক্লান্ত,
তথাপি মনের মোর প্রশান্ত সাগরে ঊর্মিমালা অশান্ত।
মোর মনের প্রশান্ত সাগরের বক্ষে
জোয়ারের নাই আজ অন্ত।
অজস্র লহরি নব নব গতিতে এনে দেয় আশা অফুরন্ত।
মোর প্রশান্ত পারের কত মহাজীবনের শান্তি আজ আক্রান্ত
নব নব সৃষ্টিকে দৈত্যদানবে করে নিষ্ঠুরাঘাত অবিশ্রান্ত।
ধ্বংসের আঘাতে দিয়ে যায় প্রতিঘাত
সৃষ্টির সেনানী অনন্ত
সেই সংঘাত আনে মোর প্রশান্ত সাগরে প্রগতির নূতন দিগন্ত
মোর গভীর প্রশান্ত সাগরের শক্তি ধ্বংসকে করে দিক্‌ভ্রান্ত
অগণন মানুষের শান্তির অভিযান সৃষ্টিকামী জীবন্ত।।

শিল্পী, কথা ও সুর: ভূপেন হাজারিকা। বাংলা রূপান্তর: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
ছবি: জীবন তৃষ্ণা। (১৯৫৭)

১৩৯। সারাবেলা আজি কে ডাকে বাঁশরির সুরে মন রাখে
চমকি থমকি করবী গরবি
আমার পথে কেন ঝরে থাকে।
বারে বারে পিছু ফিরে চাই চেয়ে দেখি কেউ কোথা নাই
কেন সে অকারণে ডাকে গো আমায়
জানি না সে কী বলিতে চায়।
তারই সুরে আজ যেন গাহিছে পাখি
ফুলে ফুলে দুলে দুলে কারে যে অলি ফিরিছে ডাকি।
মন নিয়ে একি খেলা তার ছলনাতে পথ ভুলি আর
পথে যেতে আমারে সে কেন গো কাঁদায়
তারই খোঁজে দিন চলে যায়।

শিল্পী ও সুর: শ্যামল মিত্র। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। (১৯৫৫)

১৪০। সারাদিন তোমায় ভেবে হল না আমার কোনো কাজ
হল না তোমাকে পাওয়া, দিন যে বৃথাই গেল আজ।।
সারাদিন গাছের ছায়ায় উদাসী দুপুর কেটেছে।
যা শুনে ভেবেছি এসেছ,— সে শুধু পাতারই আওয়াজ
হাওয়ারা হঠাৎ এসে জানাল

তুমি তো আমার কাছে আসবে না, একই হৃদয় হয়ে ভাসবে না।
তবে কি একাই থাকব, তবে কি আমার কেউ নেই,
সারাদিন যেমন কেটেছে,—তেমনি কি যাবে গো সাঁঝ।।

শিল্পী: সুবীর সেন। কথা ও সুর: অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৬৫)

১৪১। সেদিন বসন্ত বেলা
চুপি চুপি মন নিয়ে করেছ খেলা
আজ আমি যেন ওগো কত একেলা
কেন জানি না কেন জানি না।
আজ আমার পাশে নেই তুমি
কোথায় হারালে সেই তুমি
গুঞ্জন জাগে না কিছু ভালো লাগে না
আজ আমি যেন ওগো কত একেলা।
কেন জানি না কেন জানি না।
সে দিন যে নাম ধরে ডেকেছিলে মোরে
সেই নাম ধরে আর ডাকবে না কি
এই যে স্বপ্নলোকে
আমার অবাক দুটি চোখে
সেই মায়া আর আঁকবে না কি?
আজ কোথায় তুমি কোনখানে
সে কি আমার মন জানে
বন্ধন খুলেছ আমারে কি ভুলেছ
আজ আমি যেন ওগো কত একেলা—
কেন জানি না কেন জানি না।

শিল্পী: নীতা সেন। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। (১৯৬৯)

১৪২। সেই তো আবার কাছে এলে এতদিন দূরে থেকে
বলো না কি সুখ তুমি পেলে?
এ কেমন ভালোবাসা কে জানে
কী ভেবে গো ব্যথা দিলে এ প্রাণে
নিজ হাতে মণিদীপ নিভায়ে
আবার নিজেই দিলে জ্বেলে!
তুমি তো আমায় ভালো চেনো তুমি ছাড়া কোনো গান
ভাবতেও পারিনা তা জেনো;
তবু যদি ভাবো সবই ছলনা সেই কথা মুখে কেন বলো না

ঝরামালা কেন দাও পরায়ে
ধূলিতে দাও না তারে ফেলে।।

শিল্পী ও সুর: মান্না দে। কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯৬৩)

১৪৩। সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা,
আমায় করেছ একি চঞ্চল বিহ্বল দিশাহারা।
অরুণাচলের বুকে তুমি জাগালে দীপ্তমুখে
মহাতমসায় আলোর ঝরনাধারা।
নবচেতনার রক্ত কমল দলে,
অগ্নি ভ্রমর দিগন্তে জাগে রাগিণীর পরিমলে।
মিছে হল অভিশাপ মোর জীবনের সন্তাপ,
গত রজনির অশ্রু তিমিরে ভেঙেছো অন্ধকারা।

শিল্পী ও সুর: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: বিমলচন্দ্র ঘোষ। ছবি: শাপমোচন। (১৯৫৪)

১৪৪। সুনয়নী সুনয়নী আর এপথে যাইও না
যাইবার কালে কালো চোখে
মোর পানে আর চাইও না।
আমি যে অবলা নারী আর কিছু জানি না
আমার চোখের নীল দরিয়ায়
তোমার তরী আর বাইও না।।
সুনয়নী সুনয়নী আর পান খাইও না
রাঙা ঠোঁটে হাসির বিজুলির বান আর হাইনো না
কুঁচ রাঙা শিমুল রাঙা গোধূলির মেঘ রাঙা
তাহার অধিক রাঙা শরম রাগে
আমায় রাঙাইও না,
সুনয়নী আউলা কেশের মেঘ তুলে যাইও না
হাজার কালো কুটিল নাগিনির জালে আর বাইন্ধো না।।
কাক কালো কোকিল কালো কালো নদী যমুনা
তাহার অধিক কালো বিরহের রজনি পোহাইল না
সুনয়নী সুনয়নী আর তুমি কাইন্দ না
তোমার চোখের হিরামানিক মোর অঙ্গনে বায়াইও না।
প্রেম কান্দায়, মরণ কান্দায়, বিরহের বেদনা
তাহার অধিক কান্দায় তোমার ভাটিয়ালি আর গাইও না।।

শিল্পী: নির্মলেন্দু চৌধুরী ও সবিতা চৌধুরী। কথা ও সুর: সলিল চৌধুরী। (১৯৬৭)

১৪৫। সরস্বতী বিদ্যেবতী তোমায় দিলাম খোলা চিঠি
একটু দয়া করো মাগো বুদ্ধি যেন হয়।
এসব কথা লিখছি তোমায় নালিশ করে নয়।।

শুনলে তোমার দুঃখ হবে মাগো
কোন দেশেতে ধান বেশি হয়, কোন দেশেতে গম
মনে আমার থাকে না যে কোথায় হনলুলু,
ভূগোল দেখে তাই মনে হয় বুক ঢিপ ঢিপ যম।
দোষ বলো কার পরীক্ষাকে যদি করি ভয়?

সত্যি করে বলছি তোমায় মা গো
গুরুমশাই যখন তখন কানটা ধরেন এসে
বলেন "পাজি, হা-ডু-ডু কেবল খেলা খেলা
অঙ্ক ভূগোল ইংরাজিতে গোল্লা খাবি শেষে।"

শুনলে তোমার দুঃখ হবে মা গো
অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে নতুন ধারাপাত
'কিলো-মিলো', 'হেক্‌টা-ডেকার' ধাক্কা খেয়ে শেষে
'লিটার-মিটার' 'গ্রাম' নিয়ে সব ধুলোয় কুপোকাত
ছোট্ট মাথায় কত ধরে। তাইতো লাগে ভয়।।

শিল্পী: সনৎ সিংহ। কথা: শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর: অনল চট্টোপাধ্যায়। (১৯৬৩)

১৪৬। সূর্য ডোবার পালা আসে যদি আসুক বেশ তো,
গোধূলির রঙে হবে এ ধরণি স্বপ্নের দেশ তো।
তারপর পৃথিবীতে আঁধারের ধূপছায়া নামবেই,
মৌমাছি ফিরে গেলে জানি তার গুঞ্জন থামবেই।
সে আঁধার নামুক না গুঞ্জন থামুক না—
কানে তবু রবে তার রেশ তো।।
তারপরে সারারাত দুজনেই একা একা ভাবব,
হৃদয়ের লিপিকাতে কে যেন লিখেছে এক কাব্য।
জোনাকিরা দীপ জ্বেলে আমাদের সাথে রাত জাগবেই,
দুটি প্রাণে চুপে চুপে নতুন সে সুর এক লাগবেই।
জোনাকিরা জাগুক না প্রাণে সুর লাগুক না—
পাওয়াতে চাওয়ার হবে শেষ তো।।

শিল্পী: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: নচিকেতা ঘোষ।
ছবি: ইন্দ্রাণী (১৯৫৮)

১৪৭। সোহাগ চাঁদ-বদনি ধনি নাচো তো দেখি
বালা নাচো তো দেখি বালা নাচো তো দেখি
বালা নাচো তো দেখি।

নাচেন ভালো সুন্দরী গো বাঁধেন ভালো চুল
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগকেশরের ফুল।

রুনুর ঝুনুর নূপুর বাজে ঠুমুক ঠুমুক তালে,
রুনুর ঝুনুর নূপুর বাজে,
নয়নে নয়ন মেলিয়া গেল শরমের রং লাগে গালে।

যেমনি নাচেন নাগর কানাই তেমনি নাচেন রাই
নাচিয়া ভুলাও তো দেখি নাগর কানাই।।

কথা : প্রচলিত। সুর ও শিল্পী : নির্মলেন্দু চৌধুরী। (১৯৬১)

১৪৮। সারাটি জীবন কি যে পেলাম
এই মায়াভরা পৃথিবীতে
নিয়েছি যতই তারও বেশি করে
হয়তো, হয়তো হয়েছে দিতে।
তবু সে হিসাব করে অভিযোগ কিছু নেই
কেউ কাঁদে কেউ হাসে নিয়তির বিধি এই
দুঃখেরে আমি আপন করে
পেরেছি সহজে নিতে।।

ব্যথার মতন এমন মধুর
কোথায় কী আছে আর
হাসি মুখে তাই বরণ করেছি অশ্রুর উপহার।
ব্যর্থ আশার ঘায়ে হৃদয় ভাঙে না কারও
সুনিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে যে আরও
তাই ভাগ্যের পায়ে প্রণাম জানাই
কন্ঠের সুরভিতে।

কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর : দীপালি ঘোষ। শিল্পী : অখিলবন্ধু ঘোষ।

১৪৯। হয়তো কিছুই নাহি পাবো
তবুও তোমায় আমি দূর হতে ভালোবেসে যাব।
যদি ওগো কাঁদে মোর ভীরু ভালোবাসা
জানি তুমি বুঝিবে না কভু তারই ভাষা,
তোমারই জীবনে কাঁটা আমি কেন মিছে ভাবো!
ধূপ চিরদিন নীরবে জ্বলে যায়
প্রতিদান সে কি পায়!
ক্ষতি নাই অনাদরে যদি কভু কাঁদি
আলো ভেবে যদি ছায়া বুকে বাঁধি
তোমারই ও পথে তবু ওগো কিছু নাহি পাব!!

শিল্পী: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কথা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। সুর: শ্যামল মিত্র (১৯৫৫)

১৫০। হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য,
জানি তুমি অনন্য আশার হাত বাড়াই।
যদি কখনও একান্তে চেয়েছি তোমায় জানতে,
শুরু হতে শেষ প্রান্তে ছুটে ছুটে গেছি তাই।
আমি যে নিজেই মত্ত জানি না তোমার শর্ত
যদি বা ঘটে অনর্থ তবুও তোমায় চাই।
আমি যে দুরন্ত, দু-চোখে অনন্ত,
ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে স্বপ্ন ছড়াই—
তুমি তো বলোনি মন্দ তবু কেন প্রতিবন্ধ
রেখো না মনের দ্বন্দ্ব সব ছেড়ে চলো যাই।।

শিল্পী: মান্না দে। কথা ও সুর: সুধীন দাশগুপ্ত। ছবি: তিন ভুবনের পারে (১৯৬৯)